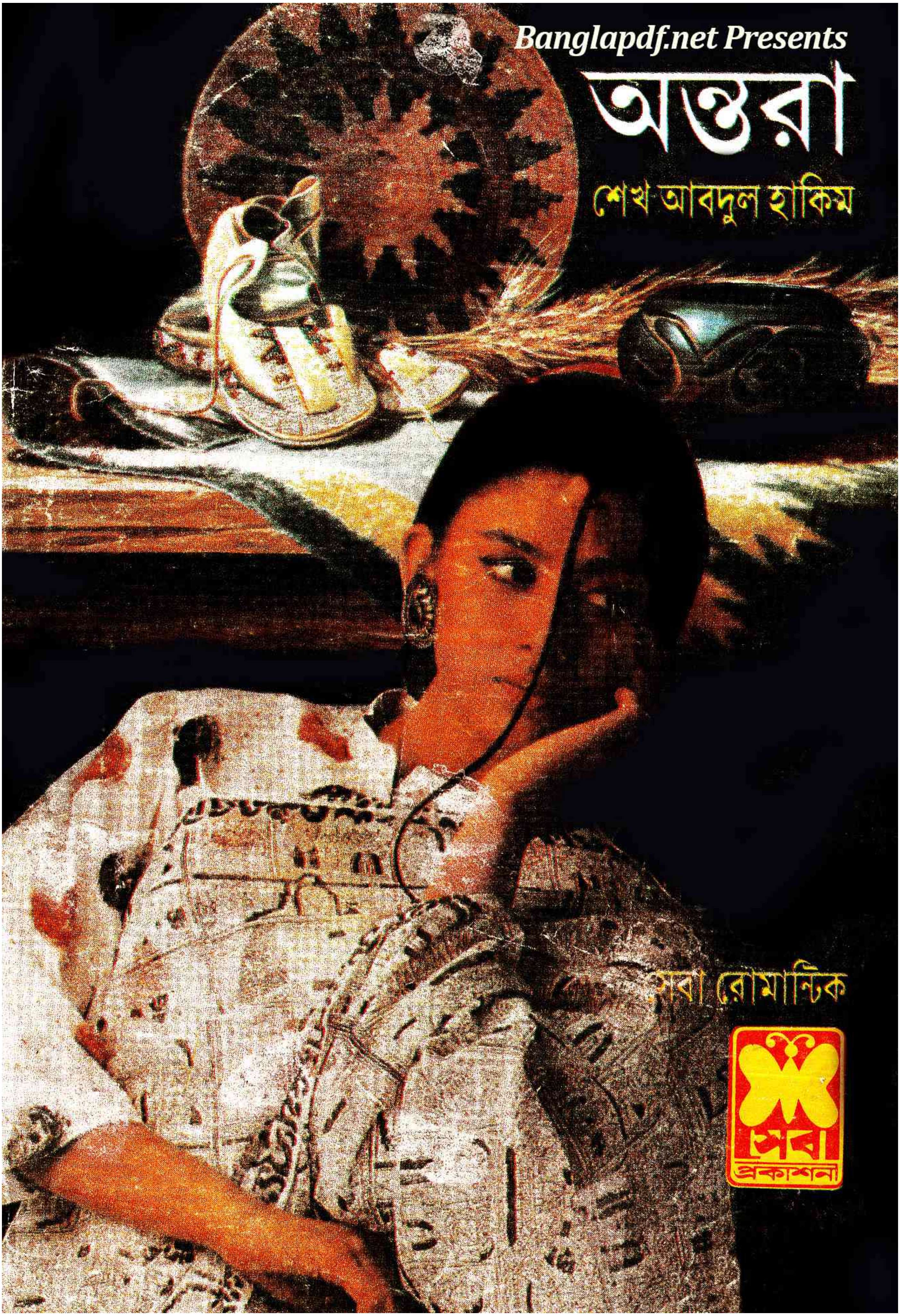
Banglapdf.net Presents
অন্তরা
শেখ আবদুল হাকিম
সেবা রোমান্টিক
সেবা
প্রকাশনা

সেবা রোমান্টিক

অন্তরা

শেখ আবদুল হাকিম

মানে দাঁড়াল, সম্পর্কটা শেষ হয়ে গেছে।
তা হয়তো হয়েছে, কিন্তু প্রেম?
নারায়ণগঞ্জে আসার পর এমন একটি দিন যায়নি
যেদিন মাসুদুর রহমানের কথা ভেবে
বালিশে মুখ লুকিয়ে কাঁদেনি অন্তরা।
ও জানে, এটাই ওর প্রথম ও শেষ প্রেম।

সম্পর্ক নেই, কিন্তু ভালবাসা আছে।
আর ভালবাসা আছে বলেই তাকে দেখতে চাওয়ার,
তার কাছাকাছি থাকার একটা ব্যাকুলতাও আছে।
সিদ্ধান্ত নিল অন্তরা—
যাবে ওর কাছে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

সেবা প্রকাশনী থেকে রোমান্টিক উপন্যাস ৩৫

অন্তরা

শেখ আবদুল হাকিম

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16 0119 2

প্রকাশক:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ মে, ১৯৯৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আলীম আজিজ

রচনা: বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রাকর:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা:
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রুম:
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ANTORA
By: Sheikh Abdul Hakim

চব্বিশ টাকা

অন্তরা

শেখ আবদুল হাকিম

'সেবা রোমান্টিক'-এর ক'টি বই

খন্দকার মজহারুল করিম

সেই চোখ, তোমার জন্যে, জানিনা কখন, আমরা দুজনে, চন্দনের বনে, নও শুধু ছবি, সোনালী গরল, অনুরূপা, তুমি আছ আমি আছি, এক প্রহরের খেলা, দূর আকাশের তারা, অরণ্যের গান ১ ও ২, অতল জলের আহ্বান, একটি মাধবী, হাতে রাখো হাত, একটুখানি চাওয়া, ছায়া ঘনায়, বর্ষারাতের শেষে, ময়ূরী রাত, নীল ধ্রুবতারা।

রোকসানা নাজনীন

বন্দী অপ্সরা, ফিরিয়ে দাও ১ ও ২।

বাবুল আলম

স্বপ্ন নিয়ে, লাল রিবন, সংশয়।

মোস্তাফিজুর রহমান

ছলনাময়ী।

বিশু চৌধুরী

অচেনা পরবাসী।

খসরু চৌধুরী

তবু অচেনা।

শেখ আবদুল হাকিম

নগ্ন প্রাচীর ১ ও ২, সে আমার, একা আমি।

এক

রবি ঠাকুরের মূর্তি থেকে শুরু করে ইমিটেশন গহনা, বেতের সৌখিন চেয়ার, পেইন্টিং-ড্রয়িং, তামার বাসন-কোসন, বাটিক, দেয়াল সাজাবার সরঞ্জাম, হাতে বোনা কাপড়, কি না পাওয়া যায় দোকানটায়। এলিফেন্ট রোডে এরকম দোকান আরও বেশ ক'টা আছে, তবে 'শোভা'-র কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য খুব সহজেই খদ্দেরদের নজর কাড়ে। তার মধ্যে একটি, সুন্দর নারীমুখ। আরেকটি, হস্তশিল্প; খদ্দেরের চোখের সামনে বানিয়ে দেয়া হবে। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, কাঁচ ঢাকা জানালার সামনে বসে, ফুটপাতের একেবারে কাছে, কাদা-মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ছে প্রৌঢ় এক কুমোর, তার উদোম গা চকচক করছে ঘামে, ঠোঁটে ঝুলছে নিভে যাওয়া বিড়ি। ওই জায়গায় বসে জাপানী এক শিল্পী কিছুদিন কাপড়ের পুতুল তৈরি করেছেন, কোলকাতার বিখ্যাত আর্টিস্ট সৌমেন মিত্র এঁকেছেন স্কেচ, বাঁশি বাজিয়েছে ফরিদপুরের অখ্যাত এক রাখাল। ফুটপাত থেকে কাঁচের দেয়াল ভেদ করে ভেতরে তাকালে এখন দেখা যাবে যৌবন ও তারুণ্য সমৃদ্ধ একটি নারীদেহ। জায়গাটা সম্প্রতি দখল করেছে অন্তরা ও তার তাঁত। ফুটপাত থেকে সবাই দেখতে পায়, আপন মনে কাপড় বুনছে অন্তরা।

কাঁচ ঘেরা জায়গাটার তিন দিকে রাজ্যের হস্তশিল্প। নকশি কাঁথা থেকে শুরু করে তামা-কাঁসার পানের বাটা বা ফুলদানি, সবই পাওয়া

যাবে। ওগুলোর ভিড়ে এই মুহূর্তে সুদর্শন এক পুরুষমূর্তি শোভা পাচ্ছে, তা-ও যেন হস্তশিল্পেরই একটি উৎকৃষ্ট নমুনা হিসেব আছে ওখানে। শিল্পই বটে, তবে ওটা গড়েছে স্বয়ং ঈশ্বরের হাত। একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায় না, পৌরুষ ও সৌন্দর্যের এতই বিপুল সমারোহ।

দোকানটার মালিক শরিফ সিকদার ওরফে শিপলু, অন্তরার ফুফাত ভাই। শিপলু আর সীমা, স্বামী-স্ত্রী দু'জন মিলে চালায় ব্যবসাটা। তাদের অনুপস্থিতিতে সব দায়িত্ব এখন অন্তরার। অন্তরার ভাবী সীমা 'শোভা'-র অন্যতম আকর্ষণ, এমন চোখ ধাঁধানো নারীমুখ খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

শোভার আরেকটা বৈশিষ্ট্য, কাউন্টারের পাশে কফি মেশিনটা। ওটাও ফুটপাত থেকে দেখা যায়, খদ্দের কেউ ভেতরে ঢুকলেই সাদরে এক কাপ কফি খাওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এই মুহূর্তে মেশিনটা থেকে কাপে কফি ঢালছে সুদর্শন পুরুষমূর্তিটি, ঈশ্বর যাকে নিজের হাতে গড়েছেন। ওর নাম কবির সিকদার ওরফে শুভ্র, শিপলুর আপন ভাই। অন্তরা লক্ষ করল, কফি ঢালার সময় শুভ্রর হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে।

সে বলল, 'দোহাই লাগে, অন্তরা! শিপলু ভাইয়ের ফোন নম্বরটা দাও। ওর সাথে যেভাবে হোক যোগাযোগ করতে হবে আমাকে। তুমি আমার বিপদটা বুঝতে পারছ না!'

'না,' স্পষ্ট জানিয়ে দিল অন্তরা। 'এ-সব কথা শিপলু ভাইকে জানানো চলবে না। তার শরীর মোটেই ভাল নয়। আমাকে তুমি একটু চিন্তা করে দেখতে দাও, শুভ্র।'

শুধু পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে নয়, একটু বেশি আলো পাবার জন্যেও ছোট হ্যাণ্ড-লূমটা কাঁচ ঢাকা জানালার সামনে বসানো হয়েছে। গত কয়েকদিন থেকে দোকানে এটাই অন্তরার নিজের জায়গা। তাঁতের কাছে ফিরে এসে বসল অন্তরা, কাঁচ ভেদ করে দৃষ্টি

চলে গেল ফুটপাত ও রাস্তার ওপর। রাত আটটা, দোকান বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে। রাস্তায় অবশ্য গাড়ি ও লোকজনের ভিড় একটুও কমেনি। এত লোক আসা-যাওয়া করছে, সুবেশী ও সুদর্শন তরুণ তাদের মধ্যে কতই তো, তবু কেউ তারা শুভ্রর মত নয়। ঘাড় ফিরিয়ে কাউন্টারের দিকে তাকাল অন্তরা। দেখামাত্র ভাল লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে ওর গোটা অস্তিত্বে, এমনই সৌম্যকান্তি চেহারা তার। আরেকটু লম্বা-চওড়া ও ফর্সা হলে অনায়াসে গ্রীক দেবতা বলে চালিয়ে দেয়া যেত শুভ্রকে। ফুফাত ভাইটির দিকে চোখ রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অন্তরা। আবার নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটেছে, তা না হলে এরকম নার্ভাস হয়ে পড়ত না সে। এতই নার্ভাস যে সব কথা ওকে খুলে বলার মত ধৈর্যও তার নেই। বারবার প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পায়নি অন্তরা।

আজই প্রথম নয়, এর আগেও কয়েকবার এ-ধরনের ঘটনা ঘটেছে। দুর্বল কৌতুক ও খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে গেছে শুভ্র, আসল ঘটনা খুলে বলেনি। অন্তরার চোখে পলকহীন ঠাণ্ডা দৃষ্টি ফুটল। এমনিতে ওর টানা টানা দুই চোখ ঘন কালো, কোমল মায়া ও সোহাগ-স্নেহে মাখামাখি, রঙিন ও পুলকবহুল স্বপ্ন দেখাবার নীরব আমন্ত্রণ। ওর আর্ট কলেজের বান্ধবীরা বলে, ওগুলো নাকি মাঝে মধ্যেই রঙ ও ভাষা বদলায়—কালো হয় আরও ঘন, নীরব আমন্ত্রণের জায়গায় ফুটে উঠে ব্যাকুল অনুরাগ। তবে বান্ধবীদের এ-সব কথা হেসেই উড়িয়ে দেয় অন্তরা, ব্যাপারটা সত্যি কিনা ভাবতে গিয়ে খানিকটা বিব্রতও হয়। সবচেয়ে বেশি লজ্জা পায় শুভ্রর কথা শুনে, কারণ প্রায়ই সে বলে, সুজান রুক-এর সঙ্গে ওর চেহারা নাকি বারো আনাই মেলে। কিন্তু এই মুহূর্তে শুভ্র দেখল, অন্তরার চোখ দুটোয় ঝড়ো ভাব, কালো তারার চারপাশে লালচে আভা, ওখানে যে নীরব হাসিটা ঝিকমিক নাচানাচি করে তার কোন অস্তিত্বই নেই।

অন্তরা যে তার প্রতি দুর্বল, শুভ্র তা খুব ভাল করে বোঝে। সেজন্যেই ওর দুর্বলতার সুযোগ নিতে আসে সে। মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করল অন্তরা। এর আগেও কয়েকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও, শুভ্রকে প্রশ্রয় দেবে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারেনি। শুভ্রর ম্লান মুখ, করুণ মিনতি, দেবতাসুলভ চেহারা, ভাবাবেগে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ওকে। শুভ্র তার নানা-নানী ও অন্তরা ওর দাদা-দাদীর কাছে মানুষ, অর্থাৎ একই বাড়িতে বড় হয়েছে ওরা। অন্তরার চেয়ে শুভ্র ছ'বছরের বড় হলেও, সমস্ত ব্যাপারে ওর ওপর যেভাবে নির্ভর করে সে তাতে অন্তরাকেই বড় বলে মনে হয়। দু'জনে ওরা খেলার সাথী ছিল এক সময়, আজ খেলাটা না থাকলেও সম্পর্কটা সেই আগের মতই আছে। সেই ছোটবেলা থেকেই অন্তরার ওপর অগাধ আস্থা শুভ্রর, বিপদে পড়লে ওর কাছে ছুটে আসার অভ্যেসটা আজও বদলায়নি। এর একটা কারণ হতে পারে, অন্তরার বুদ্ধি। আত্মীয়-স্বজনরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করে, ওর যা বুদ্ধির ধার, পুরুষ হয়ে জন্মালে কাজই হত। অন্তরার সবচেয়ে বড় গুণ, যে-কোন বিপদে শান্ত থাকতে পারে সে, সমস্যার একটা সমাধানও খুঁজে বের করে ফেলে। তবে সে গুণ যতটা অন্যের বেলা কাজে লাগে ততটা নিজের বেলা লাগে কিনা সন্দেহ আছে, কারণ দেখা গেছে নিজের সমস্যার সমাধান করতে প্রায়ই ব্যর্থ হয় অন্তরা।

ছোটবেলায় শুভ্রর ভক্ত ছিল ও। ওর এই ভক্তির সুযোগ নিতে তখন থেকেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে শুভ্র। বিশেষ করে নানা রকম অজুহাত তৈরি করে অন্তরার জমানো টাকা হাতিয়ে নিতে খুবই পটু হয়ে ওঠে সে। 'নানু পিটনি দিলে আমার খুব লাগে,' এ-কথা বলে কাপ-পিরিচ ভাঙার দোষ বহুবার অন্তরার ঘাড়ে চাপিয়েছে সে, যুক্তি দেখিয়েছে, 'তুমি ভেঙেছ জানলে নানু তোমাকে মারবে না।' ছোটবেলায় শুভ্রর প্রায় সব অপরাধ নিজের ঘাড়ে নিয়ে যথেষ্ট শাস্তি ভোগ করেছে

অন্তরা। বেশিরভাগ সময় শাস্তিগুলো স্বেচ্ছায় বা আনন্দের সঙ্গে নেয়নি বটে, তবে সেজন্যে শুভ্রর ওপর কোন রাগও পুষে রাখেনি। যখনকার ঘটনা তখনই ভুলে গেছে, মনে মনে ক্ষমা করে দিয়েছে শুভ্রকে। তাকে ভাল করার প্রবণতা ওর তখন থেকেই। আসলে সুস্থ সুন্দর জীবনযাপন করুক শুভ্র, ওর মনের মত হয়ে উঠুক, এই একটা দারুণ ব্যাকুলতা রয়েছে অন্তরার মনে। সেজন্যেই তাকে সাহায্য করার একটা তাগাদা ওর ভেতর কাজ করে। শুভ্র বিপদে পড়েছে দেখলে আজও বিচলিত বোধ করে, তার করুণ অবস্থার কথা ভেবে কান্না পায়। কেউ খুব কাছাকাছি এলে, এমন তো কতজনই আসে, তাঁদের সবার প্রতি অদ্ভুত একটা দুর্বলতা বোধ করে অন্তরা, ভাল বা খারাপ যা-ই বলা হোক এটা তার চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। ওর একুশ বছরের জীবনে শুভ্রকেই সবচেয়ে কাছাকাছি পেয়েছে, সেই ছোটবেলা থেকে। তার প্রতিই যে সবচেয়ে বেশি দুর্বল ও, এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে মুচকি হাসল শুভ্র, জানতে চাইল, কি ভাবছে অন্তরা। ফুফাত ভাইটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল অন্তরা। রঙওঠা জিনসের প্যান্ট, সাদা পপলিনের শার্ট পরেছে, পায়ে বিদেশী কেডস। রোজগার-পাতি ভাল নয়, তবু সব সময় ভাল কাপড়চোপড় পড়ে শুভ্র, জানে অন্তরা। দামী সেন্ট ব্যবহার করে সে। একদিন প্রশ্ন করায় বলেছিল, সেন্ট মাখি গন্ধ তাড়াবার জন্যে। কিসের গন্ধ? উত্তরে রহস্যময় হাসি হেসে চুপ করে ছিল শুভ্র। পরে অন্তরা জেনেছে, ফুলবাড়িয়া বাস ডিপোর কাছে একটা আড্ডায় নিয়মিত গাঁজা খেতে যায় সে। আরও একটা ব্যাপার জেনে ফেলেছে অন্তরা। আশ্চর্য একটা মেয়েকে ভালবাসে শুভ্র। আশ্চর্য মেয়েই বলতে হবে, কারণ কোন মেয়েকে তো আর বখাটে বলা যায় না। মেয়েটির নাম ফারজানা। সে নাকি পুরুষদের মত জিনস্ পরে, শার্ট গায়ে দেয়, কেডস পরে, গাঁজা ও হেরোইন খায়, প্রায়ই রাতে বাড়ি ফেরে না। কোন মেয়ের নিন্দা

করা অন্তরার স্বভাব নয়, যদি না সে ওর প্রিয় কারও কোন ক্ষতির কারণ হয়। ফারজানাকে দু'চোখে দেখতে পারে না ও, তার নাম শুনলে রীতিমত খেপে যায়, কারণ শুভ্রর অধপতনের জন্যে এই মেয়েটিই সবচেয়ে বেশি দায়ী বলে মনে করে ও। শুনেছে, যেখান থেকে যত টাকা পায় সবই ফারজানার পিছনে খরচ করে ফেলে শুভ্র। আরও শুনেছে, ঢাকা শহরে এ-ধরনের মেয়ে ফারজানাই একা নয়, এবং তাদের অনেকের সঙ্গেই খাতির আছে তার। অবশ্য এ-সব অভিযোগের কোনটাই আজ পর্যন্ত শুভ্রকে স্বীকার করানো যায়নি।

তাঁতের সামনে থেকে উঠে কাউন্টারের কাছে চলে এল অন্তরা। একটা কাপে খানিকটা কফি ঢালল, তবে চুমুক না দিয়েই বলল, 'শোনো, শুভ্র। শিপলু ভাইকে তুমি বিরক্ত করতে পারবে না। তুমি জানো, তার হার্টের অবস্থা ভাল নয়। ভাবীর সাথে কাল আমার টেলিফোনে কথা হয়েছে। গেছে চেক করাতে, কিন্তু ডাক্তার শেঠি বলেছেন, অবজারভেশনে থাকতে হবে কিছুদিন, তারপর তিনি বলতে পারবেন অপারেশন লাগবে কিনা। এ-সব কথা বলার সময় ভাবী কাঁদছিল। অপারেশন যদি করাতেই হয়, অনেক টাকার ব্যাপার। কিভাবে ম্যানেজ করা হবে, এখনও ওরা জানে না। এই অবস্থায় ওদের কাছে তোমাকে আমি টাকা চাইতে দেব না।'

ম্লান মুখে শুভ্র বলল, 'তাই নাকি? আমি জানতাম না।'

'তুমি কোন খবর রাখো নাকি যে জানবে,' শান্ত গলায় বলল অন্তরা।

'কবে ফিরবে ওরা? ভাবী কিছু বলল?'

'অপারেশন হলে তিন হপ্তার আগে নয়।'

মাথা নিচু করে শুভ্র বলল, 'সর্বনাশ!'

'কি হয়েছে, বলবে আমাকে?' জানতে চাইল অন্তরা।

শুভ্র মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে, অন্তরার কথা যেন শুনতে

পায়নি। বিড়বিড় করে বলল সে, 'আমাকে তাহলে লুকিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু কোথায় লুকাব? কে আমাকে জায়গা দেবে?' মুখ তুলে সিলিঙের দিকে তাকাল সে, তারপর অন্তরার চোখে। 'তুমি তো ওপরে আছ, তাই না?'

জানে শুভ্র, তবু জিজ্ঞেস করছে, ভাবল অন্তরা। এটা ওর ভান, আসলে উদ্বিগ্ন করে তুলতে চাইছে ওকে। দোকানের ওপরই তিন কামরার একটা ফ্ল্যাটে ভাবীকে নিয়ে থাকে শিপলু ভাই। কোলকাতায় যাবার আগে তাদের অনুরোধেই নারায়ণগঞ্জ থেকে এখানে এসে উঠেছে অন্তরা। একটু ভয় লাগল ওর, কে জানে মনে মনে কি মতলব আঁটছে শুভ্র। যাবার আগে শিপলু ভাই আর সীমা ভাবী যে-সব কথা বলে গেছে ওকে, ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। ওরা যাবার দু'হপ্তা আগে থেকেই রোজ কিছুক্ষণ করে দোকানে বসছিল অন্তরা, রওনা হবার দু'দিন আগে সীমা ভাবী বলল, 'অন্তরা, তুমি ভাই শুধু দোকান দেখলে চলবে না, আমাদের ফ্ল্যাটটাও তোমাকে পাহারা দিতে হবে।'

আর্ট কলেজ থেকে ফাইন্যাল পরীক্ষা দিলেও, হোস্টেল এখনও ছাড়েনি অন্তরা। কিন্তু হোস্টেল বন্ধ, তাই নারায়ণগঞ্জে দাদা-দাদীর বাড়িতে ফিরে যেতে হয়েছে তখন ওকে। ওঁরা ওকে ঢাকায় একা একটা বাড়িতে থাকতে দিতে রাজি হবেন কিনা, এ-কথা বলতেই শিপলু ভাই আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আমি টেলিফোন করে নানুর অনুমতি চেয়ে নেব, তাহলে তোর আর কোন আপত্তি নেই তো?'

অগত্যা মাথা কাত করে রাজি হতে হয়েছে অন্তরাকে। তারপর শিপলু ভাই ব্যাখ্যা করে বলল, 'তোকে এখানে থাকতে বলছি, কারণ শুধু যে চোরকে ভয় তা নয়, শুভ্রকেও বিশ্বাস নেই। এর আগে আমরা দু'দিনের জন্যে সিরাজগঞ্জ গেলাম যে-বার, দারোয়ানের কাছ থেকে চাবি নিয়ে এক রাত আমাদের ফ্ল্যাটে ছিল শুভ্র। ফিরে এসে দেখি টিভি আর ক্যামেরাটা নেই।

শুনে শুভ্রর ওপর রাগ হবার কথা অন্তরার, কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করলে তবে তো রাগের প্রশ্ন। শুভ্রর বিরুদ্ধে এ-ধরনের একটা অভিযোগ করায় বরং শিপলু ভাইয়ের প্রতি অসন্তুষ্টই হল ও। অভিযোগটা যে ভিত্তিহীন হতে পারে না, এটাও ওর জানা আছে। অসন্তোষের কারণ অন্যখানে। ছোট ভাই যদি কোন অপরাধ করেই থাকে, সবাইকে সেটা বলে বেড়াতে হবে নাকি? ব্যবসার কথা বলে শিপলু ভাইও তো কতবার তার নানুর কাছ থেকে মোটা টাকা ধার নিয়ে কখনও ফিরে দেয়নি। কই, ওর দাদু তো সে-কথা কাউকে বলে বেড়াচ্ছে না!

তারপর সীমা ভাবী বলল, 'কবে কি ঘটেছে, ওসব বাদ দাও তো। তাছাড়া, শুভ্র আমাকে কিরে কেটে বলেছে, ওগুলো ও নেয়নি।'

'সত্যি? বলেছে নেয়নি?' তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল অন্তরা, কি কারণে কে জানে বুকটা হঠাৎ হালকা হয়ে গেল ওর। 'কিরে কেটে যখন বলেছে, তখন সত্যি বোধহয় নেয়নি। শুভ্র এরকম একটা নোংরা কাজ করবে, এ বিশ্বাস করা যায় না।'

'তোকে বলেছে! ওর কীর্তিকলাপের ফিরিস্তি শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়,' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল শিপলু ভাই।

'তুমি থামো তো! এই বয়সে সবাই ওরকম এক-আধটু বাড়াবাড়ি করে!' শুভ্রর পক্ষ অবলম্বন করে সীমা ভাবী, অন্তরার দিকে ফিরে বলল, 'সাধারণত তোমার ভাই দোকানে ব্যস্ত থাকলে আমার কাছে আসে ও। আমি ওকে কোনদিন না খাইয়ে ছাড়ি না। ফ্রিজটা একেবারে ভরে রেখে যাচ্ছি, বিশ-পঁচিশ দিন তোমাকে কিছুই কিনতে হবে না। ফ্ল্যাটে তুমি একা আছ জানলে শুভ্র হয়ত রোজই দুপুরে খেতে চলে আসবে—মানা কোরো না, কেমন? কাজের বুয়াকে বলে রেখো, সে যেন দু'জনের মত রান্না করে।'

সীমা ভাবীর প্রতি মনটা খুশি হয়ে ওঠে অন্তরার।

'আমরা পৌঁছেই চিঠি লিখব তোকে,' বলল শিপলু ভাই। 'চিঠি পেলেই জবাব দিবি। তোর ইন্টারভিউটা কেমন হয়, জানাতে ভুলবি না কিন্তু। আর যদি জরুরী কোন খবর থাকে, আমার বন্ধুর নম্বরে টেলিফোন করবি...।'

ওরা চলে যাবার পরদিন বাংলাদেশ টেলিভিশনে চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দিয়ে এল অন্তরা। ভালই হল ইন্টারভিউ। কর্মকর্তাদের কথা শুনে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল ওর। মনে হল, ঠিক যেন ওকেই খুঁজছিলেন তাঁরা। চাকরিটা খুবই ছোট, বলা যায় মইয়ের সবচেয়ে নিচের ধাপ—অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিজাইনারের অ্যাসিস্ট্যান্ট। তবে যত ছোটই হোক, সূচনা তো বটে। খুবই উৎসাহ ও আশা দেয়া হয়েছে ওকে, দিন সাতেকের মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে যেতে পারে। অন্তরা বলে এসেছে, চাকরি হলে আগামী মাস থেকে কাজে যোগ দেবে ও।

পরদিন থেকে দোকানের দিকে মন দিল অন্তরা। জানালার সামনে বসে নতুন নতুন ডিজাইনের কাপড় বুনল। অদ্ভুত সাড়া পাওয়া গেল, একটা কাপড়ও বুনে শেষ করা গেল না, অগ্রিম টাকা দিয়ে কিনে নিল খদ্দেররা। উৎসাহ পেয়ে ওর হাতের আরও কিছু কাজ নারায়ণগঞ্জ থেকে দোকানে নিয়ে এল অন্তরা। রাতেও ফ্ল্যাটে বসে এটা-সেটা তৈরি করতে শুরু করল।

দোকানে কর্মচারী বলতে মমতা আন্টি আর জহির মিয়া। মমতা আন্টি চলিশোত্তীর্ণা বিধবা, বছর ছয়েক আগে তাঁর স্বামী মারা গেছেন। ছেলেপুলে নেই, বড় ভাইয়ের সংসারে থাকেন। অত্যন্ত রসিক মহিলা, সময় পেলেই কার্টুন আর প্রেমের উপন্যাসে মুখ গুঁজে দেন। জহির মিয়াই দোকানের একমাত্র পুরুষ কর্মচারী, মালিকের বাজার করা থেকে শুরু করে দোকান খোলা ও পরিষ্কার রাখা, সবই তার দায়িত্ব। অল্প বেতনে কায়-ক্লেশে বেঁচে আছে লোকটা, তবে তিনটি রত্নের গর্বিত পিতা সে। তার তিন ছেলেই মেধাবী, নিজেদের খরচে কলেজ ও

ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে। প্রৌঢ় জহির মিয়া দোকান ঝাঁট দিলে কি হবে, এমনকি দোকানের মালিক শিপলুও তাকে যথেষ্ট সম্মান করে।

প্রথম দু'দিন দোকানে বসে অন্তরা যে শুধু তাঁতে কাপড় বুনল তা নয় দোকানটাকে নতুন করে সাজিয়েও ফেলল। ওর আগ্রহ দেখে খুশি হলেন মমতা আন্টি, বললেন, 'তোমার সীমা ভাবী মাসখানেক ধরে স্বামীকে নিয়ে এত দুশ্চিন্তায় ছিল যে এদিকে কোন খেয়াল দিতে পারেনি। আমি একা, কতদিক সামলাই বলো।'

দোকান সাজাবার পর, তৃতীয় দিন, তাঁতে বসে কাজ করছে অন্তরা, কাউন্টার থেকে মাঝে মধ্যে দু'একটা কথা বলছেন মমতা আন্টি, জবাবে হুঁ-হাঁ করছে ও।

'একটা ব্যাপার আমি কিন্তু মেলাতে পারছি না,' বললেন তিনি। 'নাকি শুনতে ভুল করলাম—সত্যি তুমি সহকারী ডিজাইনারের চাকরির জন্যে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ইন্টারভিউ দিয়ে এসেছ, অন্তরা?'

'অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিজাইনারের অ্যাসিস্ট্যান্ট,' মৃদু হেসে বলল অন্তরা। মাথা নিচু করে কাজ করছে ও, মুখের দু'দিকে ভেলভেটের পর্দার মত কালো চুল আড়াল করে রেখেছে মুখটাকে। 'কি মেলাতে পারছেন না, মমতা আন্টি?'

'টিভির নাটক বা বিজ্ঞাপনে তোমার মত সুন্দর মুখের কদর তো হতেই হবে। বলা যায়, ওরা তোমাকে লুফে নেবে। কাজেই তুমি যখন বললে যে ইন্টারভিউ ভাল হয়েছে, ওরা তোমাকে আশা দিয়েছে, আমি একটুও অবাক হইনি। কিন্তু তারপর মনে পড়ল, তুমি বলেছ চাকরিটা ডিজাইনারের। ঠিক মিলল না। ডিজাইনারকে চাকরি দেয়ার জন্যে যারা তোমার ইন্টারভিউ নিয়েছেন, তোমাকে তারা দেখামাত্র বুঝতে পেরেছেন, ভুল জায়গায় নক করছ তুমি—কাজেই ইন্টারভিউ ভাল হয় কি করে? এই চেহারা নিয়ে ডিজাইনার, তা-ও আবার টিভিতে? আমি

হলে তোমার ইন্টারভিউ নিতেই রাজি হতাম না।'

হেসে ফেলল অন্তরা। 'আপনি তাহলে এভাবেই খদ্দেরদের মন গলান, তাই না, আন্টি?' মমতা আন্টি কোন জবাব দিচ্ছে না দেখে আবার বলল অন্তরা, 'দেখতে আমি হয়ত খারাপ নই, কিন্তু অভিনয় বা শো বিজনেস সম্পর্কে আমার কোনই আগ্রহ নেই। ও-সব আমার দ্বারা সম্ভব নয়, এটা জানি বলেই হয়ত।'

'মূলধন হল চেহারাটা, বাকি সব ট্রেনিং ও চেষ্টা...,' কথা শেষ করতে পারলেন না মমতা মামুন, অন্তরাকে ছাড়িয়ে কাচ ভেদ করে ফুটপাতে চলে গেল তাঁর দৃষ্টি। ফুটপাতে দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাকিয়ে আছেন শো কেসে সাজানো জিনিসগুলোর দিকে। মমতা মামুন লক্ষ করলেন, সুদর্শন ভদ্রলোক শুধু দোকানের জিনিসগুলোই দেখছেন না, দেখছেন অন্তরাকেও, তবে চোরা দৃষ্টিতে। ফুটপাতের কিনারা থেকে কাচের একেবারে কাছাকাছি চলে এলেন তিনি, সম্ভবত অন্তরাকে ভাল করে দেখার জন্যে। ওখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তাঁতের কাজ দেখলেন, তারপর আবার চুলে ঢাকা অন্তরার মুখের দিকে তাকালেন। 'তোমার একজন ভক্ত জুটেছে বলে মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করলেন মমতা মামুন। 'দয়া করে ভেতরে ঢুকে কিছু কিনলে ভারি খুশি হই। আগেও বেচারাকে ঘুর ঘুর করতে দেখেছি আমি। ঢক-ঢং দেখে দারুণ লাগে, মানে হাই-ফাই বলে মনে হয়।'

'আপনি না!' হাসি চেপে মুখ তুলল অন্তরা, ঘাড় ফিরিয়ে ফুটপাতের দিকে তাকাল। অদ্ভুত একজোড়া চোখ, কৌতুকে ভরা, ওর দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। চোখাচোখি হল, তারপর আর দু'জনের কারও দৃষ্টিই নড়ে না। তাকিয়ে থাকল অন্তরা, যতক্ষণ না অনুভব করল গরম হয়ে উঠছে মুখ। লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিল তাড়াতাড়ি, ভাবল নিশ্চয়ই লালচে হয়ে উঠেছে ওর চেহারা। কাপড় বোনার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল হাত দুটো, তবে ভাবছে ভদ্রলোকটির কথাই। একবার

চোখ বুলিয়েই বুঝে নিয়েছে, যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া কাঁধ দুটো। ঢেউ খেলানো কালো চুল, ব্যাকব্রাশ করা। অ্যাশ কালারের কমপ্লিট স্যুট পরে আছেন, টাইয়ের রঙ ম্যাজেণ্টা। চোখে কৌতুক থাকলেও, দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ, একটু যেন বেশি তীক্ষ্ণ। কোন মেয়ের দিকে এতটা ধারাল দৃষ্টিতে তাকাতে হলে অধিকার থাকা চাই, যে অধিকার দেয় শুধু বিশেষ একটা সম্পর্ক। তবে তাঁর এই দৃষ্টির পিছনে যদি শুধুই পেশাদারী কোন আগ্রহ থাকে তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।

অন্তরা সাধারণত নিজের কাজে মগ্ন থাকে, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কে ওকে দেখছে না দেখছে সেদিকে খেয়াল দেয় না। তবে মমতা মামুনের কথা থেকে আগেই জেনেছে ও, কাচটার সামনে অনেকেই দাঁড়ায়, কেউ কেউ অনেকক্ষণ ধরে। মাঝে মধ্যে মুখ তুলে অন্তরা যে তাকায় না, তা নয়। বেশিরভাগ সময় অল্প বয়েসী তরুণদের দেখেছে ও, ওর সম-বয়েসী বা দু'এক বছরের বড়। এদেরকে তেমন গুরুত্ব দেয় না অন্তরা, এরা কেউ সমস্যা সৃষ্টি করলে কিভাবে সামলাতে হয় জানে। কলেজে থাকার সময় এ-সব ওর শেখা হয়ে গেছে, কারণ পিছু লাগে এই আনাড়ি বালকরাই।

কিন্তু দীর্ঘদেহী এই লোকটার মধ্যে এমন কিছু আছে...।

যুবকই, তবে বয়েস একেবারে কম নয়।

'তাকিয়ে থাকতে তো আর পয়সা লাগে না, তাই তাকিয়ে আছে,' মমতা আন্টিকে বলল অন্তরা। ভাবল, মুখের লালচে ভাবটুকু দেখে না থাকলেই বাঁচি। ভদ্রলোক চলে গেছে শুনে খুশি হয়ে উঠল মন। ইন্টারভিউয়ের কথাটা মনে পড়ে গেল। বোর্ডের সদস্যারা ওকে নিয়ে প্রায় মেতে উঠেছিলেন, যদিও কথাটা কাউকে বলেনি সে। অনুরোধ করায় নিজের কিছু কাজ টেলিভিশন ভবনে রেখে এসেছে ও। মনে মনে অন্তরা জানে, চাকরিটা ও-ই পাবে এমন আশা করাটা উচিত নয়, কারণ আরও বহু ছেলেমেয়ে ইন্টারভিউ দিয়েছে। অনেকেরই ধরা-

করার লোক থাকে, কিন্তু ওর সেরকম কেউ নেই। উচিত নয় জেনেও নিজেকে বশে রাখতে পারছে না ও, ধরে নিচ্ছে চাকরিটা ও-ই পাবে।

অন্তরার ইচ্ছে নিজের একটা ফার্ম করা। অভিজ্ঞতার দরকার ওর, দরকার কানেকশন। সেজন্যেই ভাল কোথাও একটা চাকরি পেতে হবে ওকে। হস্তশিল্প ও ডিজাইন, দুটোতেই অনেক কিছু করার সুযোগ আছে, মানুষকে চমকে দেয়া যায়। দেশী কাচামাল ব্যবহার করে দৈনন্দিন কাজে লাগে এমন সব জিনিস বানানো যায়, বিদেশীরা দেখলে হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

'অন্তরা,' বলল শুভ্র। 'তুমি যেন এই জগতেই নেই।'

দিবা স্বপ্নটা ভেঙে গেল, প্রায় চমকে উঠে বাস্তবে ফিরে এল অন্তরা। 'না, মানে...তোমাকে বললাম না চিন্তা করে দেখতে হবে? ভাবতে গিয়ে দুনিয়ার কথা মনে পড়ে গেল। দুঃখিত, শুভ্র। তুমি বরং সব কথা খুলে বলো আমাকে। ঠিক কি করেছ, ব্যাপারটা কতটুকু সিরিয়াস। একেবারে প্রথম থেকে শুরু করো। কিছু যেন বাদ না পড়ে।'

শুভ্র ম্লান মুখে বলল, 'সমস্যা তো একটা নয়, দুটো। কিন্তু সব কথা তোমাকে বলতে ভয় করছে আমার। তুমি হয়ত বুঝবে না।'

'বুঝিয়ে বললে বুঝব না কেন! চেষ্টা করে দেখো।' তাঁতের কাছ থেকে উঠে শুভ্রর পাশে, কাউন্টারের সামনে একটা চেয়ারে এসে বসল অন্তরা, মুঠো করা দু'হাতে চিবুক ঠেকিয়ে তাকিয়ে থাকল তার মুখের দিকে।

কোন কিছু না লুকিয়ে নিজের বোকামির একটা দুঃখজনক কাহিনী শোনাল শুভ্র। অসৎ সংসর্গে সর্বনাশ হয়ে গেছে তার, জুয়া আর নেশা তাকে আত্মহত্যার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে ফারজানা, তার শখ-সাধ মেটাতে গিয়ে ব্যাংক ও অফিস থেকে প্রচুর দেনা করেছে শুভ্র। একটা গার্মেন্টস-এ চাকরি করে সে,

অ্যাকাউন্ট সেকশনে আছে, ক্যাশ ভেঙে খরচ করে ফেলেছে বিশ হাজার টাকা। টাকাটা দু'একদিনের মধ্যে ফিরিয়ে দিতে না পারলে নির্ঘাৎ জেলে যেতে হবে তাকে।

কাহিনীটা থেমে থেমে শোনাল শুভ্র। সে থামলে মাথা ঝাঁকিয়ে, দু'একটা শব্দ করে তাকে উৎসাহ দিল অন্তরা। মুখের দু'পাশে ঝুলে আছে কালো চুল, চোখ দুটো বিষণ্ন, টিউবের আলো লেগে চকচক করছে নরম মুখ আর সরল ছোট নাক। অনুরোধ করলে সব কথা স্বীকার করে শুভ্র, কিছুই ওর কাছে গোপন করে না, এটা তার একটা মস্ত গুণ বলে মনে হয় অন্তরার। তাকে ভাল লাগার এটাও একটা কারণ। কিন্তু অন্তরা ভেবে পায় না, নিজের জীবন আর ভবিষ্যৎ এভাবে কেন সে নষ্ট করছে। তার নানা-নানী অর্থাৎ অন্তরার দাদা-দাদী সব রকম সুযোগই তো দিয়েছিলেন শুভ্রকে, কলেজ জীবন পর্যন্ত সে-ও খুব ভাল ছিল। কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার পর থেকে প্রায় হঠাৎ করেই বদলে গেল সে। মাস্তান আর বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করল, মেতে উঠল ফারজানার মত বাজে একটা মেয়েকে নিয়ে। গত দু'বছরে ছল-চাতুরি করে সে তার বুড়ো নানুর কাছ থেকে প্রায় এক লাখ টাকা আদায় করে নিয়েছে। নারায়ণগঞ্জে একটা বাড়ি ছাড়া আর কিছু নেই তাঁর, যা ভাড়া পান তাই দিয়ে বুড়িকে নিয়ে কোনরকমে চলেন তিনি। পেনশনের এককালিন টাকাটা পেয়ে খরচ করেননি, রোগ-শোকের কথা ভেবে রেখে দিয়েছিলেন, ভুল বুঝিয়ে সেটাও মেরে দিয়েছে শুভ্র। এখন আর তার ওঁদের কাছে যাবার মুখ নেই। অন্তরার দাদু তো পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, তিনি শুভ্রর মুখ পর্যন্ত দেখতে চান না।

কেউ যদি স্বেচ্ছায় নিজের ক্ষতি করে, কেউ তাকে সাহায্য করতে পারে না। অন্তত টাকা-পয়সা দিয়ে শুভ্রকে সাহায্য করবেন না, এ-কথা শিপলু ভাইও বলে দিয়েছে। তারপরও টাকার জন্যে আসে শুভ্র,

শিপলু ভাইকে গোপন্ করে পঞ্চাশ-একশো টাকা তার হাতে গুঁজে দেয় সীমা ভাবী। মাঝে মধ্যে অন্তরাও দেয়। তবে একসঙ্গে এত টাকা কখনও চায়নি শুভ্র। সে যে খুব বড় বিপদেই পড়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। না, বিশ হাজার টাকা ওর কাছে চায়নি শুভ্র, শুধু জানিয়েছে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে ওই টাকাটা লাগবে তার। এটা নাকি তার এক নম্বর বিপদ। আরও একটা আছে।

'সেটাও শুনি, বলো,' নিস্তব্ধতা ভাঙল অন্তরা, তাকিয়ে আছে দোকানের বাইরে। ন'টা বাজতে চলল, ফুটপাতে লোকজন কমে গেছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আশপাশের দোকান-পাট।

'এটাই আসল সমস্যা, অন্তরা,' বলল শুভ্র। 'টাকাটা যদি শুক্রবারের মধ্যে যোগাড় করতে না পারি, স্রেফ আত্ম···মানে, কি করব জানি না আমি!'

'ঠিক আছে, একবার তো শুনলামই,' গলায় ঝাঁঝ আনার চেষ্টা করলেও, ব্যর্থ হল অন্তরা। শুভ্রর জায়গায় অন্য কেউ হলে এতক্ষণে কঠিন কোন কথাই শোনাতে বাকি রাখত না। কিন্তু শুভ্রর ওপর কখনোই রাগ করতে পারে না ও। তার এই অধপতনের জন্যে, মনের গভীরে, নিজেকেও খানিকটা দায়ী করে অন্তরা। শুভ্রর ওপর আরও খেয়াল রাখা উচিত ছিল ওর, উচিত ছিল আজেবাজে মেয়ের খপ্পরে তাকে পড়তে না দেয়া। একা একা প্রায়ই ভাবে, আমি যদি ওকে আরও একটু বেশি সঙ্গ দিতাম, তাহলে হয়ত এতটা নষ্ট হবার সুযোগ পেত না সে। কখন কোথায় যায়, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করে, এ-সব দিকে নজর রাখা উচিত ছিল। শুধু নিজেকে নয়, শিপলু ভাইকেও খানিকটা দায়ী বলে মনে করে অন্তরা। নিজের ব্যবসা আর সংসার নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকে শিপলু ভাই যে শুভ্র কি করছে না করছে সেদিকে কখনোই মনোযোগ দেয়নি। 'এবার তোমার দ্বিতীয় সমস্যার কথা বলো।'

'দ্বিতীয় সমস্যা...দ্বিতীয় সমস্যা হল...ফারজানা জেদ ধরেছে তাকে আমার বিয়ে করতে হবে।'

কথাটা শুনে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল অন্তরার, ঘৃণায় রীতিমত বমি পেল। ওর আর্ট কলেজের বান্ধবী তানির মুখে শুনেছে, ফারজানা নেশা তো করেই, একশো একটা ছেলের সঙ্গে রাতও নাকি কাটায়। 'ছি-ছি, শুভ্র! এরকম নোংরা একটা মেয়েকে তুমি বিয়ে করার কথা ভাবতে পারলে?'

'না!' চাপা গলায় বলল শুভ্র, চেহারায় ব্যাকুল একটা ভাব। 'ওকে বিয়ে করার প্রশ্নই ওঠে না!'

'প্রশ্ন যদি না ওঠে, বিয়ে করার জন্যে সে জেদ ধরছে কেন?'

'তার ধারণা, আমি তাকে ভালবাসি... ।'

'কিন্তু বলতে চাইছ, বাসো না? ভাল যদি না-ই বাসবে, তার সাথে তোমার সম্পর্কটা কি?'

'সম্পর্কটা বন্ধুত্বের,' বলল শুভ্র। 'স্বীকার করি, আমার তরফ থেকে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। যখন যা চেয়েছে দিয়েছি, কোথাও বেড়াতে যেতে চাইলে নিয়ে গেছি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওকে আমি বিয়ে করব। আমার সাথে যে সম্পর্ক, আরও অনেকের সাথে সেরকম সম্পর্ক আছে ফারজানার। কেউ আমরা ওকে বিয়ে করার কথা ভাবি না।'

কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না অন্তরা। গোটা বিষয়টাই ওর কাছে আলোচনার অযোগ্য, নোংরা বলে মনে হল। খানিক পর বলল, 'তা, কি করবে বলে ভেবেছ?'

'ফারজানা সাংঘাতিক মেয়ে, মানে যাকে বলে একেবারে নাছোড়-বান্দা,' বিড়বিড় করে বলল শুভ্র। 'এই বিপদ থেকে বাঁচার একটাই উপায় ছিল, ওকে বলেছি আমি অন্য একটা মেয়েকে ভালবাসি, অনেক আগেই তাকে কথা দিয়ে রেখেছি বিয়ে করব বলে।'

'সত্যি সেরকম কেউ আছে নাকি? কাউকে ভালবাসো?'

মাথা নেড়ে শুভ্র বলল, 'আমি কি ভাল ছেলে নাকি যে কেউ আমাকে ভালবাসবে?'

'ভাল ছেলে হতে কেউ যেন তোমাকে বাধা দিচ্ছে! চেষ্টা করলেই তো পারো, হও না কেন! তা আরেকজনকে ভালবাসো শুনে কি বলল ফারজানা?'

'সেটাই তো সমস্যা। সে আমার কথা বিশ্বাস করেনি। কাকে ভালবাসি জানতে চেয়েছে সে। সত্যি কিনা পরীক্ষা করে দেখবে।'

'শুনে কি বললে তুমি?'

'আ-আমি...মানে তু-তুমি...মানে...।'

'অমন তোতলাচ্ছ কেন?'

'না, মানে, ফারজানাকে আমি বলেছি, যে-মেয়েটিকে ভালবাসি সে আমার মামাতো বোন। মানে, তোমার কথা বলেছি।'

'কি! আমার কথা বলেছ!' শিরশির করে উঠল অন্তরার শরীর। 'শুভ্র!'

হঠাৎ খপ করে অন্তরার একটা হাত চেপে ধরল শুভ্র। 'অন্তরা, প্লীজ, ভাই! একমাত্র তুমিই আমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে পারো। কোথাও যেতে হবে না তোমাকে, শুধু কেউ প্রশ্ন করলে বলতে হবে—হ্যাঁ, শুভ্রর সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, ব্যস। ফারজানা হয়ত তোমারই কোন বান্ধবীকে দিয়ে জিজ্ঞেস করাবে। এইটুকু অভিনয় আমার জন্যে করতেই হবে তোমাকে। বিয়ে করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে ফারজানা, দু'এক মাসের মধ্যে ঠিকই কাউকে ফাঁসাবে সে। শুধু এই ক'টা দিন কেউ যাতে টের না পায় যে তুমি অভিনয় করছ। কি, অন্তরা, আমার জন্যে এটুকু তুমি করবে না?'

আলগোছে হাতটা ছাড়িয়ে নিল অন্তরা। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল ও। শুভ্র একটা পাগল ছাড়া কি। ভালবাসতে বলছে না, বলছে ভালবাসার

অভিনয় করতে। হাসি পেল অন্তরার, আবার দুঃখও লাগল। কৃত্রিম নয়, আসল জিনিসটাই পেতে পারত সে, না চাইতেই, শুধু যদি নিজেকে সুন্দর রাখতে পারত।

তবু অন্তরা চায়, ভাল থাকুক শুভ্র, সুখী হোক। ফারজানাকে বিয়ে করবে সে, এটা দেখতে চায় না। ভালবাসার ভান করাটা কঠিন কোন ব্যাপার নয়, শুভ্রর ভাল হবে জানলে এরচেয়ে কঠিন কাজও করতে রাজি আছে ও। 'এর মধ্যে অন্য কোন ব্যাপার নেই তো?' জিজ্ঞেস করল অন্তরা। 'কেউ জিজ্ঞেস করলে আমাকে শুধু তোমার শেখানো কথাটা বলতে হবে, ব্যস?'

'হ্যাঁ। প্লীজ, অন্তরা!'

'ঠিক আছে, বলব।'

'সত্যি তো? কথা দিচ্ছ?' ব্যাকুল চোখে অন্তরার দিকে তাকাল শুভ্র।

'দিলাম কথা। কিন্তু তোমাকেও কথা দিতে হবে, ওই মেয়ের সাথে আর কোন সম্পর্ক রাখবে না তুমি।'

'ঠিক আছে, কথা দিলাম, রাখব না সম্পর্ক।'

নার্ভাস হাসি দেখা গেল শুভ্রর ঠোঁটে। একটা আঙুল খাড়া করল সে, ছোটবেলায় যেমনটি করত। এটা ওদের নিজস্ব একটা ব্যাপার, আঙুলে আঙুল ছুঁইয়ে তিন সত্যি উচ্চারণ করা। হেসে ফেলে অন্তরাও ওর একটা আঙুল খাড়া করে শুভ্রর তর্জনীটা ছুঁয়ে দিল, নিচু গলায় দু'জন একসঙ্গে বলল, 'সত্যি।' আরও দু'বার দুটো আঙুল খাড়া করল শুভ্র, অন্তরা সেগুলো নিজের আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে বিড়বিড় করে দু'বার বলল, 'সত্যি।' ছোটবেলায় নিয়ম ছিল, একদিন অন্তর, দেখা হলেই আবার নতুন করে আঙুল ছোঁবে ওরা।

'যাক, একটা সমস্যা থেকে বাঁচলাম।' গম্ভীর সুরে বলল শুভ্র, চেয়ারটায় নড়েচড়ে বসল। 'সত্যি আমি কৃতজ্ঞ, অন্তরা। তোমার এ

উপকারের কথা কোনদিন ভুলব না।'

'এবার নিজের দিকে একটু তাকাও, শুভ্র,' নরম সুরে বলল অন্তরা। 'আমি জানি, ইচ্ছে করলেই তুমি সমস্ত বাজে অভ্যেস ঝেড়ে ফেলে সুস্থ...থাক, আমি তোমাকে কোন উপদেশ দিতে চাই না।'

'বিশ্বাস করো, অন্তরা, নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, বাজে আড্ডা আর নেশা সব আমি ছেড়ে দেব।'

'কত টাকা যেন বলছিলে?' জানতে চাইল অন্তরা, চেষ্টা করল গলাটা যেন না কাঁপে।

'বিশ হাজার।'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল অন্তরা। টিউশনি করে, ছবি এঁকে, কাপড়ে নকশা তুলে গত দু'বছর ধরে ব্যাংকে নিজের নামে যে টাকাটা জমিয়েছে, সেটা হাতছাড়া করতে মন চাইছে না। বিশ হাজার টাকা। ওই বিশ হাজারই অন্তরার কাছে বিশ লাখের সমান। মা-বাপ মরা মেয়ে, দাদা-দাদী ছাড়া কেউ নেই আর। ওঁরা ক'দিন, তারপরই একা হয়ে যাবে অন্তরা। এখুনি বিয়ে করার কথা চিন্তায়ও আনে না ও, আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে ওকে। সে-কথা ভেবেই একটু একটু করে টাকাটা জমিয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার, বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে ওই বিশ হাজার টাকাই দরকার শুভ্রর, ওর সারাজীবনের সবটুকু সঞ্চয়। যেন তাকে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করার জন্যেই এতদিন ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছে অন্তরা, নিজের অজান্তে। 'কাল পাবে, বারোটার দিকে,' শুভ্রকে বলল ও, বলার পর উপলব্ধি করল, আসলে শুভ্রর বিপদের সময় চুপ করে থাকা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ওর এই ফুফাত ভাইটি এমন ভাবে জড়িয়ে আছে গোটা অস্তিত্বের সঙ্গে যে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারে না ও। 'টাকাটা নিয়ে যা খুশি করো তুমি, আমি কিছু বলতে চাই না। তবে, কেউ যেন না জানে, শুভ্র। কথা দাও।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল শুভ্র, হাত দুটো পকেটের ভেতর, হাঁ

করে তাকিয়ে আছে অন্তরার দিকে। 'সত্যি? সত্যি তুমি টাকাটা দেবে আমাকে?'

অন্তরা লক্ষ করল, শুভ্রর গলা কাঁপছে, মুখটা ফ্যাকাসে, শিশুর মত নিরীহ কালো চোখ দুটো আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। মনটা খুশি হয়ে উঠল ওর। টাকা পাবার প্রতিশ্রুতিটা সহাস্যে, সহজভাবে গ্রহণ করলে সহ্য করা কঠিন হত। না, অতটা খারাপ নয় শুভ্র, স্রেফ অলস ও দুর্বল। আর হয়ত বলা যায়, খানিকটা স্বার্থপর। নারীসুলভ কোমল একটা অনুভূতি জাগল ওর মনে। 'সত্যি দেব,' বলল ও। 'কিন্তু কেউ যেন জানতে না পারে। কেউ না। বিশেষ করে শিপলু ভাই আর ভাবী। কথা দিচ্ছ?' এমনিতেই অনেকে কানাকানি করে, শুভ্রর মত নষ্ট একটা ছেলের সঙ্গে এত কিসের কথা ওর। ও চায় না তাকে টাকা দেয়ার ব্যাপারটা কেউ জানুক। দুর্নামকে সাংঘাতিক ভয় পায় অন্তরা।

মাথা ঝাঁকাল শুভ্র। 'কথা দিলাম, কেউ জানবে না।' মাথায় হাত দিয়ে চুলগুলো সোজা করল সে। দেখল, তর্জনী খাড়া করে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে অন্তরা। আঙুলে আঙুল ছুঁইয়ে তিন সত্যি করল ওরা আবার।

অন্তরা জানে, শুভ্রকে দিয়ে তিন সত্যি না করিয়ে নিলেও চলত, নিজের স্বার্থেই কথাটা কাউকে বলবে না সে। ওর নিজের তো ফাঁস করার প্রশ্নই ওঠে না। একটা কথা ভেবে মনে মনে কৌতুক বোধ করল ও। শুভ্র যদি জানে যে টাকাটা তাকে দেয়ার পর ওর হাতে রিকশা ভাড়া ছাড়া প্রায় কোন টাকাই থাকবে না, কি প্রতিক্রিয়া হবে তার? ভাগ্য ভাল যে সীমা ভাবী ফ্রিজটা ভরে রেখে গেছে।

'বিশ্বাস করো অন্তরা, আমার যে কি উপকার হল...।'

তার দিকে তাকাল না অন্তরা, জহির মিয়াকে ডেকে দোকান বন্ধ করতে বলল। ইতিমধ্যে বিদায় নেয়ার জন্যে তৈরি হয়েছেন মমতা মামুন। হুক থেকে ছাতাটা নামালেন, এগিয়ে এলেন অন্তরার দিকে।

'গেলাম। জহিরকে বলে যাচ্ছি, কাল যেন সকাল সকাল দোকান খোলে।'

'ঠিক আছে,' বলে মৃদু হাসল অন্তরা।

'বেশি রাত জেগো না,' সাবধান করলেন মমতা মামুন। 'তোমাকে ক্লান্ত দেখালে দোকানে বেচাকেনা কম হবে,' উত্তরের জন্যে দাঁড়িয়ে না থেকে তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

'টাকাটা তোমাকে আমি ফিরিয়ে দেব,' অন্তরাকে বলল শুভ্র। 'ফারজানার সাথে মেলামেশা না করলে অনেক টাকা বাঁচবে আমার।'

'টাকাটা বড় কথা নয়, শুভ্র। বড় কথা হল লোকে কি বলছে। আমরা ভদ্র পরিবারের ছেলেমেয়ে, কেন কেউ আমাদের নামে আজেবাজে কথা বলার সুযোগ পাবে!' ফারজানার ওপর যতই রাগ থাক অন্তরার, সে যে সুন্দরী তা স্বীকার না করে উপায় নেই। ওকে খুশি করার জন্যে বলছে বটে মেলামেশা করবে না, কিন্তু শুভ্র তা পারবে কিনা সন্দেহ আছে। তবে বিয়ে করতে অস্বীকার করায় ফারজানা নিজেই হয়ত দূরে ঠেলে দেবে শুভ্রকে। তা যদি দেয়, সবদিক থেকে ভাল।

'আমি কিন্তু একসাথে ফেরত দিতে পারব না টাকাটা,' বলল শুভ্র। 'প্রতি মাসে কিছু কিছু করে দেব। যখন যা হাতে পাব—চারশো, পাঁচশো। ঠিক আছে?'

বেসিনের সামনে চলে এল অন্তরা, কাপগুলো ধুয়ে রাখছে। ক্ষীণ হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। 'ঠিক আছে। শোনো, শুভ্র, টাকাটা শোধ করার কথা আপাতত তোমাকে ভাবতে হবে না। যখন যা পারো দিয়ো। আমি চাই আগে তুমি নিজেকে ঠিক করো।' কাপগুলো ধুয়ে তুলে রাখল র‍্যাকে, এগিয়ে এসে একটা হাত ধরল শুভ্রর। 'চলো, ওপরে যাই। এ-সব বিষয়ে আর কোন কথা নয়। কাল বারোটায় এসে টাকাটা নিয়ে যেয়ো। আর, তোমার দোহাই লাগে, এরকম অন্যায়

কাজ আর কখনও কোরো না—প্লীজ, শুভ্র।'

'করব না,' আশ্বাস দিল শুভ্র। তাকে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে ফুটপাতে দাঁড়াল অন্তরা, জহির মিয়া দোকান বন্ধ করে ওর হাতে ধরিয়ে দিল চাবির গোছাটা। দোকানের পাশেই সিঁড়ি, জহির মিয়াকে বিদায় দিয়ে ওপরতলায় উঠে এল ওরা।

ফ্ল্যাটে ঢুকে নিজের ঘরে শুভ্রকে বসাল অন্তরা। বছর দুয়েক আগেও এই কামরাটায় শুভ্রই থাকত, গুরুতর একটা অন্যায় করে ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে যায় সে, তারপর থেকে পারতপক্ষে শিপুল ভাইয়ের সামনে আসে   চারদিকে চোখ বুলিয়ে কামরাটা দেখল সে। মাঝারি আকারের ঘরটাকে স্টুডিয়ো বানিয়ে ফেলেছে অন্তরা। একপাশে স্তূপ হয়ে রয়েছে রাজ্যের ক্যানভাস, আরেক পাশে একটা ছোট তাঁত। রঙ, তুলি, ইজেল, কাগজ, কাপড়, বেত, মখমল, ফিতে, কি না আছে। একবার তাকালেই বোঝা যায়, এখানে পরিশ্রমী একজন আর্টিস্ট বাস করে। দরজা খোলা, কিচেনে রাতের খাবার তৈরি করতে বসেছে অন্তরা। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল শুভ্র, চৌকাঠে হেলান দিয়ে ফারজানা ও অন্যান্য বন্ধুদের গল্প শুরু করল। তার কথায় খুব যে একটা মন আছে অন্তরার, তা নয়। ও তার চাকরির কথা ভাবছে। জীবনের প্রথম চাকরি, নতুন একটা জীবন। কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় হবে, কত অভিজ্ঞতা হবে। রীতিমত রোমাঞ্চ অনুভব করছে অন্তরা।

চাকরির কথাটা শুভ্রকে বলেই ফেলল ও। কৌতূহলী হল শুভ্র, জানতে চাইল বেতন কত। শুনে বলল, খুবই কম। একমত হল অন্তরা, তবে উৎসাহের সঙ্গে জানাল, অন্তত আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করা তো হবে। ডানা মেলতে চায় ও, নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে চায়। শুভ্রর চোখে কৌতুক, হাসছে সে। অন্তরাকে যেন এখনও ছোট খুকী ভাবছে সে। হাসতে হাসতেই মন্তব্য করল, 'কোন সন্দেহ নেই, তোমাকে তো নয়, সুজান রুককে হাতে পাবে ওরা। টিভির সবাই মুগ্ধ

হয়ে যাবে তোমাকে দেখে।'

পিছন ফিরে তাকাল অন্তরা, চোখে কৃত্রিম রাগ। 'আমি কি তাই বলেছি? কাউকে মুগ্ধ করতে বয়েই গেছে আমার! আমি শুধু চাকরিটা চাই, দেখাতে চাই কত রকমের কাজ জানি…।'

অন্তরাকে থামিয়ে দিয়ে শুভ্র বলল, 'তোমার রান্না শেষ হতে তো অনেক দেরি, তাই না? তার আগে এক কাপ চা খাওয়াতে পারো?'

'খুব পারি,' ব্যস্ত হয়ে উঠল অন্তরা। 'দূর ছাই, ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি আবার কফির চেয়ে চা-ই বেশি পছন্দ করো।' দেশলাই জ্বালার আওয়াজ পেয়ে আবার ঘাড় ফিরিয়ে শুভ্রর দিকে তাকাল ও, দেখল সিগারেট ধরাচ্ছে। 'সারা দিনে আজকাল ক'টা করে খাচ্ছ?' জানতে চাইল ও।

'খুব টেনশনে না থাকলে একেবারেই খাই না। আজ সারাদিনে এই একটাই ধরালাম।'

'টেনশন? তোমার সব সমস্যারই তো সমাধান হয়ে গেছে, আবার টেনশন কেন?'

'না, মানে,' বোকা বোকা, সরল হাসি শুভ্রর ঠোঁটে। 'এটা খাচ্ছি টেনশন মুক্ত হবার আনন্দে।'

কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল অন্তরা। উপদেশ দেয়া ওর স্বভাব নয়। ওর বিশ্বাস, উপদেশে কখনোই কোন কাজ হয় না।

'আগে তো গান-টান গাইতে, ওসব একেবারে ছেড়ে দিয়েছ নাকি?' খানিক পর অন্তরার হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে জানতে চাইল শুভ্র। 'ঘরে তো হারমোনিয়ামটা দেখছি না।'

'সময় পাই কোথায় যে গান করব?' লজ্জাটে হাসি ফুটল অন্তরার ঠোঁটে। 'তবে হারমোনিয়ামটা আছে। ক্যানভাসগুলোর নিচে চাপা পড়েছে কোথাও।'

'আজ একটা গান শোনাবে আমাকে?' নরম সুরে অনুরোধ করল

শুভ্র। 'অনেকদিন তোমার গান শুনি না।'

'গলাটা ভাল না, গাইতে ইচ্ছে না করার সেটাও একটা কারণ,' বলল অন্তরা। 'তবে মনে পড়ছে বটে, এক সময় আমার গানের একমাত্র ভক্ত ছিলে তুমি। দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, সংখ্যাটা বাড়েনি।'

দু'জনেই ওরা একসঙ্গে হেসে উঠল।

'বাড়েনি,' হাসি থামিয়ে বলল শুভ্র, 'তবে কমেওনি। এখনও আমি তোমার গানের একনিষ্ঠ ভক্ত। শোনাবে নাকি?'

'সত্যি শুনতে চাও?' নিচের ঠোঁট কামড়ে জিজ্ঞেস করল অন্তরা। 'মানে উদ্দেশ্যটা কি তোমার—গান শোনা, নাকি আমাকে খুশি করতে চাওয়া?'

'এভাবে কথা বললে আমি কিন্তু চলে যাব!' শুভ্রর চেহারায় অভিমান।

'ঠিক আছে, আর বলব না, ভুল হয়ে গেছে। শুনবেই যখন, একটু অপেক্ষা করো। রান্নাটা শেষ হোক আগে।' হাতঘড়ির ওপর চট করে একবার চোখ বুলাল অন্তরা। প্রায় দশটা বাজতে চলেছে। 'তুমি কিন্তু বেশ রাত করতে পারবে না, শুভ্র। একটার বেশি গাইব না আমি, ঠিক আছে? খেয়েই শুয়ে পড়তে চাই, কাল খুব ভোরে উঠতে হবে আমাকে।'

'কেন, ভোরে উঠতে হবে কেন?'

'দোকানে বেতের চেয়ারগুলো দেখেছ? নিজের হাতে কাপড় বুনেছি, গদির কাভার তৈরি করব। কয়েকটা করেছি, আরও কয়েকটা করতে হবে।'

ম্লান হয়ে গেল শুভ্রর চেহারা। 'তোমার যদি অসুবিধে হয়, আমি তাহলে এখুনি চলে যাই।'

'কি আশ্চর্য! এমন ভাব দেখাচ্ছ, তোমাকে যেন আমি তাড়িয়ে

দিচ্ছি! দু'জনের জন্যে রান্না চড়িয়েছি, দেখতে পাচ্ছ না?'

'তা পাচ্ছি,' বিড় বিড় করে বলল শুভ্র। 'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আজ রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেব। শিপলু ভাইয়ের ঘরের চাবি তো তোমার কাছেই, তাই না?'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না অন্তরা। ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা নিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করল। এটা শুভ্রর আপন ভাইয়ের ফ্ল্যাট। এখানে থাকতে চাওয়ার অধিকার তার আছে। তবে শিপলু ভাই ওকে বলেছেন, ভয় শুধু চোরকে নয়, শুভ্রকেও বিশ্বাস নেই তার। তাছাড়া, নিজের সুনামের কথাটাও ভাবতে হবে অন্তরাকে। সত্যি হোক মিথ্যে হোক, শুভ্র সম্পর্কে অনেক আজেবাজে কথা কানে আসে। মেয়েদের ব্যাপারে অসম্ভব দুর্বল সে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে একথাও ঠিক যে, ওর দিকে কখনও অন্যায় দৃষ্টিতে তাকায়নি শুভ্র। তাকালে ঠিকই টের পেত ও। তবু, ঝুঁকিটা অন্তরা নিতে পারে না। 'হ্যাঁ, চাবিটা আমার কাছেই। কিন্তু, শুভ্র, সত্যি আমি দুঃখিত—তোমাকে আমি থাকতে বলতে পারি না।'

'আর বলতে হবে না, বুঝেছি!' বলে দরজার কাছ থেকে সরে গেল শুভ্র। বাধা দিতে কম চেষ্টা করল না অন্তরা, কিন্তু ওর কোন কথাই শুনল না সে, মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল ফ্ল্যাট থেকে।

শুভ্র চলে যাবার পর গালে হাত দিয়ে বসে থাকল অন্তরা। যদিও কান্না পাচ্ছে, তবু জানে যে শুভ্রকে ফ্ল্যাটে থাকতে না দিয়ে ভালই করেছে ও। ওর সিদ্ধান্তে কোন ভুল নেই। একটু হয়ত হৃদয়হীন হয়ে গেছে আচরণটা, তা হোক। এটা শুভ্রর প্রাপ্য ছিল। দু'জনের সম্পর্কের মধ্যে এমনিতেই একটা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, সেটা আরও বাড়াতে চায় না অন্তরা।

দুই

কাজের কোন অন্ত নেই, দিনগুলো যেন ফর ফর করে উড়ে যাচ্ছে। অন্তরার সীমা ভাবী যেমন আশা করেছিল, বাইরে থেকে তাঁতে কাপড় বোনা হচ্ছে দেখলে ভেতরে কিছু লোক ঢুকবেই, আর একবার ঢুকলে তাকে কিছু কিনতেও হবে; ঘটছেও ঠিক তাই। শো-কেসের সামনে তাঁত বসানর পর থেকে দোকানের বিক্রি অনেক বেড়ে গেছে। ঢাকা শহরে, তা-ও আবার এলিফেন্ট রোডের মত পুশ এলাকায়, সালোয়ার-কামিজ পরা অল্প বয়েসী এক মেয়ে নিজের হাতে কাপড় বুনছে, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। সরাসরি না তাকিয়েও বুঝতে পারে অন্তরা, শো-কেসের সামনে ফুটপাতে রীতিমত ভিড় জমে গেছে দর্শকদের। তারা সবাই যে ভেতরে ঢোকে তা নয়, আবার যারা ঢোকে তারা সবাই যে কেনাকাটা করে তা-ও নয়, তবে গড়ে প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজনকে ঠিকই কিছু গছাতে সমর্থ হন মমতা মামুন। তাতেই ওরা খুশি।

বেশিরভাগ খদ্দের আনাড়ি, মাত্র ক'দিন দোকানদারি করেই বুঝে নিয়েছে অন্তরা। জন্মদিনে বা বিবাহ-বার্ষিকীতে স্ত্রীকে কিছু উপহার দিতে হবে, কিন্তু কি দেয়া যায় ঠিক করতে পারে না। খদ্দেরদের মন বুঝে পরামর্শ দেয় অন্তরা, বোঝাতে চেষ্টা করে একটা সোনার আঙটির চেয়ে সুন্দর একটা পেইন্টিং বা মূর্তি অনেক বেশি তাৎপর্য বহন করে, উপহার হিসেবে আলাদা বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। খদ্দেররা বৈশিরভাগই

ওর পরামর্শ মেনে নেয়।

দোকান যখন খালি থাকে, একটা সেকেণ্ডও নষ্ট করে না অন্তরা, তাঁতের সামনে বসে আপন মনে নিজের কাজ করে। ওর কোন ধারণা নেই, ফুটপাত থেকে তাকালে কেমন দেখায় ওকে।

একজন কারিগরকে দিয়ে বিশটা বেতের চেয়ার তৈরি করিয়েছে অন্তরা। ডেলিভারি নিয়েছে মাত্র তিনটে, বাকিগুলো কারিগরের কারখানাতে পড়ে আছে। অত জায়গা কোথায় দোকানে যে সবগুলো এনে রাখবে। চেয়ারগুলো সুন্দর দেখতে, দামও খুব বেশি, তবে রোমাঞ্চকর কোন বস্তু নয়। কাজেই অনেক চিন্তা-ভাবনা করে চেয়ারগুলোর পিছনে হাতে বোনা একটা কাপড় টাঙিয়ে দিল অন্তরা। কাপড়টা বহুরঙা—গাঢ় লাল, ক্রীমের মত সাদা, আর আসমানী নীল। ধবধবে সাদা দেয়ালে ঝুলে থাকল ওটা। ওটার সামনে চেয়ারগুলো পাশাপাশি রাখল, কাছেই দাঁড়িয়ে থাকল লম্বা স্ট্যাণ্ড সহ একটা ল্যাম্প।

প্রিন্টগুলো সবই একদিকের দেয়ালে সাজিয়েছে অন্তরা, পাশের দেয়ালটা দখল করেছে বাটিকের কাজ। দু'দিকে শেলফ, মাঝখানে সরু চলার পথ—শেলফে রেখেছে মূর্তিগুলো। সাজাবার সময় খুব একটা মাথা ঘামায়নি অন্তরা, স্রেফ নিজের রুচি আর পছন্দের ওপর নির্ভর করেছে। এক সময় দেখা গেল সবই ভারি সুন্দর মানিয়ে গেছে। চেয়ারগুলোয় কুশন লাগাবার পর দেখা গেল, ওগুলোর সৌন্দর্য বেড়ে গিয়ে পরিবেশে রীতিমত উত্তেজক একটা ভাব এনে দিয়েছে।

দোকান খোলার আগে সকালে, তারপর দোকান বন্ধ হবার পর রাতে একা বসে বসে কুশনগুলো তৈরি করেছে অন্তরা। প্রতিটি চেয়ারের জন্যে একটা করে। ওর আশা, এগুলো বিক্রি তো হবেই, আরও বানাবার জন্যে অর্ডার দিয়ে যাবে লোকজন। দোতলায় একটা পুরানো সেলাই মেশিন আছে, বানাতে খুব বেশি সময় লাগেনি। সময় লেগেছে কাপড়গুলো বুনতে আর কাপড়ের ওপর ফুল তুলতে। তিনটে

কুশন তিন রকমের—একটা গাঢ় নীল, মাঝখানে মোটাসোটা ম্লান লাল রঙের পাখি। দ্বিতীয়টা সাদা ও কালো ডোরা কাটা, সুতো দিয়ে বোনা হয়েছে ছোট আকৃতির কয়েকটা আম ও পেয়ারা। শেষটা সবুজ ভেলভেট, চার কোণা থেকে ঝুলছে খয়েরি লিচুর থোকা, মাঝখানে মাঝারি আকৃতির একটা পাকা পেঁপে। এগুলো আসলে মনের আনন্দে করেছে অন্তরা, অনেকটা নিজের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা। তাতে লাভ হয়েছে এই যে শিপলু ভাই আর শুভ্রর কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হবার খুব বেশি সময় পায়নি ও।

শিপলু ভাইকে ভালবাসে অন্তরা, তার জন্যে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। আর শুভ্রর জন্যে উদ্বিগ্ন হবার কারণ হল, টাকাটা নিয়ে যাবার পর তার আর কোন খবর নেই।

নিস্তেজ, মিষ্টি রোদে ভরে আছে রাস্তাটা। কাউন্টারের পিছনে বসে গুনগুন করছেন মমতা মামুন। সেই দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক কখন যে ভেতরে ঢুকেছেন, বলতে পারবে না অন্তরা। হঠাৎ মনে হল ওর, মমতা আন্টি গুনগুন করছেন না কেন? মুখ তুলল ও, দেখল কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক, তাকিয়ে আছেন ওর দিকেই। চোখাচোখি হতে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন তিনি, নিছক ভদ্রতাবশত; তারপর ঘুরে অন্য দিকে চলে গেলেন, দোকানের জিনিস-পত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছেন। ভদ্রলোকের দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকত অন্তরা, বিশেষ করে ওর দিকে তিনি পিছন ফেরার পর, কিন্তু না তাকিয়েও অনুভব করতে পারল যে মমতা আন্টি ওর দিকে চেয়ে আছেন, হাসছেন মুচকি মুচকি। কোন কারণ নেই, তবু ভারি লজ্জা পেল অন্তরা। তাড়াতাড়ি মাথা নামিয়ে তাঁত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আবার। তবে আশ্চর্য একটা সচেতনতা এসে গেছে ওর মধ্যে, ভদ্রলোকের অস্তিত্ব ভুলতে পারছে না। মাঝে মধ্যেই চোরা চোখে তাকাচ্ছে

ওদিকে।

অন্তরার মনে পড়ল, এর আগেও একদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে ওর। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ওকেই দেখছিলেন তিনি। কি যেন একটা আছে তাঁর মধ্যে, দৃষ্টিসীমার মধ্যে উপস্থিত হলেই আড়ষ্টবোধ করছে অন্তরা। আড়চোখে তাকাতে দেখল, ওর তৈরি কুশনগুলোর দিকে তাকিয়ে আপনমনে হাসছেন তিনি।

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সদ্য তৈরি কাপড়টার ওপর হাত বুলাল অন্তরা। গাঢ় নীল সিল্কের ওপর সবুজ নকশা, তা-ও খুব গাঢ়। মনে মনে ভাবছে, আর যাই হোক, ভদ্রলোকের অন্তত সেন্স অভ হিউমার আছে। কিন্তু উনি কে, ওঁকে দেখলেই আমি এমন অস্বস্তিবোধ করব কেন? হাসি-খুশি শিথিল পরিবেশটা কেন হঠাৎ এরকম উত্তেজনাকর হয়ে উঠবে? কুশনগুলো তৈরিই করা হয়েছে মজা দেয়ার জন্যে, দেখলে একটু অন্তত হাসতেই হবে। খানিকটা তৃপ্তি ও গর্ব অনুভব করল অন্তরা। অচেনা ভদ্রলোক, শোভা ও ওর ওপর এত যার আগ্রহ, কুশনগুলো দেখে না হেসে পারেননি। না, একটু ভুল হল। তাড়াতাড়ি চিন্তাটা সংশোধন করল অন্তরা। ওর ওপর নয়, শোভার ওপর। কার খেয়েদেয়ে কাজ নেই ওর ওপর আগ্রহী হতে যাবে। সাধারণ সুতি কাপড়ের সালোয়ার-কামিজ পরা রোগা-পাতলা একটা মেয়ে, মাথার চুল এলোমেলো হয়ে আছে, ভাঙাচোরা একটা তাঁতের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে—কৌতুক বোধ করতে পারেন, আগ্রহী হতে যাবেন কেন!

ছোট কয়েকটা কার্পেট দেখছেন ভদ্রলোক। সরে গিয়ে দাঁড়ালেন ঝুলন্ত ঝাড়বাতির নিচে, মুখ তুলে তাকিয়ে আছেন। আরেকবার আড়চোখে তাকিয়ে ভদ্রলোকের বয়েস আন্দাজ করার চেষ্টা করল অন্তরা। এই প্রথম ওর মনে হল, ভদ্রলোকের কাঠামো ও গড়নের মধ্যে, চেহারার মধ্যেও এমন একটা কিছু আছে, কি যেন ঠিক মিলছে না। হাড়গুলো অস্বাভাবিক চওড়া বলেই কি? নাকি অস্বাভাবিক লম্বা বলে?

উঁহুঁ, আরও কি যেন একটা আছে। শরীরের মতই, মুখটাও বিরাট; যদিও তীক্ষ্ণ চেহারা, মাংসল বা চর্বিসর্বস্ব থলথলে নয়। এমনিতে লম্বা, তার ওপর দাঁড়ানর ভঙ্গিটা ঋজু, ফলে পাহাড়-প্রাচীরের মত নিরেট লাগছে কাঠামোটা। অন্তরা সিদ্ধান্ত নিল, ভদ্রলোকের মধ্যে বিদেশী-বিদেশী একটা ভাব আছে। ভারি রহস্যময় ব্যাপার বলতে হবে। নড়াচড়া, ঘাড় ফেরানো, হাঁটা ইত্যাদির মধ্যে সুক্ষ্ম হলেও অচেনা একটা ভঙ্গি। এমন হতে পারে, ভদ্রলোক দীর্ঘদিন বিদেশে ছিলেন? ওর এক বান্ধবীর ভাই অনেকদিন জার্মানীতে ছিল, দেশে ফেরার পর তাকে দেখেছে অন্তরা। তার হাত নাড়া, কথা বলা, তাকানো ইত্যাদির মধ্যে অদ্ভুত একটা অচেনা ছন্দ লক্ষ করেছিল ও। তবে তার ভাবভঙ্গির মধ্যে ইউরোপীয় ঢং সহজেই চেনা গিয়েছিল। এই ভদ্রলোকের ব্যাপারটা অত স্পষ্ট তো নয়ই, ইউরোপীয়ও নয়। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা, ঠিক ফর্সা বলা যাবে না। প্রকাণ্ড মুখে গোঁফ জোড়া সুন্দর করে ছাঁটা। নাকটা একটু বড়, তবে পুরোপুরি খাড়া। চোখ…না, চোখ দুটো ঠিক কালো নয়, তবে ঘোলাও নয়, কালো কফির সঙ্গে মেলে রঙটা। সেজন্যেই প্রথমদিন চোখাচোখি হবার সময় চোখ দুটোকে অদ্ভুত লেগেছিল ওর। বাঙালী পুরুষদের সঙ্গে তাঁর চোখ মেলে না। মেলে না আরও একটা জিনিস, হঠাৎ লক্ষ করল অন্তরা। ভদ্রলোকের চুল। ঢেউ খেলানো, ব্যাকব্রাশ করা চুল, তবে দেখে মনে হয় খুব শক্ত ওগুলো, প্রায় সজারুর কাঁটার মত। এটাও বাঙালী পুরুষদের সঙ্গে মেলে না। তারমানে কি ভদ্রলোক বাঙালী নন? না, তা কি করে হয়! পরেছেন তো পুরোপুরি বাঙালী পোশাক—পপলিনের পা'জামার সঙ্গে রাজশাহী সিল্কের পাঞ্জাবী, পাঞ্জাবীর ওপর চড়িয়েছেন হাতের কাজ করা খাটো জ্যাকেট, দেখতে অনেকটা মুজিব কোটের মত। কিন্তু না, বয়স আন্দাজ করা সম্ভব নয়। তবে উনি যে কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়েন না, এটা পরিষ্কার। সে বয়েস পার হয়ে এসেছেন। আবার মধ্য বয়েসে

পৌঁছুতে এখনও অনেক দেরি আছে, এটাও বোঝা যায়। চোখ ফিরিয়ে নিজের কাজে মন দিল অন্তরা, মমতা আন্টির চোখে ধরা পড়তে চায় না।

কিন্তু আবার না তাকিয়ে পারা গেল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনে মনে স্বীকার করতে হল অন্তরাকে, মানুষটাই এমন যে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয়। সুপুরুষ, সেটাই একমাত্র কারণ নয়, উপলব্ধি করল অন্তরা। ভদ্রলোকের মধ্যে অদ্ভুত একটা অটল কর্তৃত্বের ভাব আছে। আরও যেন কি একটা আছে। সেদিন স্যুট পরেছিলেন, আজ পরেছেন পা'জামা-পাঞ্জাবী। বোঝা যায়, সব ধরনের পোশাকেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন তিনি, অভ্যস্ত। তবে পোশাক দেখে তাঁর পেশা সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যায় না। ব্যবসায়ী হতে পারেন, যদিও ব্যবসায়ীদের রুচি যথেষ্ট উন্নত হতে খুব কমই দেখা যায়। কিংবা হয়ত রাজনীতি করেন, লাইসেন্স-পারমিটের সুদক্ষ শিকারী, জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে সাংঘাতিক পটু। তবে ওদের চেহারায় কৃত্রিম যে গাম্ভীর্য থাকে সেটা এই ভদ্রলোকের মধ্যে একেবারেই নেই। ঠাণ্ডা ও প্রশান্ত একটা ভাব আছে চোখে-মুখে, যেন নিজের বিচার-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার ওপর আস্থার কোন অভাব নেই। পেশা যাই হোক, ইতিমধ্যেই তিনি যে সাফল্যের মুখ দেখেছেন, সেটা বেশ বোঝা যায় চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ভাব দেখে। দোকানের ভেতর তাঁর হাঁটাচলা দেখে মনে হল, ঠিক কি দরকার জানেন তিনি, সেটা খুঁজে নিতেও পারদর্শী।

অন্তরা আশা করল, ভদ্রলোক দামী কিছু একটা কিনবেন। তাঁত ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও, দু'পা সামনে এগিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল, বোঝাতে চায় প্রয়োজন হলে তাঁকে সাহায্য করার ইচ্ছে আছে। তবে জোর করে কোন কিছু গছাবে না।

কফি রঙের চোখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকালেন ভদ্রলোক। নিঃশব্দ কাউন্টারের দিকে ইঙ্গিত করলেন, ওখানে তিনি কয়েকটা জিনিস

রেখেছেন। সেদিকে তাকিয়ে ভদ্রলোকের পছন্দ করা জিনিসগুলো দেখল অন্তরা—একটা ফুল তোলা দস্তরখানা, টেবিল ক্লথ হিসেবেও কাজ চালানো যায়; একটা পেইন্টিং, ধান খেত ও নদীর মাঝখানে চাষীবউকে দেখা যাচ্ছে; বাঁশের তৈরি একটা চ্যাপ্টা ছাইদানী; বাঁশেরই তৈরি একটা টেবিল-ল্যাম্প। মৃদু হাসল অন্তরা, মনে মনে আবেদন জানাল, আরও কিছু কিনুন, আপনার রুচি আছে।

কুশনগুলো দেখে হাসলেও, সেদিকে আর তাকাচ্ছে না ভদ্রলোক। বোধহয় শুধু মজাই পেয়েছেন, কিন্তু পছন্দ করেননি। কাছ থেকে অন্তরা দেখল, ভদ্রলোকের আরেকটা জিনিস ঠিক মেলে না। সেটা হল তার চুল কাটার ধরন। চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করা হলেও, খুব ছোট করে ছাঁটা। এমনই ধরন, চিরুনি না চালালেও ওগুলো পিছন দিকে নেতিয়ে পড়বে। সন্দেহ নেই, ভারতীয় উপমহাদেশেরই লোক উনি, তবে বাঙালী না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। শ্রীলংকার? না, নেপালী হতে পারেন না। নেপালীদের নাক এরকম খাড়া হয় না, শরীরটাও এরকম লম্বা-চওড়া হতে দেখা যায় না। পাঞ্জাবী নাকি? মনটা বিরূপ হয়ে উঠল অন্তরার, কারণ পাঞ্জাবীদের সম্পর্কে ওর ধারণা, ওরা মারমুখো চণ্ডাল টাইপেরই হয়। ভারতীয় বাঙালী?

যে-দেশেরই হোন, ভাবল অন্তরা, ভদ্রলোকের চেহারায় জাদু আছে। 'ওভাবে তাকিয়ো না তো, অন্তরা।' নিজেকে শাসন করল ও। 'এটা অভদ্রতা।' শিষ্টাচার ও ভব্যতার একনিষ্ঠ ভক্ত হলে কি হবে, চোখ রাঙিয়েও নিজেকে বশে রাখতে পারছে না ও। সেজন্যে যে নিজের ওপর বিরক্ত বোধ করছে তা নয়, তবে ভয় পাচ্ছে। কি হয়েছে আমার? আমি এমন করছি কেন? আরও কিছু পেইন্টিং দেখছেন ভদ্রলোক, অন্তরার দিকে না তাকিয়ে ওগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। কি এক আনন্দে সারা শরীরে পুলক অনুভব করল অন্তরা। ভারি কণ্ঠস্বর, ভরাট, এবং ভাষাটা বিশুদ্ধ বাঙলা। তারমানে উনি বাঙালী! 'অ্যাবস্ট্রাক্ট

আর্ট…এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা খুব কম,' ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে বলল অন্তরা। 'আমি আসলে ডিজাইন সম্পর্কে বরং ভাল বুঝি। নতুন নতুন ডিজাইন, নতুন নতুন আইডিয়া…।' হঠাৎ থামল ও, ইচ্ছে হল নিজেকে চড় মারে। এমন বকবক করে কেউ? ছি, একি বেসামাল অবস্থা!

'ও, আচ্ছা।'

কুশনগুলোর দিকে তাকাল অন্তরা, চেষ্টা করল হাসি চাপার। ঘাড় ফেরাতে দেখল, ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন ভদ্রলোক। ও বলল, 'চেয়ারগুলো সুন্দর, তাই না? তবে দাম খুব বেশি। আমাদের নিজস্ব কারিগরকে দিয়ে বানানো।'

মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রলোক। 'কুশনগুলোও কি দামী, নাকি ওগুলো চেয়ারের সঙ্গেই?'

ওর সঙ্গে কৌতুক করছেন ভদ্রলোক। হঠাৎ করে অন্তরা উপলব্ধি করল, ওগুলোর দাম সম্পর্কে কিছুই ভাবেনি ও। কত চাওয়া যেতে পারে? তৈরি করেছে শখ করে, মনের আনন্দে—খুব বেশি দাম চাওয়া কি উচিত? অবশ্য ফুলগুলো তুলতে প্রচুর সময় লেগেছে, কাজেই খুব কম দামেও বেচা যায় না। 'ওগুলো আসলে…কি বলব, মানে…।' ধীরে ধীরে শুরু করেও শেষ করতে পারল না অন্তরা। 'দুঃখিত। ওগুলোর দাম বলতে পারব না।' ভদ্রলোকের মুখে হাসি দেখে ওর আত্মবিশ্বাস হঠাৎ করে বেড়ে গেল, বলে ফেলল, 'আসলে, আমি নিজে বানিয়েছি ওগুলো—শখ করে!'

'আমি জানি, কাপড়গুলো তোমাকে বুনতে দেখেছি,' বললেন ভদ্রলোক। হকচকিয়ে গেল অন্তরা, ওকে উনি তুমি বলে সম্বোধন করছেন কেন? 'ওগুলো প্রমাণ করে…প্রমাণ করে…,' কথা শেষ করলেন না, হাত দুটো উঁচু করে অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে ঝাঁকালেন, যেন নিজের বক্তব্য জোরালো করতে চান। আবার দ্বিধায় পড়ে গেল অন্তরা,

ভাবল, কোথাকার মানুষ উনি? 'মানে, বোঝা যায় তোমার কালার সেন্স খুব স্ট্রং,' মুচকি হেসে বললেন, অন্তরাকে পাশ কাটিয়ে চলে এলেন তাঁতটার কাছে।

তাঁর পিছু পিছু এল অন্তরাও।

'বাহ্! নীল আর সবুজ। তোমার নার্ভ আছে বলতে হবে।'

'নার্ভ?'

'অবশ্যই। বিশেষ করে এরকম অদ্ভুত সবুজ ব্যবহার করতে হলে সাহস দরকার। রঙ সম্পর্কে তোমার ধারণা দেখছি দারুণ। গাঢ় সবুজ আর গাঢ় নীল, চোখ ফেরাতে পারবে?' দুটো মাথা প্রায় এক হয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তাঁতে সদ্য বোনা খুদে কাপড়টার দিকে ঝুঁকে আছে, দুনিয়ার আর কিছু সম্পর্কে দু'জনেরই কোন ধারণা নেই এই মুহূর্তে।

'বেগুনী-লাল।'

'কি, কি বললে?' প্রায় রুদ্ধশ্বাসে জানত চাইলেন ভদ্রলোক।

'নীল সবুজের মাঝখানে সরু, খুবই সরু একটা বেগুনী-লাল রেখা,' বিড়বিড় করল অন্তরা। 'আর একটা সাদা রেখা, আঁকা-বাঁকা ফাটলের মত।' মনে মনে খুবই বিস্ময়বোধ করছে অন্তরা, রঙ সম্পর্কে এতটা আগ্রহ দেখানো ঠিক স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, বিশেষ করে কোন পুরুষমানুষের পক্ষে। বেগুনী-লাল একটা সুতো দু'জনের মাঝখানে উঁচু করে ধরল ও, এই ফাঁকে ভদ্রলোকের দিকে ভাল করে তাকাবার সুযোগটা হাতছাড়া করল না। গোটা অবয়বটাই মনে গেঁথে রাখার মত, বা বলা যায় কোন সচেতন চেষ্টা ছাড়াই আপনাআপনি মনে গেঁথে যাওয়ার মত। চুলের মত গোঁফের রোয়াগুলোও শক্ত, তবে ঠোঁটের দিকে কাত হয়ে থাকায় একেবারে কাছ থেকে না দেখলে বোঝা যায় না। কাছে রয়েছে বলেই ভদ্রলোকের চেহারায় আরও কয়েকটা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে গেল অন্তরার চোখে। শান্ত কর্তৃত্বের সঙ্গে মিশে আছে কৌতুকপ্রবণ হাসি-হাসি ভাব, চোখে অভয় বা প্রশ্রয় দেয়ার নরম

দৃষ্টি। হঠাৎ করেই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল অন্তরার। শুভ্রর মত সুন্দর পুরুষ দেখেনি ও, অত সুন্দর বোধহয় কেউ হয়ও না। তবু, কেন কে জানে, শুভ্রকে কোনদিন স্বপ্ন দেখেনি অন্তরা। শুভ্র যত সুন্দরই হোক, তার চেহারায় প্রাণ বা লাবণ্যের অভাব সহজেই চোখে পড়ে, সম্ভবত শরীরের ওপর অত্যাচারের কারণেই। ওর দাদী বা মমতা আন্টি প্রায়ই রসিকতা করে বলেন, একদিন এক লোক হঠাৎ অন্তরার জীবনে উদয় হবে, ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে যাবে ওকে। শুধু ওঁরা বলেন বলেই নয়। আরও অনেক আগে থেকে সেরকম একজনের কথা চিন্তা করে অন্তরা, ঘুমের মধ্যে তাকে স্বপ্ন দেখে, দিবাস্বপ্নেও দেখতে পায়। প্রেমে পড়ার কোন ইচ্ছে আপাতত ওর নেই, কারণ প্রথমে ওকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, কাজেই চিন্তাটাকে খুব একটা প্রশ্রয় দেয় না অন্তরা, তবু তার চেহারাটা নিজের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট, চেষ্টা করলেই তাকে পরিষ্কার দেখতে পায় ও। হুবহু একই চেহারা না হলেও, তাঁর সাথে, সেই চেহারার সঙ্গে, কোথায় যেন আশ্চর্য একটা মিল আছে এই ভদ্রলোকের। বিশেষ করে কাছ থেকে দেখলে। সেজন্যেই চেহারাটা মনে গেঁথে যাওয়ার মত বলে মনে হচ্ছিল অন্তরার। আসলে মনে গাঁথাই আছে। কী আশ্চর্য, ব্যাপারটা ঠিক এরকম ঘটছে কেন? আসলে কোন মিল নেই, আমি জোর করে মেলাবার চেষ্টা করছি?—নিজেকে জিজ্ঞেস করল অন্তরা। কিন্তু কেন?

খুবই কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, তাই একটানা বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না অন্তরা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ নামিয়ে নিতে হল ওকে। অথচ অন্য দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতেও পারছে না, ভদ্রলোকের দিক থেকে চোখ ফেরালেই বঞ্চিত বলে মনে হচ্ছে নিজেকে, খালি হয়ে যাচ্ছে বুক, অদম্য লোভ জাগছে আবার তাকাবার।

ট্রাউজারের দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে পিছিয়ে গেলেন ভদ্রলোক,

অন্তরা সহ তার সামনের গোটা দৃশ্যটা আরও ভাল করে দেখার জন্যে। চারদিকে চোখ বুলাচ্ছেন। বিড় বিড় করে, অনেকটা আপনমনে বললেন, 'শুধুই সুন্দর একটা মুখ নয়, রীতিমত প্রতিভা বলতে হবে। কথা শেষ হল, সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুখের ওপর স্থির হল তাঁর দৃষ্টি।

কোন তরুণীকে প্রথম পরিচয়ে তুমি বলা বা সুন্দরী বলে প্রশংসা করা নিতান্তই অভদ্রতা, জানে অন্তরা। সাবধান হবার প্রয়োজনীয়তা আছে, উপলব্ধি করা সত্ত্বেও নিজেকে শাসন করতে ব্যর্থ হল ও। মনে মনে যুক্তি খাড়া করল, বয়েসে উনি আমার চেয়ে অন্তত দশ-বারো বছরের বড়, তুমি বললে ক্ষতি কি? সত্যকথনেই বা অপরাধ কোথায়, সুন্দরকে সুন্দর বলবেন না?

ভদ্রলোকের হাসিটা সংক্রামক, দেখাদেখি অন্তরাও ক্ষীণ হাসল। প্রশংসা শুনে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে ও, অনুভব করল একটা কিছু বলা দরকার। এমন কিছু, যাতে ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দেয়া হয় তাঁর আচরণটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারেনি ও। 'কি ভেবে কথাটা বললেন জানতে চাইছি না,' বলল ও। 'আমি ভান করব, শুনতে পাইনি।'

ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন ভদ্রলোক। 'অদ্ভুত!' নিচু গলায় বললেন তিনি। 'গন্ধটা ভাল লাগছে, এক কাপ কফি খাওয়াবে নাকি?'

কাউন্টারের কাছে ফিরে এল ওরা, অবাক হয়ে অন্তরা দেখল ওদের জন্যে দু'কাপ কফি নিয়ে অপেক্ষা করছেন মমতা মামুন। 'ধন্যবাদ,' বলে তাঁর হাত থেকে কাপটা নিলেন ভদ্রলোক। অন্তরাও নিল, লক্ষ করল ওর দিকে তাকাচ্ছেন না ভদ্রমহিলা, ভান করছেন যেন ওদের ব্যাপারে সচেতন নন। কিছুক্ষণ রঙ আর কাপড়ের মান নিয়ে আলোচনা করল ওরা। অন্তরা বুঝতে পারল, এসব বিষয়ে অনেক কিছু জানেন ভদ্রলোক, ওকে তাঁর জ্ঞানের ভাগ দিতেও আপত্তি নেই। একটু

পরই ওর ব্যক্তিগত বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করলেন তিনি, জিজ্ঞেস করলেন অন্তরা এখানে চাকরি করে কিনা।

'না,' মৃদু হেসে বলল অন্তরা। 'এটা আমার ফুফাত ভাইয়ের দোকান, ওরা কোলকাতায় যাওয়ায় ক'দিন দেখাশোনা করছি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তোমার আসলে আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়া উচিত।' সামান্য হাসলেন তিনি, যোগ করলেন, 'আমি ধরেই নিচ্ছি ইতিমধ্যে তুমি এস. এস. সি. পাস করেছ। নাকি এখনও স্কুলে আছ?'

হেসে ওঠার ঝোঁকটা অনেক কষ্টে চেপে রাখল অন্তরা। মমতা মামুনের দিকে ইচ্ছে করেই তাকাল না, তবে লক্ষ করল কাউন্টারের ফরমিকা টপ কাপড় দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করছেন তিনি, যেন ওদের দু'জনের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা নেই। 'কি বললেন? আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়া উচিত আমার?' সকৌতুকে জানতে চাইল অন্তরা।

'অবশ্যই উচিত। তুমি রঙ চেনো, তোমার চোখ আছে। দু'দিন ধরে দোকানটা তুমি সাজালে, আমি বাইরে থেকে দেখেছি—তোমার রুচি ভারি সুন্দর। কেউ হয়ত বলেনি, আসলে তুমি রীতিমত একটা প্রতিভা। আর্ট কলেজে ভর্তি হলে অত্যন্ত ভাল করবে। ডিজাইনার হিসেবে তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ভেবো না মিথ্যে প্রশংসা করছি বা না জেনে কথা বলছি। তোমাদের আর্ট কলেজে চার বছরের কোর্স, তাই না? তারমানে কি? তারমানে বিশ কি একুশ বছর বয়েসেই পাস করে বেরিয়ে আসবে তুমি। তোমার ভেতর যে সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি, ডিজাইনার হিসেবে চমৎকার একটা ক্যারিয়ার...।' হঠাৎ থামলেন ভদ্রলোক, আপনমনে কাঁধ ঝাঁকালেন। 'দুঃখিত। এভাবে কারও ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বলা উচিত নয়...।'

'না, ঠিক আছে,' লাজুক হেসে বলল অন্তরা। 'আসলে আমার খুব লজ্জা লাগছে।' সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভদ্রলোকের দ্বারা জীবনের চার চারটি বছর মুছে যাওয়ায় অদ্ভুত এক অনুভূতি হল ওর। কী আশ্চর্য,

উনি ধরে নিয়েছেন ওর বয়েস সতেরো!

'লজ্জা লাগছে কেন?' জানতে চাইলেন ভদ্রলোক। 'আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ নেই?'

'না, সেরকম কিছু না,' বলে মরিয়া হয়ে মমতা আন্টির দিকে তাকাল অন্তরা, দেখল বড় একটা রুমাল বাতাসে বারবার ঝেড়ে বিদঘুটে শব্দ করছেন তিনি। 'আসলে, আমার তরফ থেকে একটু বেয়াদবি হয়ে গেছে। সত্যি দুঃখিত। আমি...আমি আসলে গত মাসে ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছি...আর্ট কলেজ থেকে। একটা চা-চাকরিও হয়ে যাবে, আমার ফুফাত ভাই ফিরে এলেই বাংলাদেশ টিভিতে জুনিয়র ডিজাইনার হিসেবে জয়েন করব। অন্তত আমার ধারণা চাকরিটা আমিই পাব... ।'

ভদ্রলোকের চেহারায় বিহ্বল একটা ভাব ফুটে উঠল। কয়েক সেকেণ্ড কথাই বলতে পারলেন না। তারপর ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বললেন, 'তাহলে তো আমি মহা অন্যায় করে ফেলেছি! আপনাকে আমার তুমি বলা উচিত হয়নি!' অন্তরার পা থেকে মাথা পর্যন্ত অবাক দৃষ্টিতে তাকালেন বার দুয়েক। 'সত্যি আমি দুঃখিত। আপনাকে এত ছোট দেখায় যে...!'

'না-না,' তাড়াতাড়ি বলল অন্তরা। 'আপনি আমাকে তুমিই বলবেন, প্লীজ। আপনি তো আমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়।'

লাঞ্চের সময় হয়ে গেল, কাঁচের দরজায় 'বিক্রি বন্ধ' লেখা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন মমতা মামুন। কাউন্টারের সামনে বসে ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছে অন্তরা। কফি শেষ হতে কোনটার কি দর জেনে নিয়ে দাম মিটিয়ে দিলেন ক্রেতা ভদ্রলোক। তারপর বললেন, বেতের চেয়ার তিনটে নেবেন তিনি। অন্তরা কি তাঁকে আরও বিশ-পনেরোটা চেয়ার, কুশন সহ, সাপ্লাই দিতে পারবে?

হ্যাঁ, ওগুলো যে দামী তা তিনি জানেন, জানেন কুশনগুলো তৈরি করতে সময় লাগবে। অন্তরা জানাল, হপ্তা দুয়েকের মধ্যে ব্যবস্থা করতে পারবে ও। মনে মনে ভাবল, এতগুলো বেতের চেয়ার নিয়ে কি করবেন ভদ্রলোক?

'মাসুদ,' বললেন ভদ্রলোক, অন্তরার হাতে একটা ভিজিটিং কার্ড ধরিয়ে দিলেন। 'মাসুদুর রহমান কুয়ালা। কুয়ালা মানে নদীর মুখ। আমি মালয়েশিয়া থেকে এসেছি।'

'ও।' বিহ্বল হয়ে পড়ল অন্তরা। 'আপনাকে ঠিক এ-দেশের মানুষ বলে আমারও মনে হয়নি, কি যেন মেলাতে পারছিলাম না। আমি ভেবেছিলাম আপনি সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী হবেন।'

'উঁহুঁ, জন্মসূত্রে আমি বাংলাদেশী। আমার মা ও বাবা দু'জনেই বাংলাদেশী, তবে সবাই আমরা অনেক বছর কুয়ালালামপুরে বাস করছি। আমরা মানে, আমি আর আমার বাবা। আমার মা মারা গেছেন।' একটু থেমে প্রশ্ন করলেন মাসুদুর রহমান, 'তোমার নামটা তো জানা হল না।'

'আমাকে সবাই অন্তরা বলে ডাকে, ভাল নাম শাকিলা সামাদ।'

হ্যাণ্ডশেকের জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েও কি মনে করে ফিরিয়ে নিলেন মাসুদুর রহমান, বললেন, 'চেয়ারগুলো ডেলিভারি দেয়ার ব্যবস্থা হলে আমার সাথে যোগাযোগ কোরো, আমি নিজে এসে নিয়ে যাব।'

মাথা ঝাঁকাল অন্তরা, ভদ্রলোক চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাচ্ছেন না বুঝতে পেরে অকারণ পুলক অনুভব করল। তারপরও, ভদ্রলোক বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন দেখে মনটা বিষণ্ন হয়ে উঠল ওর। আজকের বিকেলটা অসম্ভব খালি খালি লাগবে। আজকের বিকেল, কালকের সারা দিন, তার পরদিন। আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত কিছুই ওর ভাল লাগবে না।

'তোমার যদি কাজ দরকার হয়, মানে যদি চাকরি করতে চাও,

কোন রকম সঙ্কোচ না করে সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো,' প্রস্তাব দিলেন ভদ্রলোক।

'ধন্যবাদ,' বলল অন্তরা। 'কিন্তু দুঃখিত। আপনাকে তখন বললাম না, চাকরি আমার একটা প্রায় হয়েই গেছে বাংলাদেশ টেলিভিশনে।' ভিজিটিং কার্ডটার ওপর চোখ বুলাল ও। 'চেয়ারগুলো দোকানে এলেই আপনাকে আমি ফোন করব।'

'তার আগে কুশনগুলো তোমাকে তৈরি করতে হবে,' মনে করিয়ে দিলেন মাসুদুর রহমান।

'হ্যাঁ, জানি,' মৃদু হেসে বলল অন্তরা। 'আজ থেকেই কাজ শুরু করব আমি। আপনার কোন সাজেশন আছে?'

'তোমার মাথায় নতুন নতুন আইডিয়া গিজ গিজ করছে, যেচে পড়ে এত আগ্রহ দেখানর সেটাই কারণ। বিশটা কুশনে বিশ রকম ছবি চাই আমি, সেগুলো কি হবে তুমিই ঠিক করো।'

'ভাবছি কুশনগুলোয় এবার কয়েকটা পুতুল আর প্রাকৃতিক দৃশ্যও রাখব।'

মাথা ঝাঁকালেন মাসুদুর রহমান। তাঁর চোখের কোমল দৃষ্টি অন্তরার ঠোঁট, চিবুক, গলা ইত্যাদি ছুঁয়ে দিচ্ছে। লক্ষ করছেন ওর ঠোঁটের সলজ্জ হাসি, মাথা ঝাঁকানর ভঙ্গি, চোখের পাতা পড়া। ওর পা থেকে মাথা পর্যন্তও দেখে নিলেন একবার। ব্যস্ত হাতে প্যাকেট তৈরি করছে অন্তরা, যদিও ভদ্রলোকের দৃষ্টি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। অন্য কেউ হলে বিরক্ত হত, বোধহয় অপমানও বোধ করত। কিন্তু মাসুদুর রহমানের দৃষ্টি ওর গোটা অস্তিত্বে ভাল লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে দিল। ও অবশ্য জানে না, মাসুদুর রহমানের মুগ্ধ দৃষ্টিতে কোন রকম কৃত্রিমতা নেই। মেয়েটিকে অসম্ভব ভাল লাগছে তাঁর। রূপ আর মেধার এমন শুভ সংমিশ্রণ আগে কখনও দেখেননি তিনি। মনে মনে ভাবছেন, মেয়েটি কি জানে, রোমানদের প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভেনাসসুলভ

বিষণ্ন ও পবিত্র একটা ভাব আছে ওর চেহারায়?

অন্তরা জানতে পারল না, দোকান থেকে বেরিয়েই মনে মনে অন্যায় একটা সিদ্ধান্ত নিলেন মাসুদুর রহমান। তাঁর এই সিদ্ধান্তের ফলে অন্তরার গোটা জীবনটাই বদলে যাবে।

ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ, মাসুদুর রহমান চলে যেতেই অন্তরার মনে হল কি যেন হারিয়ে ফেলেছে ও। ইতিমধ্যে লাঞ্চ সেরে ফিরে এসেছেন মমতা মামুন, অন্তরাকে খেতে যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিলেন। 'আমার খিদে নেই,' বলে রেডিওটা জোর করে দিল অন্তরা। এই মুহূর্তে কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না ওর।

দূর থেকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন মমতা মামুন।

তিন

ফোনের রিসিভারটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল অন্তরা। উদ্বেগ, রাগ ও হতাশায় অসুস্থ বোধ করছে। সোফার ওপর পা তুলে শুয়ে পড়ল, চোখ দুটো ঢাকল একটা হাত দিয়ে। রীতিমত কান্না পাচ্ছে ওর। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আসছে না কেন, জানার জন্যে টেলিভিশন ভবনে ফোন করেছিল এইমাত্র। প্রথমে সান্ত্বনাসূচক কিছু কথা শোনানো হয়েছে ওকে, তারপর বলা হয়েছে শিক্ষানবিস ডিজাইন অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে অন্য এক প্রার্থীকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। চাকরিটা আমি কেন পেলাম না, অন্তরার এই প্রশ্নের উত্তরে জানানো হয়েছে, ইন্টারভিউয়ে খুব ভাল করলেও ওর

বয়স খুব কম, অভিজ্ঞতাও কিছু নেই। সবশেষে আশ্বাস দিয়ে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে ডিজাইন ডিপার্টমেন্টের কোন পদে লোক লাগলে ওর কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হবে।

খানিক পর সোফা ছেড়ে নাস্তার খালি কাপ-প্লেটগুলো ধুয়ে তুলে রাখল অন্তরা। মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করছে। চাকরিটা ও-ই পাবে, এরকম ধরে নেয়া উচিত হয়নি। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে অস্থির হয়ে উঠল। সাড়ে দশটা বাজে। ওর নিচে নামতে দেরি হচ্ছে দেখে না জানি কি ভাবছেন মমতা আন্টি।

একটা ব্যাপারে নিশ্চিত অন্তরা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা চাকরি ওকে পেতেই হবে, হাতের অল্প ক'টা টাকা ফুরিয়ে যাবার আগেই। আর ক'দিন পরই শিপলু ভাইকে নিয়ে সীমা ভাবী ফিরে আসবে বটে, কিন্তু কারও কাছে হাত পাতা ওর স্বভাব নয়। স্বভাব নয়, সম্ভবও নয়। কারণ ওরা দু'জনেই জানে যে ওর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিশ হাজার টাকা জমা আছে। ও-ই ওদেরকে জানিয়েছে। ধার চাইলে, স্বভাবতই অবাক হবে ওরা, জানতে চাইবে ব্যাংকের টাকা কি হল। তখন কি বলবে অন্তরা? চাইলে দেবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু মুশকিল হল, টাকাগুলো শুভ্রকে দিয়েছে ও, এ-কথা ওদেরকে বলা সম্ভব নয়। এ-ধরনের একটা বোকামি করার জন্যে রাগ করবে ওরা। ওদের মনে বিশ্রী একটা সন্দেহও জাগতে পারে। কথাটা গোপন করাও কঠিন, কারণ মিথ্যে বলা স্বভাব নয় ওর, বললে ধরা পড়ে যায়। কোন বান্ধবীকে ধার দিয়েছে বললে, অন্তত শিপলু ভাই ঠিকই আসল কথাটা ধরে ফেলবে। তার হার্টের যা অবস্থা, এ-সব জানলে আরও অসুস্থ হয়ে পড়া বিচিত্র নয়। তাছাড়া, শুভ্রকে কথা দিয়েছে ও, কাউকে কিছু জানাবে না।

টাকা ফেরত দেয়ার কথা বললেও, শুভ্রর কোন খবর নেই। অবশ্য প্রথম কিস্তি দেয়ার কথা তার আগামী মাসের শেষ দিকে। হঠাৎ একটা

আশার আলো দেখতে পেল অন্তরা। শুভ্র কোথায় থাকে তা না জানলেও, জানে কোথায় চাকরি করে সে। ডায়েরীটা বের করে দ্রুত পাতা ওল্টাতে শুরু করল, আশা শুভ্র যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরি করে তার ফোন নম্বর নিশ্চয়ই কোথাও টুকে রেখেছে ও। তাকে পাওয়া গেলে নিজের বিপদের কথাটা খুলে বলবে অন্তরা। অল্প ক'টা টাকা নিশ্চয়ই ওকে দেবে শুভ্র। এখন প্রশ্ন হল, ফোন নম্বরটা টুকে রেখেছে কিনা।

সত্যি রেখেছে। মনটা খুশি হয়ে উঠল অন্তরার। ভাবল, শুভ্র আমার ছোটবেলার খেলার সাথী, তার ফোন নম্বর আমার কাছে তো থাকতেই হবে। কিন্তু ফোন করার পর মনটা দমে গেল। ওকে জানানো হল, অফিস থেকে ক'দিন ছুটি নিয়েছে শুভ্র। না, তার নতুন ঠিকানা অফিসের খাতায় লেখা নেই।

সোফায় বসে কয়েক মিনিট চিন্তা করল অন্তরা। মন খারাপ করে বসে থেকে কোন লাভ নেই। যেভাবে হোক একটা চাকরি খুঁজে নিতে হবে ওকে। হাতব্যাগটা খুলে টাকাগুলো গুণল। সব মিলিয়ে আশি টাকা আছে। তার মানে চাকরির খোঁজে পায়ে হেঁটে ঘুরতে হবে ওকে।

দোকানে নেমে এসে মমতা মামুনকে বলল, 'আজ বিকেল পর্যন্ত ছুটি নিচ্ছি আমি, আন্টি। বান্ধবীদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। দেখি ওরা কোন চাকরির খবর দিতে পারে কিনা।'

'কেন, তুমি না বলছিলে টেলিভিশনে তোমার চাকরি হয়ে গেছে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন মমতা মামুন।

'অভিজ্ঞতা নেই বলে অন্য একজনকে দেয়া হয়েছে কাজটা,' বলে আর দাঁড়াল না অন্তরা, বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

ওর বান্ধবীরা, ইতিমধ্যে যারা চাকরি পেয়ে গেছে, তিনটে ঠিকানা দিল অন্তরাকে। এক রঙা সালোয়ার-কামিজ পরে বেরিয়েছে অন্তরা, হাতে

বড় একটা এনভেলাপ, তাতে ওর কাগজ-পত্র। প্রথমে একজন প্রকাশকের সঙ্গে দেখা করল ও। ভদ্রলোক নানা ধরনের শুভেচ্ছা কার্ড ছাপেন। অন্তরা নিজের করা কিছু ডিজাইন দেখাল ভদ্রলোককে। সবগুলোই পছন্দ হল তাঁর, প্রস্তাব দিলেন ওগুলো তিনি কিনে নিতে চান। অন্তরা বলল, ওর একটা চাকরি দরকার। প্রবলবেগে মাথা নেড়ে প্রকাশক জানালেন, 'শিল্পীদের তো চিনি, চাকরি পেলেই শুধু বেতন বাড়াতে বলে, আর কত বাজে জিনিস আঁকা যায় তার প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয় নিজের সাথে। না, যদি ভাল কিছু আঁকতে পারেন, আমি কিনে নিতে রাজি আছি, চাকরি দিতে পারব না।' অগত্যা অন্তরা জানতে চাইল, ছ'টা ডিজাইনের জন্যে কত পেতে পারে সে? ভদ্রলোক বললেন, 'আমি দরাদরি পছন্দ করি না। এক দাম, ছ'টার জন্যে দেড়শো টাকা পাবেন।' তারমানে কাগজ আর রঙের দামও উনি দিতে চাইছেন না। কথা না বাড়িয়ে চলে এল অন্তরা। এরপর একটা অ্যাড ফার্মে এল ও। নতুন ফার্ম, এখনও সব ফার্নিচার কেনা হয়নি, বলা হল ওকে। পাঁচতলার ওপর ছোট দু'কামরার অফিস, মাস্তান টাইপের তিনজন যুবক চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় বসে আড্ডা মারছিল। অন্তরাকে দেখে প্রথমে অসম্ভব ব্যস্ত হয়ে উঠল তারা, তারপর চোখ-ইশারায় নিজেদের মধ্যে বার্তা বিনিময় শুরু করল। পরিস্থিতি সুবিধের নয়, বুঝতে পেরে পালিয়ে আসার উপায় খুঁজছে অন্তরা। ওর প্রশ্নের উত্তরে জানানো হল, বেতন কোন সমস্যা নয়, অন্তরা যা চাইবে তাই পাবে। এখানে কাজটা কি, জানতে চাইল অন্তরা। একজন যুবক বলল, 'আপনাকে কোন কাজ করতে হবে না, শুধু অফিসে বসে থাকবেন। আসলে, স্মার্ট ও খোলা মনের একটা মেয়ে খুঁজছি আমরা, ঠিক আপনার মত। আজকাল স্মার্ট মেয়ে ছাড়া কাজ যোগাড় করা অসম্ভব। যদি চান, আপনাকে আমরা পার্টনারও করে নিতে পারি।'

অন্তরা বলল, 'কিন্তু আমি ডিজাইনারের একটা চাকরি খুঁজছি।

আপনাদের এখানে যদি কোন কাজই না থাকে, শুধু শুধু বেতন দিয়ে আমাকে রাখবেন কেন?'

'কাজ নেই বলেই তো আপনাকে রাখতে চাইছি আমরা,' জবাব পেল অন্তরা। 'আপনি এখানে বসলেই কাজ দেয়ার জন্যে ভিড় করবে মানুষ।'

'ঠিক আছে, আগামী হপ্তায় আবার যোগাযোগ করব আমি,' বলে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করল অন্তরা। কিন্তু ওদের হাতে একবার পড়লে সহজে কি বেরোনো যায়। বিল্ডিঙের দারোয়ানকে ডেকে ইতিমধ্যে চা আনতে পাঠানো হয়েছে, এই অজুহাতে ওকে তারা আটকে রাখল। চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছে অন্তরা, ওদের নানারকম প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে। ওর বাপ-ভাই কি করেন? ও কি কখনও ফ্যাশন শো-তে অংশগ্রহণ করেছে? অফার পেলে শর্ট ফিল্মে অভিনয় করতে রাজি আছে কিনা? কোন পার্টি যদি সোনারগাঁও বা শেরাটনে ডিনার ও ড্যান্স-এর আমন্ত্রণ জানায়, অন্তরা যাবে কিনা? অন্তত বিয়ার খেতে ওর আপত্তি নেই তো?

বুদ্ধি খটিয়ে অন্তরা বলল, 'আপনারা যে খুব অ্যামবিশাস, সেটা বেশ বুঝতে পারছি। কোন কিছুতেই আমার আপত্তি নেই, তবে বেতন দিতে হবে পাঁচ হাজার। যদি রাজি থাকেন তো আসব আমি, তা না হলে...।'

পাঁচ হাজারেই রাজি হয়ে গেল তারা। ঠিক হল আগামী হপ্তা থেকে জয়েন করবে অন্তরা। এরপর আর বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসতে কোন অসুবিধে হল না। তাদের মধ্যে একজন একতলা পর্যন্ত নেমে এল, অন্তরাকে রিকশায় তুলে দেবে বলে। সিঁড়ির গোড়ায় সিগারেট বিক্রি করছে এক প্রৌঢ়, যুবককে দেখেই হাত পাতল সে, বলল, 'স্যার, আমার টাকাটা! আজ দিমু কাল দিমু কইরা দুই মাস পার কইরা দিলেন...।'

চোখ রাঙিয়ে দোকানদারকে প্রায় ধাওয়া শুরু করল যুবক, এই সুযোগে পালিয়ে বাঁচল অন্তরা।

বাংলাবাজারে আরেক প্রকাশকের সঙ্গে দেখা করল ও। ভাগ্য বিরূপ, লোক নেয়া হয়ে গেছে। দুপুরে খাওয়া হয়নি সাড়ে চারটের দিকে ক্লান্ত শরীরে শোভায় ফিরে এল অন্তরা। মমতা মামুন জানালেন, ওর বোনা একটা কাপড় বিক্রি হয়েছে, তিনশো টাকায়। কাপড়টার কাঁচা মাল সীমা ভাবী দিয়েছিলেন ওকে, অন্তরা শুধু মজুরিটা পাবে। ওর মুখ শুকনো দেখে মমতা মামুন বললেন, 'চাকরি পাওয়া অত সহজ নয়। তোমাকে আরও ধৈর্য ধরতে হবে, অন্তরা। আমি বলি কি, চাকরির চেষ্টা না করে তুমি বরং এই দোকানে বসেই নিজের তৈরি এটা-সেটা বিক্রি করো। তাতে চাকরির চেয়ে বেশি পয়সা পাবে। এ তো আর পরের দোকান নয়, নিজের ফুফাত ভাইয়ের, তুমি বললে ওরা বসতে দিতে আপত্তি করতে পারবে না।'

'না, আন্টি, তা হয় না,' ম্লান হেসে বলল অন্তরা। 'বললে ওরা হয়ত আপত্তি করবে না, কিন্তু এরকম অন্যায় সুযোগ আমি নিতে পারব না। তাছাড়া, চাকরি দরকার শুধু টাকার জন্যে নয়, অভিজ্ঞতার জন্যেও, শোভায় বসলে সেটা হবে না।'

'ও, ভাল কথা, এক ছোকরা খদ্দের তোমার কুশনগুলো দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছে। তার একই জেদ, আঙুরগুলো টিপে দেখবে রস বেরোয় কিনা। আমি তাকে ছুঁতে দেইনি, বলেছি ওগুলো বিক্রি হয়ে গেছে। শুনে কি বলল, জানো? বলল, বিশটা চেয়ার আর কুশন লাগবে তার। আগামী হপ্তায় ডেলিভারি নেবে।'

হেসে ফেলল অন্তরা। তারপরই ওর মনে পড়ে গেল, কুশনগুলো ওই ভদ্রলোকেরও খুব পছন্দ হয়েছে। কুয়ালার। মাসুদুর রহমান কুয়ালার। অদ্ভুত লাগে নামটা। ভদ্রলোক কুয়ালা শব্দের অর্থটাও বলে গেছেন। অন্তরার জিজ্ঞেস করা হয়নি, ওর নামের সঙ্গে নদীর মুখের কি

সম্পর্ক?

হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল অন্তরার। চোখ দুটো উজ্জ্বল, ঠোঁট সামান্য ফাঁক।

'কি হল?' তাড়াতাড়ি জানতে চাইলেন মমতা মামুন।

'মাসুদুর রহমান,' বলল অন্তরা। নার্ভাস বোধ করছে, তবে জানে কি করতে হবে ওকে।

'মাসুদুর রহমান মানে?' মেশিন থেকে কাপে কফি ঢালছেন মমতা মামুন। 'সেই যে, সেই ভদ্রলোক...,' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অন্তরা। 'তাঁর ভিজিটিং কার্ডটা কোথায় রেখেছি বলুন তো? ভদ্রলোকের কথা মনে নেই আপনার, আন্টি? বিশটা বেতের চেয়ারের অর্ডার দিয়ে গেলেন, আপনি তাঁকে কফি খাওয়ালেন...?'

'সেই যে, সেই ভদ্রলোক—তোমার হাতটা মুচড়ে ভেঙে দিতে চেষ্টা করছিলেন?'

'ধ্যেৎ, আপনার সবকিছুতেই শুধু ঠাট্টা! ভদ্রলোক মালয়েশিয়া থেকে এসেছেন। আপনার মনে নেই, আন্টি?'

অন্তরার লালচে হয়ে ওঠা মুখ আর উত্তেজনায় চকচকে চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন মমতা মামুন। 'মনে থাকবে না কেন,' শুকনো গলায় বললেন তিনি। 'তাঁর ভিজিটিং কার্ডটা কাউন্টারের দেরাজে যত্ন করে তুলে রেখেছি। ওতে লেখা আছে, ভদ্রলোক আর্কিটেক্ট। স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন পুরুষ, তাই না?' চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে এল তাঁর, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবার অভিনয় করলেন! 'আমারই মাথা ঘুরে পড়ে যাবার অবস্থা হয়েছিল, ঠিক যেন একটা রাজপুত্র।' চেহারা ম্লান করে তুলে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। 'হায়, বয়েসটা যদি আরও বিশ বছর কম হত!'

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকল অন্তরা। মমতা আন্টি যা-ই বলুন, উত্তরে ও বলবে না, 'হ্যাঁ, ভদ্রলোক দেখতে খুব সুন্দর।' আচ্ছা,

উনি তাহলে একজন আর্কিটেক্ট। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।

দেরাজ খুলে ভিজিটিং কার্ডটা বের করল অন্তরা। নামের নিচে কার্ডটায় দুটো ঠিকানা আর চারটে ফোন নম্বর রয়েছে। একটা ঠিকানা ঢাকার, অপরটা কুয়ালালামপুরের। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে কার্ডটার ওপর তাকালেন মমতা মামুন। 'তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, মেয়ে। যাও, ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। আজ আর তোমাকে দোকানে বসতে হবে না।'

'হ্যাঁ,' বলে মাথা ঝাঁকাল অন্তরা, খালি কাপটা নামিয়ে রাখল কাউন্টারে। 'উনি বলেছিলেন...।'

'কি বলেছিলেন? শুধু সুন্দর একটা মুখ নয়, প্রতিভাও, এ-ধরনের কিছু কি? না-না, আড়ি পেতে শুনিনি, কানে এল আর কি। ভদ্রলোককে তুমি সামান্য খেলাচ্ছ বলেও যেন সন্দেহ হচ্ছিল। আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়া উচিত কিনা জিজ্ঞেস করছিলে তুমি, নাকি আমার শুনতে ভুল হয়েছে? বলো-বলো, কি বলছিলেন ভদ্রলোক?'

দ্রুত অনেক কথা ভাবতে চেষ্টা করছে অন্তরা। বিদেশী-বিদেশী ভাব থাকলেও, মাসুদুর রহমান বলেছেন বাংলাদেশেই তাঁর জন্ম। সবচেয়ে বড় কথা, ভদ্রলোকের সঙ্গে দু'মিনিট কথা বলার পরই সমস্ত জড়তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল ও। এখন মনে পড়ছে, তার সঙ্গে কথা বলার সময় ওর স্বপ্ন, অ্যামবিশন, নতুন নতুন আইডিয়া সব একসঙ্গে ভিড় করছিল ঠোঁটের কিনারায়। ওর সব কথাই গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনেছেন তিনি। কাপড়ের নাম, রঙের বৈশিষ্ট্য, হস্তশিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে তিনিও অনেক কথা বলেছেন। খুব অল্প সময় কথা হয়েছে, খুবই অল্প সময়, অথচ অন্তরার জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর দুপুর ছিল সেটা। এখন ও জানে, কি করতে হবে ওকে। একটু দ্বিধা বোধ করছে বটে, ভয় ভয়ও লাগছে, কিন্তু ওর কোন বিকল্প নেই। বিকল্প থাকলেও, ভদ্রলোককে একবার ফোন করতই ও। হঠাৎ

তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার একটা তাগাদা অনুভব করছে। তাগাদা না বলে, লোভ বলাই উচিত।

'আমি ভদ্রলোকের কাছে একটা চাকরি চাইব,' বলল অন্তরা। 'উনি নিজেই আমাকে প্রস্তাব দিয়ে গেছেন।'

মমতা মামুন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। 'সেকি, তুমি কি আর্কিটেক্ট হতে চাও?'

'তা কেন। তবে মাসুদুর রহমান সেদিন আমার সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন। আমাকে নিয়ে তাঁর মাথায় বোধহয় কোন আইডিয়া আছে। কথা বলে দেখি, সত্যি কিনা।'

রাত থেকেই শুরু হল অন্তরার প্রস্তুতি। চুল শ্যাম্পু করল, ওগুলো যাতে সিল্ক পর্দার মত ঝুলে থাকে কাঁধের ওপর। সীমা ভাবী চাবি দিয়ে গেছে, আলমারি খুলে তার একটা দামী শাড়ি বের করে রাখল, সঙ্গে ম্যাচ করা ব্লাউজ আর স্যাণ্ডেল। একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারায় মনটা খুশি হয়ে আছে ওর। রোমাঞ্চ অনুভব করছে, এত তাড়াতাড়ি আবার মাসুদুর রহমানকে দেখতে পাবে বলে। হ্যাঁ, অন্তরা জানে, অতি মাত্রায় ব্যস্ত থাকলে তিনি হয়ত ওর সঙ্গে দেখা করবেন না। সেক্ষেত্রে ওকে কথা বলতে হবে ভদ্রলোকের সেক্রেটারির সঙ্গে। দামী একজন আর্কিটেক্ট-এর সেক্রেটারি তো থাকবেই। যার সঙ্গেই কথা হোক, স্বয়ং মাসুদুর রহমানের সঙ্গে দেখা করার একটা ব্যবস্থা ঠিকই করে নিতে পারবে ও।

বিছানায় শোয়ার পর অদ্ভুত একটা শান্তি ও নিরাপত্তা অনুভব করল অন্তরা। ও যেন একটা ঝড়ের মাঝখানে রয়েছে। চারদিকে হুঙ্কার ছাড়ছে রাক্ষস আর দানবরা, মাঝখানের স্বর্গীয় পরিবেশে পরম স্বস্তির সঙ্গে বাস করছে ও। কৃতিত্বটা মাসুদুর রহমানের, জানে অন্তরা। ওর প্রতি ভদ্রলোকের আগ্রহ ও আচরণে এমন কিছু ছিল, একটা বিশ্বাস ও

নির্ভরতা এসে গেছে অন্তরার মনে।

একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল ও। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল। বিশাল একটা সবুজ মখমলের মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন। ওর হাতে গাঢ় রঙের কমলালেবু, পাকা পেঁপে আর চাঁপা কলা। চুলে আটকে আছে পাকা বড়ুই। মাথার ওপর, আকাশে, নাদুসনুদুস বহুরঙা পাখিরা বৃত্তাকারে ঘুরছে, তাকিয়ে আছে ওর দিকে। অন্তরা যেন জানে, এইমাত্র কেউ তাকে একা রেখে চলে গেছে, তাই সাংঘাতিক নিঃসঙ্গ লাগছে নিজেকে ওর, ভয় ভয় করছে, যদিও দৃশ্যটা অত্যন্ত সুন্দর। একবার ঘুম ভাঙল ওর, দেখল চোখের পানিতে ভিজে গেছে মুখ।

সকালে ঘুম ভাঙার পর ব্যস্ত হয়ে উঠল অন্তরা। কাপড়চোপড়, স্যাণ্ডেল, হাতব্যাগ ইত্যাদি সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিল। তারপর ঢুকল বাথরুমে। গোসল করে বেরিয়ে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসল সাজতে। নিজেকে কাল রাতেই সাবধান করে দিয়েছে, বেশি রঙ মাখা চলবে না। এমনভাবে মেকআপ ব্যবহার করতে হবে, দেখে কেউ যাতে ধরতেই না পারে।

নাস্তা খেতে বসে কিছুই মুখে তুলতে পারল না। মাত্র ন'টা বাজে, কাজেই সোফায় বসে ফোনটার দিকে তাকিয়ে থাকতে হল। অন্তত সকাল দশটার আগে কোন অফিসে ফোন করা ঠিক নয়।

সাড়ে ন'টার সময় নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না অন্তরা, কাপড়চোপড় পরে বেরুবার জন্যে তৈরি হয়ে গেল। অথচ জানে না ফোন করলেই মাসুদুর রহমান দেখা করার জন্যে ওকে ডাকবেন কিনা।

ঠিক দশটার সময় ফোনের রিসিভার তুলল অন্তরা, কার্ডের ওপর চোখ রেখে ডায়াল করল মাসুদুর রহমানের ঢাকার নম্বরে।

ডায়াল করার সময় হঠাৎ মনে হল, কি দরকার ছিল ফোন করার, সরাসরি চলে গেলেই তো ভাল হত। কিন্তু না, আগে জানা দরকার ভদ্রলোক ঢাকায় আছেন কিনা। এমন হতে পারে, তিনি হয়ত

বাংলাদেশেই নেই। কিংবা হয়ত বাড়ি থেকে এখনও অফিসে পৌঁছাননি।

অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল কেউ, মেয়েলি কণ্ঠ ইংরেজিতে জানতে চাইল, আপনি কে ফোন করছেন? নিজের নাম বলার পর অন্তরা অনুরোধ করল, মাসুদুর রহমানের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চায় ও। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে বলা হল ওকে। তারপর সেই একই নারীকণ্ঠ শোনা গেল আবার। সাড়ে এগারোটায় যেতে হবে অন্তরাকে। মাসুদুর রহমান ওর জন্যে অপেক্ষা করবেন। ও কি অফিসটা চেনে?

অন্তরা জানাল, চেনে না, তবে চিনে নিতে পারবে। রিসিভার নামিয়ে রেখে কার্পেটের ওপর এক পাক নাচল অন্তরা। অকারণ পুলকে অস্থির বোধ করছে ও। ড্রেসিং টেবিল থেকে সীমা ভাবীর খানিকটা সেন্ট চুরি করল, তারপর প্রায় নাচতে নাচতেই নেমে এল নিচে, মমতা আন্টিকে সুখবরটা দেয়ার জন্যে।

ওর কথা শুনে উৎসাহ দিয়ে হাসলেন মমতা মামুন, ওর পরা শাড়িটার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। বকবক করছে অন্তরা, ওকে থামিয়ে দিয়ে মন্তব্য করলেন তিনি, 'দেখো, নিজের আগুনে নিজেই যেন পুড়ে মরো না! ঝিনুকের জন্যে ডুব দিচ্ছ, ভাল কথা, কিন্তু মনে রেখো ঝিনুকের ভেতর মুক্তোও থাকা চাই।'

ঠিক এগারোটার সময় দোকান থেকে বেরিয়ে গেল অন্তরা। লম্বা, রোগা মেয়েটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন মমতা মামুন। মেয়েটা না পা পিছলে পড়ে, মনে মনে ভাবলেন তিনি। বয়স কম, দুনিয়া সম্পর্কে অজ্ঞ, সতর্ক না হলে বিপদ হতে কতক্ষণ। অন্তরাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন তিনি, বিয়ের পর প্রথম বছর তাঁর সন্তান হলে সে-ও আজ অন্তরার বয়সী হত। নিজেকে তিনি মনে করিয়ে দিলেন, মেয়েটার ওপর নজর রাখতে হবে তাঁর। ওর ভাই আর ভাবী এ-সময়টায় ঢাকায় থাকলে ভাল হত, ভাবলেন তিনি।

*

অফিসটা মতিঝিলে। এলিভেটরে চড়ে সাততলায় উঠে এল অন্তরা। কিসের রোমাঞ্চ আর কিসের পুলক, ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে ওর, ঘামতে শুরু করেছে হাতের তালু। অজানা একটা ভয়ে ধুক ধুক করছে বুকের ভেতরটা। মাত্র কয়েক মিনিট আলাপ হয়েছে ভদ্রলোকের সঙ্গে, তাঁর সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না ও। কে জানে, কেমন মানুষ তিনি। আজকাল বাইরে থেকে দেখে ক'জন মানুষকেই বা চেনা যায়। কাঁচ লাগানো একটা দরজার গায়ে নামটা দেখতে পেল অন্তরা—লাল প্লাস্টিকের ওপর সাদা হরফে লেখা রয়েছে, মাসুদুর রহমান, আর্কিটেক্ট। উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে ভয়টা আরও বেড়ে গেল ওর। বড় একটা কামরা, ভেতরে দুটো দামী সোফা সেট আর কয়েকটা চেয়ার রয়েছে। একপাশে একটা ডেস্ক, ডেস্কের পিছনে বসে রয়েছে একটা মেয়ে। মেয়েটাকে পাশ থেকে দেখতে পাচ্ছে অন্তরা, তার অনাবৃত্ত পা ও হাঁটু দেখে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল। ঢাকার অফিস পাড়ার মেয়েরা আজকাল তাহলে মিনি স্কার্টও পরে নাকি? একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল মেয়েটা, হঠাৎ মুখ তুলে সরাসরি দরজার দিকে তাকাল। এরপর আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, ঢুকতেই হয় ভেতরে। ওকে ঢুকতে দেখে নড়েচড়ে বসল মেয়েটা, মিষ্টি করে হাসল, বলল, 'আসুন, বসুন। আপনিই তো মিস অন্তরা, মানে শাকিলা সামাদ, তাই না? বস্ একটু পরই আপনাকে ডাকবেন।'

একটা সোফায় বসল অন্তরা। মেয়েটাকে সুন্দরীই বলা যায়। চেয়ারে বসে ঘন ঘন পা দোলাচ্ছে দেখে ভাল লাগল না ওর। ভাল লাগল না তার হেভী মেকআপও।

একটু পরই একটা বেল বেজে উঠল। রিসেপশনিস্ট মেয়েটা চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এল অন্তরার দিকে, তার পিছু নেয়ার ইঙ্গিত করল। বড় একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। নক করল মেয়েটা। অচেনা

একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এল ভেতর থেকে, 'কাম ইন।'

দরজাটা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল রিসেপশনিস্ট মেয়েটা। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে ভেতরে ঢুকে পড়ল অন্তরা। মনে মনে ভাবছে, না এলেই বোধহয় ভাল হত।

ভেতরে ঢুকেই মাসুদুর রহমানের মুখোমুখি হল ও। কার্পেটের ওপর দিয়ে সোজা ওর দিকে এগিয়ে এলেন তিনি, অন্তরার একটা হাত এমন ভাবে ধরে ডেস্কের দিকে টেনে নিয়ে চললেন, যেন তিনি তাঁর পুরানো কোন বন্ধুকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। টেনে নিয়ে এসে একটা আর্মচেয়ারে ওকে বসিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। বসার পর অন্তরা খেয়াল করল, জানালার পাশে সোফায় একটা মেয়ে, খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে ওকে। মেয়েটি বাঙালী নয়। তবে কোন্ দেশের, ঠিক ধরতে পারল না। খুবই ফর্সা, নাক একটু চ্যাপ্টা। গায়ের রঙ হলদেটে, কোরিয়ান বা চীনা হতে পারে। এ-ও মিনি স্কার্ট পরে আছে। স্কার্টের ওপর ওটা শার্ট নয়, গেঞ্জি। যে সোফায় বসে আছে, সেটার পিঠে একটা লেডিস কোট ঝুলছে। লজ্জায় মেয়েটার বুকের দিকে তাকাতেই পারল না অন্তরা। এরকম নির্লজ্জ পোশাক পরা একটা মেয়ের সঙ্গে একা কি করছেন মাসুদুর রহমান? ওর মনে হল, এখানে এসে ভুলই করেছে ও।

একবার চোখ বুলিয়েই এ-সব দেখে নিল অন্তরা। ইতিমধ্যে ডেস্কের পিছনে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসেছেন মাসুদুর রহমান, অন্তরার এনভেলাপটা খুলে ভেতর থেকে কাগজ-পত্র বের করছেন। 'ও হল শাকিলা সামাদ, ডাকনাম অন্তরা,' বিদেশী মেয়েটাকে বললেন তিনি। উত্তরে মৃদু হেসে অন্তরার উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। অন্তরার দিকে তাকিয়ে মাসুদুর রহমান আবার বললেন, 'আর ও হল উমা ওয়াঙচুক, আমাদের একজন কলিগ।' জোর করে সামান্য হাসল অন্তরা, মাথাটাও একটু ঝাঁকাল।

'তুমি তাহলে তোমার সিদ্ধান্ত পাল্টেছ?' কাগজ থেকে চোখ তুলে জানতে চাইলেন মাসুদুর রহমান।

অন্তরা ম্লান মুখে জানাল, টেলিভিশনের চাকরিটা হয়নি। 'দোষটা আসলে আমারই,' বলল ও। 'আমিই কাজটা পাব, এটা ধরে নেয়া উচিত হয়নি আমার।' একটু থেমে আবার বলল, 'কাল সারাটা দিন বহু জায়গায় ঘুরেছি, অনেকের সাথে কথা হল, কিন্তু লাভ হয়নি কোন। অথচ চাকরি একটা খুবই দরকার আমার...।'

চুপচাপ কয়েক সেকেণ্ড অন্তরার দিকে তাকিয়ে থাকলেন মাসুদুর রহমান। তারপর ঠোঁটে ক্ষীণ একটু বাঁকা হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'কাজেই ধাক্কা খেয়ে শেষ পর্যন্ত আমার কাছে ধরনা দিতে এসেছ, মরিয়া হয়ে?' গলার সুরটা নরম, তবে ভাষাটা শুনে চোখ-মুখ গরম হয়ে উঠল অন্তরার।

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। কিন্তু প্রথমে আপনিই আমাকে প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন, মিস্টার রহমান।'

অন্তরার চোখে চোখ রেখে হাসলেন ভদ্রলোক, অন্তরা অনুভব করল ওর আকস্মিক রাগ কর্পূরের মত উবে গেল। 'দুঃখিত, কিছু মনে কোরো না। আমি আসলে ঠাট্টা করছিলাম। বলতে পারো, বদলা নিলাম। শোধবোধ হয়ে গেল, কেমন?'

ঠোঁট মুড়ে হাসল অন্তরা। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে।' বদলা নেয়ার অধিকার তাঁর অবশ্যই আছে, কারণ ওর বয়েস ও আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে অল্প কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে হলেও তাঁকে বোকা বানিয়েছিল অন্তরা। তাছাড়া, এমনিতেও এই ভদ্রলোকের ওপর রাগ করা অসম্ভব একটা ব্যাপার। তাঁর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, শিশুর মত অরক্ষিত বলে মনে হল অন্তরার। বড় জোর অভিমান করা যায়, অত্যাচার ও আবদারও করা যায়, কিন্তু রাগ বা ঘৃণা করা সম্ভব নয়। ওর সঙ্গে তাঁর কথা বলার ভঙ্গি, কফি রঙের চোখ মেলে ওর দিকে

তাকাবার ধরন, সবকিছুতেই অদ্ভুত একটা আদর বা মায়া-মমতার কোমল ছোঁয়া আছে।

'তাহলে মরিয়া নয়, আমার প্রস্তাবে আগ্রহী হয়ে এসেছ তুমি,' শান্ত স্বরে বললেন ভদ্রলোক। মাথা ঝাঁকিয়ে চট করে একবার মেয়েটার দিকে তাকাল অন্তরা। দেখল, সোফার পিঠ থেকে ভেলভেটের কোটটা নিয়ে গায়ে দিচ্ছে সে। কোটটার ওপর ওর দৃষ্টি আটকে গেল। নানা ধরনের ফিতে আর বোতাম লাগানো হয়েছে ওটায়, এত সুন্দর যে চোখ পড়ামাত্র দম আটকে আসে। অন্তরার ইচ্ছে হল উঠে গিয়ে কাছ থেকে দেখে ওটাকে, হাত দিয়ে ছুঁয়ে অনুভব করে কাপড়টা।

'দাঁড়াও, উমা, তোমার কোটটা ওকে দেখতে দাও,' ইংরেজিতে বললেন মাসুদুর রহমান।' ও ভাল করে না দেখলে, ওর সেন্স সম্পর্কে কোন ধারণা পাব না আমি।' এরপর তিনি অন্তরার দিকে ফিরলেন, খুক করে কেশে বাংলায় জানতে চাইলেন, 'ইংরেজি বুঝতে কি অসুবিধে হবে তোমার? মানে ঘরোয়া আলাপ করার মত ইংরেজি তুমি জানো কিনা?'

'কোন রকম,' ঢোক গিলে বলল অন্তরা। 'ছ'মাসের একটা কোর্স কমপ্লিট করেছি, কিন্তু অনেক দিন চর্চা নেই তো, আপনি একটু সাহায্য করলে কোন অসুবিধে হবে না।'

কোটটা আগেই পরে নিয়েছে বিদেশী মেয়েটা, এগিয়ে এসে অন্তরার সামনে দাঁড়াল। তারপর পিছন ফিরল, কয়েক পা হাঁটল, পাশ ফিরল, কয়েক পা হাঁটল। অন্তরার দিকে ফিরে কোটের দু'পকেটে হাত ঢোকাল, হাত দুটো বের না করে সরিয়ে নিয়ে গেল পিঠের দিকে, ফলে কোটের সামনের অংশটা খুলে গেল পুরোপুরি। সবশেষে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কোটটা গা থেকে খসে পড়তে দিল সে, ধরে রাখল এক হাতে।

মেয়েটিকে ঘিরে দু'বার চক্কর দিল অন্তরা, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কোটটা দেখল। 'কোথাও কোন সীম নেই,' বিড়বিড় করল ও। 'সীমলেস।

অসাধারণ একটা জিনিস।' কথাটা ঠিক, ধরতে ভুল করেনি অন্তরা। দেখে মনে হবে, কোটটা এক টুকরো কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। 'এ-ধরনের ড্রেস-এর কথা শুনেছি, কিন্তু আগে কখনও দেখিনি…।' সিধে হল অন্তরা, বড় করে শ্বাস টানল।

'জোড়া নেই তা নয়, আছে, মাত্র একটা,' উজ্জ্বল হেসে বললেন মাসুদুর রহমান; তাঁর চোখ আনন্দে চকচক করছে।

শব্দ করে হেসে উঠে উমা ওয়াঙচুক জানালার কাছে ফিরে গেল। অন্তরাও আর দাঁড়িয়ে না থেকে বসে পড়ল নিজের চেয়ারে।

'তোমার তাহলে পছন্দ হয়েছে ওটা?' মাসুদুর রহমান জানতে চাইলেন, এবার ইংরেজিতে।

মাথা ঝাঁকাল অন্তরা, মনে মনে ভাবছে তার চাকরির সঙ্গে এ-সবের সম্পর্ক কি? ভুল হলে হবে, তবু ইংরেজিতেই উত্তর দেবে। 'ইট'স ভেরি ক্লেভার, লাইক—ওয়েল, লাইক ইঞ্জিরিয়ারিং। বাট আই ডোন্ট সী হোয়াট ইট'স গট টু ডু উইথ মি।'

ওর প্রশ্ন শুনে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে তাকিয়ে থাকলেন মাসুদুর রহমান। তারপর বললেন, 'আছে, তোমার কাজের সাথে ওটার একটা সম্পর্ক আছে। ওট কুচার বলতে কি বোঝায় তুমি জানো, অন্তরা?'

'ফেঞ্চ শব্দ, তাই না? উঁচুদরের ফ্যাশন বা ওই ধরনের কিছু একটা বোঝায়, তাই না? না, বিশেষ কিছু জানি না। তবে কলেজে আমার বান্ধবীরা এ নিয়ে আলোচনা করত, শুনেছি। কাপড় সম্পর্কে আমার আগ্রহ আছে, কিন্তু সেটা বোনার বেলায়, ডিজাইনের বেলায় নয়। কেমন যেন ধাঁধা লাগছে…এ-সবের সাথে আমার কি সম্পর্ক?'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন মাসুদুর রহমান। 'উমা, আমাদের যাবার সময় হয়েছে।' অন্তরার দিকে ফিরলেন তিনি। 'তোমার সাথে কি সম্পর্ক, জানতে হলে আমাদের সাথে এক জায়গায় যেতে হবে তোমাকে। ওঠো।'

দম দেয়া পুতুলের মত দাঁড়াল অন্তরা, ভয়ানক দ্বিধায় পড়ে গেছে। এখনও প্রায় অচেনাই বলা যায় মাসুদুর রহমানকে, তাঁর সঙ্গে হঠাৎ এভাবে কোথায় যাবে ও? যাওয়াটা কি উচিত হবে? কোথাও যেতেই বা হবে কেন, এখানে বসে আলাপ করতে অসুবিধে কি? বেহায়ার মত কাপড় পরা বিদেশী একটা মেয়ে রয়েছে লোকটার সঙ্গে, ওদের মনে কি আছে কে জানে। যাবে কি যাবে না, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না অন্তরা, এই সময় ওর হাত ধরে দরজার দিকে পা বাড়ালেন মাসুদুর রহমান। বিড়বিড় করে বললেন, 'তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।'

এরপর আর আপত্তি করার সুযোগ পেল না অন্তরা।

টয়োটা স্টারলেটে চড়ে রওনা হল ওরা। নীল ইউনিফর্ম পরা একজন শোফার গাড়িটা চালাচ্ছে। শোফারের পাশে, সামনের সীটে বসেছে উমা ওয়াংচুক। পিছনের সীটে, মাঝখানে বিরাট ব্যবধান রেখে, বসেছে অন্তরা ও মাসুদুর রহমান। গাড়িতে ওঠার পর শোফারকে গুলশানে যাবার কথা বলেছেন তিনি।

'গুলশানে আমরা একটা ফ্যাশন হাউস গড়ে তোলার চেষ্টা করছি,' ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে অন্তরাকে বললেন ভদ্রলোক। জানালেন, খুব তাড়াতাড়ি খাড়া করতে হবে ওটাকে, কারণ আগামী শীতে কুয়ালালামপুরে বিরাট একটা ফ্যাশন শো হতে যাচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে সেখানে নতুন ডিজাইনের ড্রেস পাঠাতে হবে। শাড়ি-ব্লাউজ ও সালোয়ার-কামিজের চাহিদা শুধু যে পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশে আছে তা-ই নয়, এশিয়ার আরও অনেকগুলো দেশে এগুলো চলে। বিশেষ করে সিঙ্গাপুর, হংকং আর ইন্দোনেশিয়ার ব্যবসায়ীরা এ-সব ড্রেস মালয়েশিয়া থেকে আমদানি করছে। মাসুদুর রহমান চাইছেন, তাঁর ফ্যাশন হাউসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সবগুলো দেশে এ-ধরনের ড্রেস

রফতানি করবেন। বিশেষ করে বাংলাদেশী ড্রেস। সেজন্যে বাংলাদেশী প্রচুর মডেল দরকার হবে তাঁর। দরকার হবে ডিজাইনারের

'আপনি কি শুধুই একজন আর্কিটেক্ট, নাকি ফ্যাশন জগতের সাথেও জড়িত?' জানতে চাইল অন্তরা। মাসুদুর রহমান আজেবাজে বিষয়ে আলাপ করছেন না, আলাপ করছেন ব্যবসা ও কাজ নিয়ে, ফলে বিপদের ভয়টা কমে গেছে ওর।

ওর প্রশ্ন শুনে হাসলেন মাসুদুর রহমান। 'ঠিক ধরেছ, ফ্যাশন জগতেও আছি আমি। কিন্তু মন দিয়ে শোনো, আমার প্ল্যানে তোমার ভূমিকাটা কোথায়।' অন্তরার দিকে ঝুঁকে পড়লেন তিনি, সীটের ওপর দিয়ে একটা হাত চলে এল ওর মাথার পিছনে। ভদ্রলোকের সপ্রতিভ ভঙ্গি ও ব্যক্তিত্ব সচেতন করে তুলল অন্তরাকে।

'জ্বী, বলুন।'

'এ-সব দেখাশোনা করার জন্যে ঢাকায় আমার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে,' এসব মানে আর্কিটকচার নয়, ফ্যাশন; ধরে নিল অন্তরা। 'কিন্তু মেয়েটা অসুস্থ···ঠিক অসুস্থ নয়, মা হতে চলেছে। সামান্য জটিলতা দেখা দেয়ায় ডাক্তার তাকে বিশ্রাম নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। হঠাৎ করে ঘটেছে ব্যাপারটা, ফলে এই মুহূর্তে আমার কোন অ্যাসিস্ট্যান্ট নেই। আমি চাই, তার জায়গাটা তুমি দখল করো। কিন্তু তোমার কাছ থেকে আরও বেশি কিছু চাই আমি। আসলে এমন একজনকে খুঁজছি যার মাথা থেকে নিত্য নতুন আইডিয়া বেরোবে···।'

'কিন্তু আমি তো এ-সব বিষয়ে কিছুই জানি না!' প্রতিবাদ করল অন্তরা। 'আমাকে দায়িত্ব দিলে স্রেফ লোক হাসাব। কি করতে হবে আমাকে, শুনি?'

'আমার দরকার নতুন নতুন আইডিয়া,' আবার বললেন মাসুদুর রহমান, অন্তরার কথা যেন শুনতেই পাননি। 'যেমন ধরো, ফ্যাশন হাউসটা দেখতে কেমন হবে, এ-ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

ড্রেস আমরা কি তৈরি করি না করি সেটা পরের কথা, কিন্তু হাউসটাকে তো সুন্দর দেখাতে হবে? তা না হলে বিদেশী ক্রেতারা মুগ্ধ হবে কেন? এ-ব্যাপারে তোমার আইডিয়া কাজে লাগবে, আমি জানি।

'আমি যখন ঢাকায় থাকব, তুমি হবে আমার ছায়া,' বলে চলেছেন মাসুদুর রহমান। 'লোকজন কৌতূহল নিয়ে আমাদের ওখানে আসবে, ফোন করবে, তুমি কথা বলবে তাদের সাথে। কোন মেসেজ দিতে চাইলে, টুকে রাখবে সেগুলো। ডেকোরেশন সম্পর্কে পরামর্শ দেবে, কারণ তোমার চোখ আছে, অন্তরা। আ ফ্রেশ অ্যাপ্রোচ, হুইচ ইজ নট ইজি টু ফাইণ্ড। সুতো আর কাপড়ের সাপ্লাইয়ারদের পিছু ধাওয়া করবে, রঙ পরীক্ষা করবে ও মেলাবে। যেখানে, যাকে দরকার, আইডিয়া দিয়ে সাহায্য করবে। এ-সবের ফাঁকে নিজেও তুমি ফ্যাশন সম্পর্কে অনেক কিছু শিখে নেবে। কেউ যদি তোমার মৌখিক আইডিয়া গ্রহণ না করে, কুছ পরোয়া নেই, সব তুমি কাগজে লিখে তুলে দেবে রীনার হাতে…।'

'রীনা?'

'রীনা চৌধুরী, আমাদের আর্ট ডিপার্টমেন্টের চীফ। তিনি দেখা হলেই আমাকে বলছেন, নতুন আইডিয়ার অভাবে চোখে অন্ধকার দেখছেন। বলছেন, বুড়ি হয়ে গেছেন তিনি।' অন্তরার চোখে চোখ রেখে হাসলেন মাসুদুর রহমান। 'রীনা চৌধুরীর বয়স মাত্র ছত্রিশ।'

অনেকক্ষণ আর কোন কথা হল না। একটু পরই গুলশানে পৌঁছে গেল ওরা, চওড়া একটা রাস্তার ধারে থামল ওদের সাদা টয়োটা। পাশেই নতুন একটা বাড়ি, বাড়িটার সব কাজ এখনও শেষ হয়নি। তিনতলায় কাজ করছে মিস্ত্রিরা। অন্তরা ধারণা করল, এটাই সম্ভবত মাসুদুর রহমানের ফ্যাশন হাউস হতে যাচ্ছে। ওর ধারণাই ঠিক, গাড়ি থেকে নেমে গেটের দিকে এগোলেন মাসুদুর রহমান। বাড়ির উঠনে ও বারান্দায় নতুন ফার্নিচার, পারটেক্স, জানালা-দরজার পর্দা ইত্যাদি

জড়ো করে রাখা হয়েছে।

'চলো, দোতলায় বসি,' বললেন মাসুদুর রহমান। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা বিশাল এক হলরুমে। হলরুমের একধারে একটা প্যাঁচানো সিঁড়ি দেখা গেল, উঠে গেছে গ্যালারিতে। অন্তরা এখনও হলরুমের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, দরজার পাশে ফেলে রাখা চকচকে একটা ব্রোঞ্জপ্লেট কেড়ে নিয়েছে ওর দৃষ্টি। দরজার পাশে, দেয়ালে লটকানো হবে ওটা।

'ঘুরেফিরে চারদিকটা দেখো,' ফিরে এসে অন্তরার পিছনে দাঁড়ালেন মাসুদুর রহমান। প্লেটটার দিকে এখনও ঝুঁকে রয়েছে ও, লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করছে। 'টেলিভিশন তোমাকে যা দিত, তারচেয়ে অনেক বেশি পাবে এখানে তুমি, অন্তরা,' হালকা সুরে বললেন তিনি। 'এখানে তুমি তোমার মেধা কাজে লাগাবার প্রচুর সুযোগ পাবে। ড্রেস বা ফ্যাশন ভাল না লাগলে না-ই লাগল, ডেকোরেশন নিয়ে কাজ করো, কাজ করো ফ্যাশন শো-র ওপর। প্রতি মাসে এখানে আমরা ফ্যাশন শো করব।'

সিধে হল অন্তরা, এখনও ব্রোঞ্জ প্লেটটার দিকে তাকিয়ে আছে। মাসুদুর রহমান বুঝতে পারলেন, তাঁর কথাগুলো মেয়েটার কানে গেলেও মন দিয়ে শোনেনি ও। অন্তরাকে বিস্মিত দেখাচ্ছে, যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

'তখন বললেন, আপনি ফ্যাশনের সাথেও জড়িত ' বলল অন্তরা, ওর ঘন কালো চোখ দুটোয় দিশেহারা ভাব। 'আমি বুঝতে পারিনি... ।'

'কি বুঝতে পারোনি, অন্তরা?'

'এখানে লেখা রয়েছে "হাউস অভ জেসমিন কুয়ালা"। জেসমিন কুলায়া মানে তো পৃথিবী বিখ্যাত ফ্যাশন হাউস! কুয়ালা হাউস বললেই সবাই চেনে!' চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে ওর।

মাসুদুর রহমান মাথা ঝাঁকালেন।

'কুয়ালা...আপনার নামের শেষেও কুয়ালা...,' বিড়বিড় করছে অন্তরা, চোখ তুলে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল।

আবার মাথা ঝাঁকালেন মাসুদুর রহমান। 'এর মধ্যে গোপন করার কিছু নেই। আমাদের পরিবারের সবাই আমরা নামের শেষে কুয়ালা ব্যবহার করি।'

'জেসমিন চৌধুরী একজন বাঙালী ডিজাইনার। প্যারিসের একটা ডিজাইন সেন্টার থেকে ডিগ্রী নিয়ে কাজ শুরু করেন হংকঙে। দুনিয়ার প্রথম শ্রেণীর ডিজাইনারদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ভদ্রমহিলা অল্প বয়েসে মারা যান, তাই না? আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশের জন্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি বয়ে এনেছেন জেসমিন চৌধুরী। সব কথা মনে করতে পারছি না, তবে জানি যে ভদ্রমহিলার ব্যক্তিগত জীবন খুবই করুণ...,' ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে অন্তরা, ওর একটা হাত ধরে টান দিলেন মাসুদুর রহমান, হলরুমের ভেতর নিয়ে এলেন ওকে।

'জেসমিন চৌধুরী বিয়ে করেন হংকঙ প্রবাসী এক ধনী বাঙালী ব্যবসায়ীকে। ভদ্রলোকের নাম খালেদুর রহমান,' অন্তরাকে বললেন তিনি।

অন্তরা লক্ষ করল, মাসুদুর রহমানের চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

'একদিন সব কথা খুলে বলব আমি তোমাকে। আজ শুধু এইটুকু শোনো, জেসমিন চৌধুরী বা বিখ্যাত জেসমিন কুয়ালা, কুয়ালা ফ্যাশন হাউসের প্রতিষ্ঠাত্রী, আমার মা।'

হাঁ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল অন্তরা, ওর মাথা রীতিমত ঘুরছে।

'সে বিরাট এক কাহিনী,' ওকে বললেন মাসুদুর রহমান। 'তবে এই মুহূর্তে আমি শুধু জানতে চাই, তুমি কি এখানে আমাদের সাথে কাজ করতে রাজি আছ?'

তাকিয়ে আছে অন্তরা, চোখে পলক নেই। ও জানে, সম্পূর্ণ অচেনা একটা জগতে ঢোকার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে ওকে। এখানে ওর মত সাধারণ একটা মেয়ের থই পাবার কথা নয়। তবে এরইমধ্যে মাসুদুর রহমান ওর নিস্তরঙ্গ জীবনে বিরাট একটা আলোড়ন তুলেছেন, রঙিন ও রোমাঞ্চকর স্বপ্ন দেখাতে প্ররোচিত করছেন। 'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বিড়বিড় করে বলল ও। 'কবে থেকে জয়েন করব আমি?'

চার

ঘুম ভাঙার পর অন্তরা দেখল জানালা দিয়ে রোদ ঢুকেছে ঘরে। তীব্র আলো লাগায় চোখ মিটমিট করল, এক নিমেষে মনে পড়ে গেল সব কথা। ভাল লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র অস্তিত্বে। ঠিক যা চাইছিল, একটা ভাল লাইন পেয়ে গেছে ও। শুধু যে কুয়ালা ফ্যাশন হাউসে চাকরি পেয়েছে তা নয়, ওখানে কাজের পরিবেশটাও অত্যন্ত আনন্দময়। ইতিমধ্যে ফ্যাশন হাউসের সিনিয়র স্টাফরা জেনে ফেলেছেন ড্রেস মেকিং বা ফ্যাশন সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না ও, কিন্তু কেউ তারা বিরক্ত বা মনঃক্ষুণ্ন হননি, সাধ্যমত বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্যের হাত। কাজের এত সুন্দর পরিবেশ ঢাকার আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। ভাগ্যটা অন্যান্য দিকেও ভাল, ওর চাকরি হয়েছে শুনে ভাই-ভাবী দু'জনেই প্রায় জোর করে রাজি করিয়েছে, ওদের ফ্ল্যাটেই থাকতে হবে ওকে। ওরা অনুরোধ করায় মনে মনে খুশিই হয়েছে অন্তরা, তা না হলে নারায়ণগঞ্জ থেকে রোজ অফিস করতে হত

ওকে। হোস্টেল ও নারায়ণগঞ্জ থেকে নিজের সব জিনিস-পত্র নিয়ে চলে এসেছে অন্তরা। সিঁড়ি সংলগ্ন একটা কামরা দেয়া হয়েছে ওকে, ভাই-ভাবীকে বিরক্ত না করে যখন খুশি আসা-যাওয়া করতে পারবে ও।

তাড়াতাড়ি গোসল সেরে কাপড় পরে নিল অন্তরা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গুলশান, মহাখালি আর মতিঝিলে ছুটোছুটি করতে হয় ওকে, কাপড় পাল্টাবার সুযোগ হয় না। কোন কোন দিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত আর্ট ডিপার্টমেন্টের স্টুডিয়োতে কাটাতে হয়, হাত-মুখে পানি দেয়ারও সময় হয় না।

হাতে টাকা নেই, তবু ভাল দুটো শাড়ি ও দু'সেট থ্রী-পিস কিনছে অন্তরা। কিনেছে বাকিতে। শোভাতে শাড়ি নেই, তবে থ্রী-পিস আছে, কিন্তু বাকি চাইতে সাহস হয়নি ওর। ব্যাংকে টাকা থাকা সত্ত্বেও বাকি কেন, অন্তত সীমা ভাবীর মনে এ-প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এলিফেন্ট রোডের প্রায় দোকানদারই ওকে চেনে, বাকি পেতে কোন অসুবিধে হয়নি ওর।

অফিসের কাজে বাইরে ঘুরতে হয় অন্তরাকে, তবে একা একা নয়। হয় ম্যানেজার এনাম আহমেদ, নয়ত আর্ট ডিপার্টমেন্টের চীফ রীনা চৌধুরী থাকে ওর সঙ্গে। দু'জনেই ওঁরা, বিশেষ করে এনাম আহমেদ, গার্মেন্টস ব্যবসার গোপন রহস্য সম্পর্কে রোজই কিছু কিছু জ্ঞানদান করছেন ওকে, সেই সঙ্গে ফ্যাশন জগতের রথী-মহারথীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন।

মাঝে মধ্যে ভিজিটরদের এন্টারটেইন করাতে হয় অন্তরাকে, কফি খেতে দিয়ে ব্যবসা সংক্রান্ত এটা-সেটা আলাপ করতে হয়, যতক্ষণ না রীনা চৌধুরী বা মাসুদুর রহমান তাঁদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পান। রীনা চৌধুরী বা এনাম আহমেদের সঙ্গে এয়ারপোর্টেও যেতে হয় ওকে, বিদেশ থেকে আসা ডেলিগেটদের অভ্যর্থনা জানাতে। ইতিমধ্যে

আলাপ করার মত ইংরেজি শিখে নিয়েছে ও, বিদেশীদের সঙ্গে কথা বলতে দ্বিধা বোধ করে না। বেশিরভাগ ডেলিগেটই হয় সিঙ্গাপুর-হঙকঙের, নয়ত ফ্রান্সের, তারা নিজেরাও খুব ভাল ইংরেজি জানে না।

মোট কথা, প্রতিটি দিনই রোমাঞ্চকর লাগছে অন্তরার।

দু'একদিন পরপর হঠাৎ মাসুদুর রহমানের সঙ্গেও দেখা হয়ে যায় ওর। হয় তিনি গুলশানে ওদের ফ্যাশন হাউসে আসেন, নয়ত জরুরী কোন আলোচনার জন্যে রীনা চৌধুরী বা এনাম আহমেদের সঙ্গে তাঁর মতিঝিলের আর্কিটেক্ট অফিসে যায় অন্তরা। দেখা হলেই মাসুদুর রহমানের কফি রঙা চোখ আনন্দে ঝিক করে ওঠে, লক্ষ করেছে অন্তরা। প্রতিবারই জিজ্ঞেস করেন তিনি, কেমন লাগছে ওর? হেসে জবাব দেয় অন্তরা, ভাল লাগছে। জবাব দেয়ার সময় লালচে হয়ে ওঠে ওর মুখ, মনে মনে প্রার্থনা করে—আল্লা, কেউ যেন টের না পায়! মাঝে মধ্যে মনটা খারাপ হয়ে যায় অন্তরার, কারণ বাইরে থেকে ফিরে এসে শোনে গুলশানের ফ্যাশন হাউসে এসেছিলেন বস্, কিন্তু ও তখন ছিল না। দেখা হল না, এই দুঃখে দিনটাই মাটি হয়ে যায় ওর, সেদিন আর কিছুই ভাল লাগে না।

ইতিমধ্যে দু'দিন অন্তরাকে জিনস-এর প্যান্ট ও শার্ট পরার জন্যে তাগাদা দিয়েছেন রীনা চৌধুরী। লজ্জা করে, এই অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে অন্তরা। কিন্তু বুঝতে পারছে, বেশিদিন এড়িয়ে থাকা যাবে না। আরও তিনটে মেয়েকে নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে, মাসুদুর রহমানের নির্দেশে অন্তরাই তাদেরকে বাছাই করেছে, অর্ডার সংগ্রহ করাই তাদের আসল কাজ। বলতে যা দেরি, তিনজনই অফিস করছে জিনসের প্যান্ট পরে। অন্তরা পরছে না দেখে একদিন ওকে প্রায় জোর করে একটা টেইলারিং শপে নিয়ে গেলেন রীনা চৌধুরী। এক জোড়া প্যান্ট ও শার্টের অর্ডার দেয়া হল, নিজের কাছ থেকে কিছু টাকা ধারও দিলেন তিনি। বললেন, বেতন পেলে

ফিরিয়ে দিয়ো।

নিয়মিত অফিস করছে অন্তরা, কিন্তু প্রায় কোন খরচই হচ্ছে না ওর। অফিসে যাবার পথে হয় অ্যাকাউন্ট্যান্ট জাহিদ হাসান অফিসের গাড়িতে তুলে নেয় ওকে। পৌঁছেও দেয়। বাড়ি থেকে অনেকের খাবার আসে, জোর করে খাওয়ানো হয় অন্তরাকে। মাঝে মধ্যে, বাইরে থাকার সময়, হোটেলে খেতে হয় ওদেরকে। ওরাই বিল দেয়, অন্তরা দিতে চাইলে নেয় না, বলে, 'অফিসের খরচে খাচ্ছি।'

কর্মক্ষেত্রে যেমন রোমাঞ্চের শেষ নেই, তেমনি বাড়ির পরিবেশেও আনন্দের কমতি নেই। শিপলু ভাই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে। অপারেশন দরকার হয়নি, ওষুধেই কাজ হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন, নিয়মিত ওষুধ খেলে আগামী বিশ বছর কোন অসুবিধে হবে না। ফলে ভয়-ভাবনা ঝেড়ে ফেলে সম্পূর্ণ নতুন একটা মানুষ হয়ে উঠেছে শিপলু ভাই। তার বয়স যেন দশ বছর কমে গেছে। অনেক দিন পর প্রাণ খুলে হাসছে সীমা ভাবীও। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ওরা এত ভালবাসে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ওদের আনন্দের একজন ভাগীদার অন্তরাও। দাদা-দাদীর কথা বাদ দিলে আপনজন বলতে ওরাই তো। নারায়ণগঞ্জে ওর দাদা-দাদীও ভাল আছেন, বুড়ো বয়েসে যতটা ভাল থাকা সম্ভব। ইতিমধ্যে তাঁদেরকে একবার দেখেও এসেছে অন্তরা।

দেখতে দেখতে একটা মাস পেরিয়ে গেল। তারপর এসে পড়ল ওর বেতনের দিন। কত পাবে, অন্তরার কোন ধারণা ছিল না। ম্যানেজার এনাম আহমেদ বেতনের টাকাটা এনভেলাপে ভরে যখন ওর হাতে দিলেন, সারা শরীর একটু একটু কাঁপছিল ওর। জীবনের প্রথম চাকরির প্রথম মাসের বেতন।

'ওখানে শুধু তোমার বেতন নয়, যাতায়াত ভাড়া, পোশাক ভাতা ও বাড়ি ভাড়াও আছে,' বললেন এনাম আহমেদ। 'খুলে দেখো কত। তোমার বেতন পাঁচ হাজার টাকা। বিক্রির ওপর কমিশনও পাবে, তিন

মাস পরপর।'

অবিশ্বাসে দম বন্ধ হয়ে এল অন্তরার। কি জানি আমি, পাঁচ হাজার টাকা বেতন দেয়া হবে? সন্দেহ হল, মাসুদুর রহমান কি ওর ওপর করুণা করছেন? আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। এনভেলাপটা খুলে দেখল, মোট টাকা রয়েছে সাড়ে ন'হাজার টাকা। নিজের অজান্তেই বলে ফেলল, 'এত টাকা?'

'বাড়ি ভাড়া আড়াই হাজার টাকা,' বললেন এনাম আহমেদ। 'গাড়ি ভাড়া এক হাজার। পোশাক ভাতা একহাজার। মোট সাড়ে ন'হাজার।'

'কিন্তু, এনাম সাহেব, আমি কি এত টাকা বেতন পাবার উপযুক্ত?' এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না অন্তরা। 'আপনার কোথাও ভুল হয়নি তো?'

চেয়ারে হেলান দিয়ে অন্তরার দিকে তাকালেন এনাম আহমেদ। 'কুয়ালা ফ্যাশন হাউস সম্পর্কে তুমি আসলে তেমন কিছু জানো না, তাই একথা বলছ। এখানে আমাদের একজন পিয়নের বেতন সাড়ে চার হাজার টাকা, তাকেও যাতায়াত ভাড়া দেয়া হয়, বছরে দু'বার কিনে দেয়া হয় ইউনিফর্ম। আর উপযুক্ততার কথা যদি বলো, যা বেতন পাচ্ছ তারচেয়ে অনেক বেশি উপযুক্ততা রয়েছে তোমার— ইতিমধ্যে সেটা তুমি প্রমাণও করেছ।'

'প্রমাণ করেছি?'

'আমাদের এই ফ্যাশন হাউসের ডেকোরেশন বাবদ বাজেট ছিল পঁচিশ লাখ টাকা। সিদ্ধান্ত হয়েছিল টেণ্ডার ডেকে কাজটা কোন কোম্পানীকে দেয়া হবে। কিন্তু তোমার পরামর্শ পাবার পর সিদ্ধান্তটা পাল্টাই আমরা।'

গ্যালারি সহ ফ্যাশন হাউস সাজাবার জন্যে তিনজন আর্টিস্টকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করে অন্তরা, সবাই তারা ওর বান্ধবী। কি রকম ডেকোরেশন হবে, তা দেখাবার জন্যে তিনজন তিনটে ডিজাইন

তৈরি করে ওরা। তিনটে থেকেই কিছু কিছু নিয়ে অন্তরা নিজে একটা ডিজাইন তৈরি করে, এবং সেটাই অনুমোদন করেন মাসুদুর রহমান। অন্তরার ডিজাইন ধরে ফ্যাশন হাউস সাজাতে খরচ পড়বে মাত্র তেরো লাখ টাকা। তারমানে কোম্পানীর বেঁচে গেছে বারো লাখ টাকা।

একটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল। কিন্তু বিক্রির ওপর কমিশন, সেটা আবার কি?

প্রশ্ন শুনে হাসলেন এনাম আহমেদ। 'তিনজন সেলস রিপ্রেজেনটেটিভকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছ তুমি, তাই না? ওরা বিক্রির ওপর কমিশন পাবে, শতকরা দু'পার্সেন্ট। তুমিও পাবে, শতকরা এক পার্সেন্ট। এই ব্যবস্থা এই জন্যে করা হয়েছে, ওরা ভাল বেচাকেনা করতে না পারলে নিজের স্বার্থেই ওদের বদলে অন্য লোক আনবে তুমি।'

আনন্দে এতটাই অস্থির হয়ে উঠল অন্তরা, ইচ্ছে হলে এখুনি ছুটে গিয়ে শিপলু ভাইকে খবরটা দিয়ে আসে। কিন্তু সেটা ছেলেমানুষি হয়ে যাবে, তাই চিন্তাটা বাতিল করে দিল। তার বদলে সিদ্ধান্ত নিল, ফ্যাশন হাউসের স্টাফদের দাওয়াত করে খাওয়াবে ও। শুধু স্টাফদের নয়, সাহসে কুলালে মাসুদুর রহমানকেও বলবে। সিদ্ধান্তটা এনাম আহমেদকে বলেও ফেলল।

দুপুরের পর সেদিন ওর মাথায় একের পর এক নতুন নতুন আইডিয়া গজাতে শুরু করল। যে কোম্পানী তার কর্মচারীদের এত সুখে রাখার চেষ্টা করে, সে কোম্পানীর জন্যে আরও অনেক কিছু করা দরকার ওর, এ-ধরনের একটা অনুভূতি সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে বাধ্য করল ওকে। সেদিনই টেলিফোন করে মাসুদুর রহমান অন্তরাকে জানালেন, 'তোমার ডিজাইনটা পাস হয়ে গেছে।'

অবাক হল অন্তরা। 'পাস হয়ে গেছে…বুঝলাম না। আমি তো জানি দু'হপ্তা আগেই আপনি ওটা অনুমোদন করেছেন।'

'হ্যাঁ, আমি করেছি। কিন্তু আমার বাবা অনুমোদন না করলে ওটা বাতিল হয়ে যেত। কুয়ালালামপুরে ওঁর ব্যবসাতে যেমন আমার শেয়ার আছে, তেমনি ঢাকায় আমার ব্যবসাতেও ওঁর শেয়ার আছে—ফিফটি-ফিফটি। কাজেই ওঁর অনুমোদন ছাড়া কোন কাজ হবার নয়। তোমার জন্যে, আমাদের সবার জন্যে সুখবর, ডিজাইনটা উনি পছন্দ করেছেন।'

'ধ-ধন্যবাদ, আমি খুশি।'

'ডিজাইনটা দেখে বাবা আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। বললেন, ডিজাইনটা যে করেছে, চেষ্টা করে দেখো তাকে গেঁথে তুলে আনতে পারো কিনা—ভদ্রলোক দুর্লভ প্রতিভা, কুয়ালা ফ্যাশনে তাঁকে আমাদের দরকার। আমি যখন বললাম, যে ডিজাইনার একটা মেয়ে, এবং তিনি ইতিমধ্যেই কুয়ালা ফ্যাশনে যোগ দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন, উনি গম্ভীর সুরে বললেন, ভেরি গুড।'

আবেগে চোখে পানি এসে গেল অন্তরার, কি বলবে ভেবে পেল না।

'কি, লাইনে আছ?' অবশেষে জানতে চাইলেন মাসুদুর রহমান।

'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করে বলল অন্তরা। 'আপনার বাবাকে বলবেন, আমার কাজ তাঁর পছন্দ হওয়ায় তাঁকেও আমি ধন্যবাদ জানিয়েছি।'

'উনি যদি টেলিফোন করেন আবার, তখন বলব। এমনিতে আমি তাঁর সাথে যোগাযোগ করি না।' বলে হঠাৎ যোগাযোগ কেটে দিলেন মাসুদুর রহমান। ভুরু কুঁচকে হাতের রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকল অন্তরা। ঠিক কি ঘটল, বুঝতে পারেনি ও।

এক হপ্তা পরের ঘটনা, রীনা চৌধুরীর সঙ্গে অফিসের গাড়িতে চড়ে মতিঝিল থেকে গুলশানে ফিরছে অন্তরা। আজ প্রায় আট দিন মাসুদুর রহমানের সঙ্গে দেখা হয়নি ওর। আজও মতিঝিলের অফিসে তাঁকে

পাওয়া যায়নি, কি কাজে যেন বেরিয়ে গেছেন, ফিরতে কয়েক ঘন্টা দেরি হবে। গুলশানে কাজ রয়েছে ওদের, তাই অপেক্ষা না করে ফিরে যাচ্ছে ওরা।

মনে মনে ভাবছে অন্তরা, এত ব্যস্ত থাকেন মাসুদুর রহমান, আর্কিটেকচারের কাজ সেরে ডিজাইনের কাজ করার সময় পান কিনা। খানিক ইতস্তত করে প্রশ্নটা উচ্চারণ করে ফেলল ও।

হেসে উঠে রীনা চৌধুরী বললেন, 'বস্ একাই একশো। সময় পেলেই ডিজাইন করতে বসে যান। প্রায়ই তো বলেন, ফ্যাশন ডিজাইন তাঁর রক্তের সাথে মিশে আছে। উনি অবশ্য ইউরোপিয়ান ফ্যাশনে এক্সপার্ট। কুয়ালা ফ্যাশন হাউসের বেশিরভাগ ডিজাইন করেন আমাদের চীফ ডিজাইনার।' তাঁর চেহারায় ব্যঙ্গ ও কৌতুক মেশানো এক চিলতে হাসি ফুটতে দেখে বিস্মিত হল অন্তরা।

'চীফ ডিজাইনার?' জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ, উম্মে জোহরা। সাংঘাতিক এক মহিলা!'

মাসুদুর রহমানের পেশাগত জীবনে নারীরা সংখ্যায় খুব বেশি, হঠাৎ করে উপলব্ধি করল অন্তরা। ব্যক্তিগত জীবনে? প্রশ্নটার উত্তর জানা নেই ওর। ভয়ে জানার কোন ইচ্ছেও জাগছে না।

কিন্তু ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন আর সেটাকে ফিরিয়ে আনার কোন উপায় নেই। অন্তরা আর কিছু জানতে না চাইলে কি হবে, রীনা চৌধুরী বলে চলেছেন, 'শুনবে, আমাদের চীফ ডিজাইনার উম্মে জোহরাকে কেন সাংঘাতিক মেয়ে বলছি?'

'কেন?' শুকনো গলায় বলল অন্তরা।

'তোমার মত, শিক্ষানবিস হিসেবে ঢোকে সে। তোমার মতই কম বয়েসে। মাত্র কয়েক বছরে তার নাম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। বলা হয়, আধুনিক ফ্যাশন জগতে সেরা তিনজন ডিজাইনারের একজন সে।' হাসিমুখে কথাগুলো বললেও, রীনা চৌধরীর গলার স্বরে কর্কশ

একটা ভাব রয়েছে, অন্তরার কানে ধরা পড়ল। 'শুধু প্রতিভা নয়, রীতিমত ডানা-কাটা পরীও বটে। নিজের চোখেই দেখতে পাবে। শিগ্‌গির ঢাকায় আসছে সে।'

ঢাকায় আসছে? আমাদের ফ্যাশন হাউস দেখতে।

হেসে উঠলেন রীনা চৌধুরী। 'ফ্যাশন হাউস দেখতে? আরে না! ওটা স্রেফ অজুহাত, আসল কারণ অন্য। আসছে মনের মানুষকে দেখতে।'

'মনের মানুষকে দেখতে?' রীনা চৌধুরীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল অন্তরা। ওর হার্টবিট বেড়ে গেছে, ঘামতে শুরু করেছে হাতের তালু। 'মানে? ভদ্রমহিলা তাহলে বিবাহিতা নন?'

'বিবাহিতা নয়, তবে হতে চায়। বলতে পারো, বিয়ে করার জন্যে পাগল। কিন্তু আমাদের বস্ কিভাবে যেন ঠেকিয়ে রেখেছেন। অবশ্য খুব বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন বলে মনে হয় না।' নিজের মুখের সামনে হাত ঝাপটা দিয়ে বিরক্তিসূচক একটা আওয়াজ করলেন রীনা চৌধুরী। 'কে কি ভাবল তাতে আমার কিছু আসে যায় না, আমি সত্যি কথাই বলব। এই মেয়েকে বিয়ে করলে বসের জীবন হেল হয়ে যাবে।'

ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেল অন্তরার হাত-পা। মনের গভীর থেকে কে যেন ওকে আগেই সাবধান হবার পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু কান দেয়নি ও। মন আসলে আগে থেকে সব বুঝতে পারে, মনের আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হল। এরকম কোটিপতি, সুদর্শন কোন পুরুষের জীবনে একটা মেয়ে না থেকেই পারে না, না থাকাটাই অস্বাভাবিক।

মনের গভীর থেকে আবার কে যেন ফিসফিস করল, 'তোমার কোন আশা নেই, অন্তরা। মিছে স্বপ্ন দেখো না।'

'কেন? জীবনটা হেল হয়ে যাবে কেন?' নিচু গলায় জানতে চাইল ও। খানিকটা অপরাধী লাগছে নিজেকে, কারণ এর নামই তো পরচর্চা।

তা-ও আবার এমন একজন সম্পর্কে, যাকে কোনদিন দেখেনি অন্তরা।

'কেন মানে?' ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন রীনা চৌধুরী। 'বস্ আর উম্মে জোহরা সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির মানুষ, তাই। বস্‌কে তো দেখেছই, ওর মত ঠাণ্ডা মানুষ হয়? কিন্তু আমাদের চীফ ডিজাইনার সাংঘাতিক দেমাকি। সব কিছুতে কর্তৃত্ব ফলানো চাই তার। গর্বে মাটিতে পা পড়ে না। এ-ধরনের একটা মেয়েকে বিয়ে করলে কেউ সুখী হতে পারে না।'

নিজের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক চলছে অন্তরার। এতদিন জানতে না, এখন তো জানলে। সব দিক থেকে আদর্শ একজন পুরুষ মাসুদুর রহমান, তাঁর তো প্রিয় বান্ধবী থাকতেই পারে। ফ্যাশন জগতের দুর্লভ সুন্দরীরা তাঁকে আপন করে পেতে চাইবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তুমি তাদের সামনে কিছুই নও, তোমার স্থান আরও অনেক নিচে।

'উনি কি মালয়েশিয়ান?'

'হ্যাঁ, কিন্তু দেখে মনে হবে ইউরোপিয়ান,' বললেন রীনা চৌধুরী। গুলশানে পৌঁছে গেছে গাড়ি, সামনে ওদের ফ্যাশন হাউস। 'সাবধান, অন্তরা। ভারি খুঁতখুঁতে, রগচটা আর ঈর্ষাকাতর মেয়ে সে। ঢাকায় যে-ক'দিন থাকবে, খুব সাবধান!'

ভয় নয়, রাগও নয়, অদ্ভুত একটা ঈর্ষাবোধ করল অন্তরা। জোর করে হাসল ও। বলল, 'চেষ্টা করব তাঁর সামনে যাতে পড়তে না হয়। আপনি তো কয়েকবারই কুয়ালালামপুরে গেছেন, আপনার সাথে তাঁর সম্পর্ক কি রকম? আপনার সাথে বা উমা ওয়াঙচুকের সাথে?' ওদের দু'জনের সঙ্গেই, বিশেষ করে ওয়াঙচুকের সঙ্গে, খুব ভাল সম্পর্ক অন্তরার। উম্মে জোহরার সঙ্গে কি রকম আচরণ করা দরকার, ওয়াঙচুক সম্ভবত পরামর্শ দিতে পারবে ওকে।

'ওয়াঙচুকের সাথে এক সময় খুব ভাল সম্পর্ক ছিল জোহরার, কিন্তু বস্ ওকে ঢাকায় ডেকে নেয়ার পর থেকে খেপে আছে সে। বস্ ওকে

ডিনারে নিয়ে যান, জন্মদিনে প্রেজেন্টেশন দেন, এ-সবই তার রাগের কারণ।'

'কিন্তু উনি তো শুনেছি সবার জন্যেই এ-সব করেন, জন্মদিনে প্রত্যেক কর্মচারীকেই কিছু না কিছু উপহার দেন। আর বিদেশী ডেলিগেট এলে ডিনার খেতে হয়, সেখানে তো ওয়াঙচুককে থাকতেই হবে—ব্যবসায়িক আলাপ করার জন্যে।'

'এ-সব যুক্তি জোহরা শুনতে রাজি নয়। বসের সাথে কোন মেয়ে শুধু যদি হেসে কথাও বলে, সহ্য করতে পারে না সে। সাধে কি বলছি, এ মেয়েকে বিয়ে করলে জীবনটা নরক হয়ে যাবে বসের!'

'তাহলে তো আপনাকেও সে সহ্য করতে পারে না,' মন্তব্য করল অন্তরা।

'না, আমার ওপর তার কোন রাগ নেই,' হেসে উঠে বললেন রীনা চৌধুরী, নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। 'আমি বিবাহিতা, কাজেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী নই। তবে একটা আশার কথা কি জানো, ওয়াঙচুক ভারি বুদ্ধিমতি মেয়ে। বসের ওপর সাংঘাতিক খেয়াল রাখে সে। আমাকে বলেছে, সম্ভাব্য সব চেষ্টা করবে, জোহরার মত দেমাকি একটা মেয়ের খপ্পরে বস্ যাতে না পড়েন। দেখা যাক, কতটুকু কি করতে পারে সে।'

এ আবার কি শুনছে অন্তরা! তারমানে জোহরা একা নয়, তারও প্রতিদ্বন্দ্বী আছে?

আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস হল না অন্তরার। অফিসে ঢোকার পর আলাপ করার আর সুযোগও পাওয়া গেল না। সবাই ওরা কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। মন খারাপ, কিন্তু সেটা কাউকে বুঝতে দিল না অন্তরা। মাঝে মধ্যেই কান্না পাচ্ছে ওর, কিন্তু এ-ধরনের কান্না নিশব্দে ও একাই কাঁদতে হয়, জানে সে। ব্যর্থ প্রেমের গ্লানি যার ব্যর্থতা তাকে একাই বহন করতে হয়, মর্মবেদনাটুকু কাউকে বোঝানো যায় না,

ভাগও দেয়া যায় না।

আরও একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে জাহিদ হাসানকে নিয়ে। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সে, মাসুদুর রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাঁর পেশা ও ব্যবসার হিসাব-পত্র দেখে। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়েস, সুদর্শনই বলা যায়, আচার-ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত। পুরানো ঢাকায় থাকে সে, অফিসে আসা-যাওয়ার পথে প্রতিদিন লিফট দেয় অন্তরাকে। প্রথম মাসে হাতে পয়সা ছিল না, এই ব্যবস্থায় মনে মনে খুশিই হয়েছিল ও। তাছাড়া, গাড়িটা অফিসের, মন খুঁত খুঁত না করার সেটাও একটা কারণ। কিন্তু এক মাসের ওপর প্রতিদিন পাশাপাশি বসে আসা-যাওয়া করায় ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার একটা সুযোগ পেয়েছে জাহিদ, অন্তরার কাছ থেকে কোন রকম প্রশ্রয় না পেলেও। গাড়িতে বসে সাধারণত ওরা গল্প-উপন্যাস, বেইলী রোডের নাটক, আর্ট-ফিল্ম, লেটেস্ট ফ্যাশন ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ করে। এই সব আলাপের মধ্যেই, হঠাৎ একদিন, জাহিদ ওকে স্পষ্ট করেই জানিয়েছে, অন্তরার সান্নিধ্য তার অত্যন্ত ভাল লাগে, ওর সঙ্গ নাকি তাকে 'অনুপ্রেরণা' যোগায়। সেদিনই সাবধান হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে অন্তরা। কিন্তু মুশকিল হল, জাহিদ ছেলেটা অত্যন্ত ভদ্র এবং নিরীহ প্রকৃতির। সে যে ভুল করছে, এটা কিভাবে তাকে বলবে বুঝতে পারছে না অন্তরা। প্রত্যাখ্যান করলে আঘাত পাবে জাহিদ, সেটাই অন্তরার দ্বিধাবোধ করার কারণ। এই দ্বিধাই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। ওর মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে আরও খানিকটা সাহস সঞ্চয় করেছে জাহিদ, প্রস্তাব দিয়েছে একদিন বিকেলে ওর সঙ্গে বেড়াতে যেতে হবে।

অফিসের গাড়িতে আসা-যাওয়া করা এক কথা, একা তার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। শুধু জাহিদের সঙ্গে কেন, কোন পুরুষের সঙ্গেই তা যাবে না অন্তরা। অন্তত সে পুরুষকে নিয়ে তার

মনে যদি না কোন স্বপ্ন থাকে। জাহিদকে নিয়ে ওর মনে কোন স্বপ্ন নেই, এটুকু পরিষ্কার জানা আছে অন্তরার।

সাবধান হওয়া দরকার, কিন্তু পারা যাচ্ছে না। অন্তরা জানে, তার এই দ্বিধা বিপদ ডেকে আনতে পারে। গত ক'দিন ধরে গাড়িতে ওর খুব কাছাকাছি বসছে জাহিদ, কথা বলার সময় সারাক্ষণ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ব্যাপারটা অনুভব করতে পারে অন্তরা, ওর প্রেমে পড়ে যাচ্ছে জাহিদ। এ এক সাংঘাতিক বিব্রতকর পরিস্থিতি। কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান দেখতে পাচ্ছে না অন্তরা। এ-ব্যাপারে নিজের সঙ্গে ঝগড়াও করেছে ও। নিজের দ্বিধাটাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। জাহিদকে আঘাত দিতে চায় না, এটা কি সত্যি ওর মিথ্যে অজুহাত? ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে জাহিদ, এটা আসলে উপভোগ করে ও?

এ-সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে অন্তরা। সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুযোগ পেলেই এ-ব্যাপারে নিজের বক্তব্য জানিয়ে দেবে জাহিদকে। যদি সে আঘাত পায় পাবে, ওর কিছুই করার নেই।

তিন দিন পরের ঘটনা। বিকেল পাঁচটায় ফ্যাশন হাউসে এলেন মাসুদুর রহমান, পাশে এক মহিলা।

দিনটা খুব ব্যস্ততার ভেতর কেটেছে অন্তরার। উমা ওয়াঙচুকের অনুরোধে কয়েকটা মডেল এজেন্সিতে ফোন করতে হয়েছে, একদল রিপোর্টারকে ডেকে কুয়ালা ফ্যাশন হাউসের শুভ উদ্বোধন ও হাউসের প্রথম ফ্যাশন শো সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিতে হয়েছে, এজেন্সি থেকে মডেলরা আসার পর কথা বলতে হয়েছে তাদের সঙ্গে, দ্রুত শেষ করতে হয়েছে দশ-বারোটা ডিজাইন। এত কিছুর পর, হঠাৎ একটা আমেরিকান বায়ার্স হাউস থেকে দু'জন প্রতিনিধি এসে পড়ায় তাদের সঙ্গে ঝাড়া দু'ঘন্টা কথা বলতে হয়েছে ওকে। সে-সময় অফিসে কেউ

ছিল না, কঠিন বিপদেই পড়ে গিয়েছিল অন্তরা। অর্ডার গ্রহণ সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই নেই ওর, তবে মূল্য-তালিকা ও শর্তাবলী ছাপা আছে কাগজে, সেগুলো দেখে পাল্টা একটা প্রস্তাব দিয়ে তাদেরকে বিদায় করেছে ও। যদি দরে পোষায়, তিন কোটি টাকার রেডিমেড গার্মেন্টসের অর্ডার দেবে তারা। কাজটা যে কুয়ালা ফ্যাশন হাউস পাবে না, এ-ব্যাপারে এনাম আহমেদ নিশ্চিত। অন্তরার মুখে সব কথা শুনে ম্লান হেসে বলেছেন, তিনি উপস্থিত থাকলে আরও অনেক কম রেট বলতেন। তবে এ-ও বলেছেন যে দোষটা অন্তরার নয়। অন্তরা বলেছে, রেট কমিয়ে বলার সুযোগ পাওয়া যাবে, কারণ ভদ্রলোকরা আজই কোন এক সময় যোগাযোগ করবেন বলে জানিয়ে গেছেন।

গোল পাকানো প্ল্যান, কাগজ-পত্র, রঙের কৌটা ইত্যাদির মাঝখানে বসে আছে অন্তরা, গ্যালারির মাথায়, সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে দেখল ওদেরকে। মাসুদুর রহমানের সঙ্গে স্কার্ট পরা মহিলাকে দেখেই বুঝতে পারল, এ নিশ্চয়ই উম্মে জোহরা। পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছেন মাসুদুর রহমান, মেয়েটিকে চারদিক ভাল করে দেখার সুযোগ দেয়ার জন্যে ধীর পায়ে হাঁটছেন তিনি। সিঁড়ির মাথায় উঠে এসে মুখ তুলে গ্যালারির দিকে তাকাল মেয়েটি, সরাসরি অন্তরার দিকে।

গ্যালারির নিচে একটা টেবিলে বসে রয়েছেন রীনা চৌধুরী ও এনাম আহমেদ, বসকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তাঁরা। এগিয়ে গেল জোহরা, ডান হাতটা পালা করে দু'জনের দিকে বাড়িয়ে দিল। করমর্দনের সময় হাসলেন তাঁরা। গ্যালারির মাথা থেকে অন্তরা লক্ষ করল, বিদেশী মেয়েটির হাসি শুধু ঠোঁটেই ফুটল, নীলচে চোখ দুটোকে ছুঁলো না। এই সময় রীনা চৌধুরীর টেবিলে ফোনটা বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুললেন মাসুদুর রহমান।

জোহরা মাঝারি আকৃতির, গায়ে অতিরিক্ত চর্বি না থাকলেও বেশ চওড়া তার কাঠামো। মাথায় মরচে ধরা লোহার মত চুল, খুব সুন্দর

করে কাটা। নাকটা তত খাড়া বলা যাবে না, তবে পান পাতা আকৃতির অবয়ব খুবই সুন্দর। সবচেয়ে সুন্দর তার গায়ের রঙ, উজ্জ্বল মাখনের মত, কোথাও কোন দাগ বা ভাঁজ নেই।

মেয়েটির বয়স আন্দাজ করা কঠিন, ভাবল অন্তরা। ত্রিশের কাছাকাছি, বেশি হওয়াও বিচিত্র নয়। এটা আন্দাজ করছে অন্তরা, রীনা চৌধুরী আর উমা ওয়াঙচুকের কাছ থেকে মেয়েটি সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য পাওয়ায়। খুব কম বয়েসে কুয়ালা ফ্যাশন হাউসে যোগ দিলেও, ফ্যাশন জগতে নাম করতে দীর্ঘ অনেক বছর সময় লাগার কথা। অন্তরা শুনেছে, প্রায় এক যুগ ধরে মাসুদুর রহমানের পিছু লেগে আছে সে, ডিজাইনার হিসেবে নাম করার পর থেকে। উমা ওয়াঙচুকের ভাষ্য হল, 'আমার ধারণা, বস্ সম্ভবত ওকে বিয়ে করার ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না।'

বিয়ে তো পরের কথা, ভাবল অন্তরা, প্রশ্ন হল পরস্পরকে ওরা ভালবাসে কিনা। নাকি ব্যাপারটা একতরফা?

নার্ভাস বা অস্থির হয়ে লাভ নেই, নিজেকে প্রবোধ দিল অন্তরা, সময় মত সবই জানা যাবে।

গ্যালারির মাথায় একা রয়েছে ও, সবার কাছ থেকে দূরে। দোতলায় উঠেই ওর ওপর চোখ পড়েছে উম্মে জোহরার। এনাম আহমেদ ও রীনা চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করার ফাঁকে মাঝে মধ্যেই মুখ তুলে ওর দিকে তাকাচ্ছে মেয়েটি। ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন মাসুদুর রহমান, তিনিও দু'একবার তাকাচ্ছেন ওর দিকে।

নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল অন্তরা। রীনা চৌধুরীর জেদে আজই প্রথম জিনসের প্যান্ট ও শার্ট পরে অফিসে এসেছে ও, সেজন্যে সারাটা দিন সাংঘাতিক আড়ষ্ট বোধ করছে। হাঁটাহাঁটি করতে খারা লাগবে, তাই কাজ ছেড়ে আজ বড় একটা ওঠেনি। আজই যে জোহরা আসছে, জানত না ও। জানলে নিজেকে ফিটফাট রাখার চেষ্টা করত।

শার্টের ভাঁজ নষ্ট হয়ে গেছে। রঙ লেগেছে হাতে, এলোমেলো হয়ে আছে চুল। অন্যান্য অফিস স্টাফদের সামনে ব্যাপারটা হয়ত দৃষ্টিকটু নয়, কিন্তু উম্মে জোহরার সামনে নিজেকে এভাবে পরিবেশন করতে সঙ্কোচবোধ করছে অন্তরা। আড়ষ্ট ভাবটুকু এখুনি ওর কাটিয়ে ওঠা দরকার, তা না হলে মেয়েটির ব্যক্তিত্বের কাছে ওর ব্যক্তিত্ব মার খেয়ে যাবে, উপলব্ধি করল ও। বারবার ওর দিকে যেভাবে তাকাচ্ছে, যে-কোন মুহূর্তে আঙুল নেড়ে ওকে ডাকতে পারে মেয়েটি। সিনিয়র স্টাফ হিসেবে সে অধিকার তার আছে। অন্তরার জন্যে বুদ্ধিমতীর কাজ হবে কেউ ডাকার আগে নিজে থেকে নেমে যাওয়া।

আত্মসম্মান হারাতে হতে পারে, এই ভয়টা সাহস যোগাল অন্তরাকে। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল ও, ভুলে থাকার চেষ্টা করল আঁটসাঁট জিনস পরে আছে। নিচের দিকে চোখ রেখে গ্যালারি থেকে নেমে আসছে। নামার পর ওদের দিকে এগোচ্ছে, দেখল অবাক হয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে সবাই। ফোন নামিয়ে রেখে এবার মাসুদুর রহমানও ওর দিকে ফিরলেন।

'এখনও কেউ পরিচয় করিয়ে না দিলেও, আমার ধারণা আপনি আমাদের চীফ ডিজাইনার, উম্মে জোহরা,' মেয়েটির দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজিতে বলল অন্তরা। 'গ্লাড টু মিট ইউ।'

কিন্তু অন্তরার হাতটা না ধরে মাসুদুর রহমানের দিকে তাকাল উম্মে জোহরা ।

মাসুদুর রহমান বললেন, 'তোমাকে আমি শাকিলা সামাদ, মানে অন্তরার কথা আগেই বলেছি—আওয়ার ইয়ং আর্ট গ্রাজুয়েট।' তারপরও অন্তরার হাতটা ধরল না মেয়েটি, তার চোখ বলছে, 'হ্যাঁ, বলেছ, কিন্তু আমি প্রভাবিত হইনি, ডার্লিং।' তবে মুখে কিছুই বলল না সে।

মেয়েটি হ্যাণ্ডশেক না করায় অপমানিত বোধ করল অন্তরা, তবে

চেহারায় হাসিখুশি ভাবটা জোর করে ধরে রাখল। ও অপমানবোধ করেছে দেখলে খুশি হবে মেয়েটি, সেটি অন্তরা হতে দিচ্ছে না। 'শক্ত পাথর,' মনে মনে বলল ও, মাসুদুর রহমান ও উম্মে জোহরা দাঁড়িয়ে থাকলেও, রীনা চৌধুরীর পাশের খালি চেয়ারটায় বসে পড়ল ও, বসার পর একটা পা অপর পায়ের ওপর তুলে হেলান দিল চেয়ারে। লক্ষ করল, মাসুদুর রহমান ও উম্মে জোহরা, দু'জনেই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ভদ্রলোকের চোখ দুটোয় কৌতুক না কি যেন ঝিক করে উঠল বলে মনে হল ওর।

ওদের সঙ্গে যোগ দিল উমা ওয়াঙচুক। কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরবে সে, ফেরার আগে বস্ উপস্থিত থাকায় তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছে। অন্তরার সঙ্গে চোখাচোখি হল তার, হতেই মিষ্টি করে হাসল উমা ওয়াঙচুক। তার হাসির মধ্যে নিঃশব্দে অনেক কথা বলা হয়ে গেল। বোঝা গেল, উম্মে জোহরাকে পছন্দ করে না সে। উত্তরে অন্তরাও হাসল, তবে খুবই সামান্য, বুঝিয়ে দিল সে কোন পক্ষ অবলম্বন করছে না, ওদের প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ার কোন ইচ্ছে ওর নেই। অন্তরা জানে, এটা আসলে ওর একটা ভান। কারণ ওর মন যতই সাবধান করুক, ইতিমধ্যেই জড়িয়ে পড়েছে ও, জড়িয়ে পড়েছে প্রথম যেদিন মাসুদুর রহমানকে দেখেছে সেদিনই। ভদ্রলোক ওর কাছাকাছি থাকলে প্রতিটি মুহূর্ত রোমাঞ্চ ও পুলক অনুভব করে ও, এমন অপূর্ব এক মধুর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সময় কাটে যে ওর একুশ বছরের জীবনে এ-ধরনের অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। এবং আপাতত এটুকুই ওর প্রত্যাশা, তাঁর কাছাকাছি থাকা।

এনাম আহমেদ ও রীনা চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করছে উম্মে জোহরা, দোতলায় উঠে এল জাহিদ হাসান। ভাব দেখে বোঝা গেল, চীফ ডিজাইনারের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে তার। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল জাহিদ, তাকাল অন্তরার দিকে, নিচু গলায় বলল, 'কাজ

শেষ তোমার? চল তাহলে, পৌঁছে দিই তোমাকে। এক সেকেণ্ড, আমার কামরা থেকে ব্যাগটা নিয়ে আসি,' বলে দ্রুত পা চালিয়ে নিজের কামরার দিকে চলে গেল সে।

ইতিমধ্যে সিঁড়ির দিকে এগোতে শুরু করেছে উম্মে জোহরা, তার পাশে রয়েছেন মাসুদুর রহমান। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে, সরাসরি অন্তরার দিকে তাকালেন তিনি। হাঁটার গতি কমালেন, যেন চাইছেন সিঁড়ি বেয়ে আগে নেমে যাক জোহরা। রীনা চৌধুরী ও এনাম আহমেদও ওদেরকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির ধাপে পা রাখলেন।

চেয়ার ছাড়ল অন্তরা, সিঁড়ির দিকে এগোল। হাঁটার গতি বাড়িয়ে মাসুদুর রহমানের পাশে চলে এল ও। ওর হাতটা এক বার ধরেই ছেড়ে দিলেন মাসুদুর রহমান। বললেন, 'আজ আমরা ডিনার খেতে যাচ্ছি, অন্তরা। তোমার জরুরী কোন কাজ নেই তো?'

লাফিয়ে উঠল অন্তরার হৃৎপিণ্ড, যেন বিদ্রোহ করতে চায়। আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল মন। অকস্মাৎ এ-ধরনের আমন্ত্রণ কল্পনা করা যায় না। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল, কিন্তু আমি প্রস্তুত নই! মহাশয় আমাকে ডিনার খেতে নিয়ে যাবেন, এ আমার জীবনের স্মরণীয় একটা ঘটনা হয়ে থাকবে। ধন্য হয়ে যাব আমি, সার্থক হবে জীবনের একটা স্বপ্ন। কিন্তু আমাকে তৈরি হবার সময়টুকুও দেয়া হবে না, এ কেমন কথা? হাতে রঙ লেগে রয়েছে, ভাঁজ পড়ে গেছে কাপড়ে...একটু সাজার সময়ও পাব না? ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে কোথাও যদি বেরোবার সুযোগ হয় কোনদিন, ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে মনের মত করে সাজব আমি। তোমার সুদর্শন চেহারার পাশে নিজেকে মানানসই করে তোলার জন্যে রোগা-পাতলা এই মেয়েটি প্রাণপণ চেষ্টা করবে। তুমি যে এভাবে হঠাৎ...। কত কথাই ভাবছে অন্তরা, কিন্তু একটা শব্দও

উচ্চারণ করতে পারল না, পটলচেরা চোখ তুলে শুধু তাকিয়ে থাকল মাসুদুর রহমানের দিকে। ইতিমধ্যে জাহিদ হাসানকে ডেকে আনার জন্যে লোক পাঠানো হয়েছে। খানিকটা স্বস্তিবোধ করল অন্তরা, ডিনারে ওরাও ওকে সঙ্গ দেবে। বিশেষ করে রীনা চৌধুরীর বিশেষ নজর আছে ওর ওপর, অভিজাত রেস্তোরাঁয় ডিনার খেতে গিয়ে অনভিজ্ঞতার কারণে ও কোন ভুল করতে যাচ্ছে দেখলে অবশ্যই তিনি ওকে সতর্ক করে দেবেন। ওয়াঙচুকের সঙ্গেও ওর সম্পর্ক ভাল, হোক সে উম্মে জোহরার প্রতিদ্বন্দ্বী; সে-ও সাহায্য করবে ওকে। অত ভয় পাবার কিছুই নেই, নিজেকে অভয় দিল অন্তরা। ওদের সাহায্য পেলে এই কঠিন পরীক্ষায় পাস করে যাব আমি।

গলাটা শুকিয়ে গেছে, খসখসে স্বরে বলল, 'না, জরুরী কোন কাজ নেই। ধন্যবাদ।'

সিঁড়ি বেয়ে ইতিমধ্যে উঠে এসেছে চীফ ডিজাইনার উম্মে জোহরা। 'ডিনার, মাসুদ?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল সে। 'এই বিকেল বেলা? কিন্তু আমি তো জানতাম, তুমি আর আমি শপিং করতে বেরুচ্ছি।'

'শপিঙের জন্যে আমাকে তোমার দরকার নেই,' মাসুদুর রহমান হাসিমুখে বললেন। 'ড্রাইভারকে বললেই সে নিয়ে যাবে। সেটা পরে হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু ডিনারটায় তোমার উপস্থিত থাকা একান্ত দরকার।'

'আমার উপস্থিত থাকা দরকার, কেন?' কৌতূহলী হয়ে উঠল উম্মে জোহরা। 'হঠাৎ সবাইকে নিয়ে ডিনার, উপলক্ষ্যটা কি বলো তো?'

'হ্যাঁ, উপলক্ষ্যটা কি বলুন তো?' জানতে চাইলেন রীনা চৌধুরীও. তাঁর পাশে দাঁড়ানো ম্যানেজার এনাম আহমেদের চোখেও কৌতূহল।

'উপলক্ষ্য তো একটা আছেই,' মুচকি হেসে বললেন মাসুদুর রহমান। 'যদিও, সেটা প্রকাশ করার সময় এখনও হয়নি। বিরাট একটা সুসংবাদ। সব কথা কাল বিকেলের মধ্যে জানতে পারবে সবাই,

তার আগে পর্যন্ত ব্যাপারটা আমি গোপন রাখতে চাই। তবে সুসংবাদ যখন, আমরা যদি আগাম উৎসব করি, তাতে কোন দোষ নেই। অন্তরার দিকে তাকালেন তিনি। 'দৌড় দাও, অন্তরা, এক ছুটে মুখ-হাত ধুয়ে এসো। দু'মিনিটের মধ্যে সারতে পারবে তো?'

'এক মিনিটের বেশি লাগবে না,' বলল অন্তরা, পাশ কাটাল চীফ ডিজাইনারকে। মেয়েটি ওকে গ্রাহ্যই করছে না। খবর পেয়ে ইতিমধ্যে নিজের কামরা থেকে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে এসেছে জাহিদ। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল অন্তরা, পিছন থেকে ওর চুল ধরে সামান্য টান দিতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হল বেচারা। ওর পথ রোধ করে দাঁড়ালেন এনাম আহমেদ, পথ ছাড়ার সময় চোখ মটকালেন, তারপর কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে মাথাটা নোয়ালেন সামান্য। আর উমা ওয়াঙচুক প্রকাশ্যেই দাঁত বের করে হাসছে। রীনা চৌধুরী ওর হাতটা ধরে একটু চাপ দিলেন। সবাই কেন এত খুশি, নীরবে কেন ওকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, বুঝতে অসুবিধে হল না অন্তরার। বসের তরফ থেকে এ এক দুর্লভ সম্মান দেয়া হচ্ছে ওকে, সেটাই কারণ। সাধারণত অধস্তন কর্মচারীদের ডিনারে ডাকা হয় না। অন্তরার মত নতুন অধস্তন কর্মচারী আরও অনেক আছে, কিন্তু একা শুধু অন্তরাকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মাসুদুর রহমান। সবাই ওরা অন্তরার শুভানুধ্যায়ী, ওর এই সম্মানে সবাই তাই আনন্দিত। ঘটনাটা উম্মে জোহরার উপস্থিতিতে ঘটছে বলে অনেকের আরও বেশি ভাল লাগছে। তার সঙ্গে শপিঙে যাবার প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়ে অন্তরাকে নিয়ে ডিনার খেতে যাচ্ছেন বস্, এক অর্থে এটা তার একটা বিরাট পরাজয়।

অন্তরা জানতে পারল না, ওর প্রতি বন্ধু ও কলিগদের হৃদ্যতায় ভরপুর আচরণ লক্ষ করে মাসুদুর রহমানের ভুরু জোড়া সামান্য কুঁচকে উঠেছে। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচ তলায় নেমে যাচ্ছে ও, বাথরুমে ঢুকবে।

অন্তরা নেমে যেতেই প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠল উম্মে জোহরা। 'এ তোমার ভারি অন্যায়, মাসুদ। বলছ সুখবর, অথচ আমাদেরকে জানাচ্ছ না সেটা কি। উৎসব বা ডিনারে থাকতে আপত্তি নেই আমার, কিন্তু উপলক্ষ্যটা আমাকে জানতে হবে।' তার চেহারায় একটা জেদ ফুটে উঠল।

'একান্তই যদি শুনতে চাও, এখন বলা যায়।' হাসলেন মাসুদুর রহমান। 'অন্তরার সামনে বলতে চাইনি, কারণ ছেলেমানুষ তো, ভারি লজ্জা পাবে। তাছাড়া, ব্যাপারটা এখনও ফাইন্যাল হয়নি।'

'হেঁয়ালি রাখো তো!' হাসিমুখেই বলল উম্মে জোহরা, তবে গলার ঝাঁঝটুকু গোপন থাকল না। 'যা বলবার পরিষ্কার করে বলো।'

'তিন কোটি টাকার একটা অর্ডার পেয়েছি আমরা,' বললেন মাসুদুর রহমান। 'একটা আমেরিকান বায়ার্স হাউস থেকে ডেলিগেট এসেছিল, অফিসে তখন অন্তরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। ওর সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হয়ে গেছে তারা। মজার ব্যাপার হল, মূল্য-তালিকা দেখে যে রেট দিয়েছে অন্তরা, প্রতি পীসে পাঁচ ডলার কম পেলেও প্রচুর লাভ করব আমরা। ডেলিগেটরা টেলিফোন করেছিল আমাকে, বলল যে রেট তাদেরকে দেয়া হয়েছে তারচেয়ে এক ডলার করে কম হলে কালই তারা অর্ডার দেবে। খানিকক্ষণ দর কষাকষির ভান করে রাজি হয়ে গেলাম আমি।'

'মাই গুডনেস!' চেপে রাখা দম ছেড়ে ফিসফিস করলেন এনাম আহমেদ।

'কি বলছেন!' চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল রীনা চৌধুরীর। অন্তরা তিন কোটি টাকার অর্ডার সংগ্রহ করেছে? এ তো অসাধ্যসাধন! ও তো এ-ব্যাপারে কিছুই বোঝে না।'

'আমি তো বুঝতে পারছি না এর মধ্যে আশ্চর্য হবার কি আছে,' বলল উম্মে জোহরা। 'তার জায়গায় অন্য কেউ থাকলেও অর্ডারটা

পেতাম আমরা।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা,' বললেন মাসুদুর রহমান। 'তবে প্রতি পীসে অতিরিক্ত চার ডলার করে লাভ হত না। কারণ, আমরা কেউ থাকলে ডেলিগেটদের বলতাম না যে মূল্য তালিকায় যে দর লেখা আছে তাই দিতে হবে, এক পয়সা কমানো যাবে না। অন্তরা ওদেরকে এমন একটা ধারণা দিয়েছে, এক ডলারের বেশি কমাতে বলতে সাহস পাচ্ছে না ওরা। এখানেই ওর কৃতিত্ব।'

চোখে-মুখে পানি ছিটাচ্ছে অন্তরা, বাথরুমের দরজায় নক হল। 'দরজা খোলো, অন্তরা, আমি উমা।'

দরজা খুলে অবাক হয়ে গেল অন্তরা। উমা ওয়াঙচুক হাসি মুখে ভেতরে ঢুকল, তার হাতে ছোট্ট একটা মেকআপ বক্স। 'আজ প্রথম বসের সাথে বাইরে খেতে যাচ্ছ তুমি, কোন অবস্থাতেই তোমাকে সাধারণ একটা মেয়ে দেখানো চলবে না। পেছন ফেরো, তোমার চুলগুলো আঁচড়ে দিই। কতটুকু মেকআপ নেবে, সেটা অবশ্য তোমার ব্যাপার।'

কৃতজ্ঞতায় কয়েক সেকেণ্ড কথাই বলতে পারল না অন্তরা। তারপর ওয়াঙচুককে জড়িয়ে ধরে বিড় বিড় করে বলল, 'থ্যাঙ্কস। ইউ আর আ ডার্লিং, উমা।'

এক মিনিট নয়, সাত মিনিট লাগল ওদের। বিল্ডিং থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে অন্তরা দেখল, সবাইকে গাড়িতে তুলে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন মাসুদুর রহমান, তাঁকে সাহায্য করছে জাহিদ হাসান।

মাসুদুর রহমানের গাড়িতে, সামনের সীটে বসল উম্মে জোহরা। কুয়ালা ফ্যাশন হাউসের সবচেয়ে দামী স্টাফ সে, ওখানে বসার অধিকার তার আছে। উমা ওয়াঙচুক বসল পিছনের সীটে। অন্তরার হাত ধরে অপর গাড়ির দিকে এগোল জাহিদ হাসান, ওটায় আগেই

উঠে বসেছেন রীনা চৌধুরী। ড্রাইভারের পাশে বসল জাহিদ। এনাম আহমেদ বসেছেন প্রথম গাড়িতে, ওয়াঙচুকের পাশে। প্রথম গাড়িটা মাসুদুর রহমান নিজেই চালাবেন।

রওনা হল ওরা। মাসুদুর রহমানের গাড়িকে অনুসরণ করছে দ্বিতীয় গাড়ির ড্রাইভার। একটু পর ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল জাহিদ, অন্তরাকে বলল, 'এই মেয়ে, তুমি এত চুপচাপ কেন? আমাদের মধ্যে একমাত্র খুকী বলতে গেলে তুমি—দুষ্টামি না করো, অন্তত বকবক করো। তোমার কথা শুনতে ভালই লাগবে আমাদের।'

'খবরদার!' ঠোঁট মুড়ে হাসল অন্তরা। 'আমাকে খুকী বলবেন না!' লক্ষ করল, ওর দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন রীনা চৌধুরী।

হঠাৎ ওর দিকে ঝুঁকে একটা হাত বাড়ালেন ভদ্রমহিলা, অন্তরার কপাল থেকে কয়েক গাছি চুল সরিয়ে দিলেন। মৃদু হেসে নিজের হাতব্যাগটা খুললেন তিনি, ভেতর থেকে ছোট্ট একটা সেন্টের শিশি বের করে স্প্রে করলেন ওর শার্টে। আনন্দের একটা দোলা লাগল অন্তরার মনে, রীনা চৌধুরীর কাঁধে একটা হাত রেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। কেন কে জানে, চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল ওর। ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছে, যে আদর ও স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে ও, ওরা সবাই যেন তা পূরণ করে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করেছে।

গুলশানেই, লেকের ধারে, একটা চাইনীজ রেস্তোরাঁয় ঢুকল ওরা। রওনা হবার আগে এনাম আহমেদ টেলিফোন করেছিলেন, দোতলা রেস্তোরাঁর এক কোণে বড় একটা টেবিল রিজার্ভ রাখা হয়েছে ওদের জন্যে। এটা শুধু রেস্তোরাঁ নয়, রেস্টুরেন্ট অ্যাণ্ড বার। রীনা চৌধুরী আগেই অন্তরাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ডিনারের আগে ওদের মধ্যে অন্তত দু'জন মদ্য পান করবে বলে তাঁর ধারণা। মদ মানে বিয়ার হওয়ারই সম্ভাবনা

বেশি, তবে উম্মে জোহারা শ্যাম্পেন বা হুইস্কিও খেতে পারে। তার মত, ওয়াঙচুকও মদ্য পানে অভ্যস্ত। তবে, রেস্তোরাঁয় ও-সব পরিবেশন করা হয় না, খেতে হলে সংলগ্ন বার-এ গিয়ে বসতে হবে।

সাদা উর্দি পরা দু'জন যুবক অর্ডার নিতে এল। কেউ কিছু বলার আগে উম্মে জোহরা অন্তরার দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, 'উপলক্ষ্যটা যখন তোমার সাফল্য, অর্ডারটা তুমিই দাও, অন্তরা।'

এতই বিস্মিত হল অন্তরা যে হাঁ করে বোকার মত তাকিয়ে থাকল মেয়েটির দিকে। একাধিক কারণে অবাক হয়ে গেছে বেচারি। প্রথম কারণ, ওর ধারণা ছিল না এত ভাল বাঙলা বলতে পারে উম্মে জোহরা। হাসিমুখে, যেচে পড়ে, ওর সঙ্গে কথা বলছে সে, এটা আরেকটা বিস্ময়। আরেকটা ব্যাপার ধাঁধার মত লাগছে। উপলক্ষ্যটা ওর সাফল্য—মানে?

একজন ওয়েটার ওর সামনে মেনু বুকটা মেলে ধরল। সেদিকে না তাকিয়ে অন্তরা বলল, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার সাফল্য মানে?'

'বোঝা গেল, সুখবরটা গোপন রাখতে চাইছে না উম্মে,' মাসুদুর রহমান হাসিমুখে বললেন। 'অন্তরা, আমেরিকান ডেলিগেটদের কথা মনে আছে তোমার, আজ দুপুরে যাদের সাথে কথা বলেছ তুমি? ওরা আমাকে ফোন করেছিল, প্রায় তোমার দেয়া রেটেই কাল ওরা অর্ডার দিতে আসছে।'

'দূর, তা কি করে হয়!' হেসে উঠল অন্তরা। ওর প্রথম প্রতিক্রিয়া, এ সম্ভব নয়। তারপর ভাবল, কিন্তু মাসুদুর রহমান এত লোকের সামনে ওর সঙ্গে ঠাট্টা করতে পারেন না। ধীরে ধীরে ওর মুখের হাসি নিভে গেল। চোখ মিট মিট করে সবার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল দ্রুত একবার। সবাই ওর দিকে প্রশংসা ও গর্বের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল হঠাৎ, শরীরটা এত হালকা হয়ে গেল যেন ওর কোন ওজন

নেই। 'স-সত্যি?' বিড় বিড় করে জানতে চাইল ও। 'আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন না?'

'না, ঠাট্টা নয়,' ওর পাশ থেকে বলল জাহিদ হাসান। 'নিজেকে তুমি এরইমধ্যে কুয়ালা ফ্যাশন হাউসের একটা অ্যাসেট হিসেবে প্রমাণিত করেছ, অন্তরা।'

'আর সেজন্যেই এই ডিনার খাওয়া?' আবার জিজ্ঞেস করল অন্তরা, এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না ব্যাপারটা।

'হ্যাঁ, সেজন্যেই, বললেন মাসুদুর রহমান। 'তোমার সাফল্যে আমরা সবাই গর্বিত, অন্তরা।'

'সেক্ষেত্রে,' প্রায় চিৎকার করে বলল অন্তরা, 'ডিনারটা আমি আপনাদের খাওয়াব!'

সবাই মাথা নাড়লেও উম্মে জোহরা সমর্থন করল অন্তরাকে। সে বলল, 'তিন কোটি টাকার অর্ডার। অন্তরা মোটা টাকা কমিশন পাবে। কাজেই ওরই খরচ করা উচিত।'

সিদ্ধান্ত পাল্টে এনাম আহমেদ বললেন, 'কথাটায় অবশ্য যুক্তি আছে।'

'প্রস্তাবটা যখন অফিস দিয়েছে, আজ অফিসই বিলটা দিক, বললেন মাসুদুর রহমান। 'অন্তরা পরে একদিন না হয়...।'

'আজ আমরা অন্তরার অতিথি,' তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বলল জোহরা। 'দেখা যাক, কি খাওয়ায় আমাদেরকে ও।' ওয়েটারদের দিকে তাকাল সে। 'অর্ডার পরে দেয়া হবে, তার আগে বারে বসব আমরা। অন্তরা, তোমাকেও কিন্তু আমাদের সাথে পান করতে হবে।'

হঠাৎ করে আড়ষ্ট হয়ে উঠল পরিবেশ। জোহরা ছাড়া বাকি সবার মুখ থেকে মুছে গেল হাসি। জোহরা ও অন্তরা, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। জোহরা মনে মনে ভাবছে, আনাড়ি কচি খুকি, দেখা যাক তোমার দৌড়! আর অন্তরা ভাবছে, আমার কাছে টাকা নেই, বিল

দেব কোত্থেকে?

'কি হল, কিছু বলছ না যে তুমি?' নিস্তব্ধতা ভাঙল জোহরা।

অন্তরার জন্যে এ ব্যাপারটা কোন সমস্যাই নয়। বলল, 'ও-সব আমি কখনও খাইনি। ভবিষ্যতে কখনও খাব, সেরকম কোন সম্ভাবনাও নেই। তবে আপনারা খেতে পারেন, আমার কোন আপত্তি নেই। আপনারা খান, আমি দেখব।'

'মেহমানদারি করতে এসে তুমি কিন্তু আমাদেরকে অপমান করতে পারো না,' বলল জোহরা। 'আমরা তো খাবই, তোমাকেও আমাদের সাথে খেতে হবে। সমাজে উঠতে চাইবে, অথচ সমাজের রীতি পালন করবে না, এ হয় না।'

হেসে ফেলল অন্তরা। 'আমার ধারণা, এটা আসলে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। মদ খেলে সমাজে ওঠা হয়, কে বলল আপনাকে? সমাজে আমার যেখানে অবস্থান, আমি মদ খেলে ওঠা হবে না, নেমে যাওয়া যাবে।'

ওয়াঙচুক বলল, 'আমি ছ'মাস হল বাংলাদেশে আছি, আজ পর্যন্ত কোন বাঙালী মেয়েকে এমনকি বিয়ার খেতেও দেখিনি। তাছাড়া, ইসলাম ধর্মে মদ্যপান একেবারে নিষেধ। বাঙালী পুরুষরা কেউ কেউ খায় বটে, কিন্তু তা-ও খুব কম। আমার তো মনে হয়, এ-ব্যাপারে জোর করার কোন অবকাশ নেই।'

'ধর্মের প্রতি আমার কোন অশ্রদ্ধা নেই, তবে আমি এমন একটা সমাজে মানুষ হয়েছি যেখানে ধর্মীয় অনুশাসন গুরুত্বের সাথে মেনে চলা হয় না,' বলল উম্মে জোহরা। 'মদ খেয়ে আমি কখনও মাতলামি করি না, মদ আমার শরীর ও মনের জন্যে উপকারী, টনিক হিসেবে কাজ করে। আমি কর্মে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি সততায়, ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিই না। আমার জানামতে ঈশ্বর আছেন কিনা, সেটা এখনও বিতর্কিত। কে কি ভেবে কোনটা নিষেধ করে গেছেন, সেটা

মেনে চলতে আমি বাধ্য নই। আরেকটা কথা, ধর্মীয় গোঁড়ামিকে যারা প্রশ্রয় দেয়, আমি তাদের সাথে ওঠা-বসা করব, এ ভাবতে পারি না।'

হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন মাসুদুর রহমান। 'ভাবতে পারো না অথচ আমার সাথে তো দিব্যি বারো বছর ধরে ওঠা-বসা করছ। কিন্তু আমি তো মদ খাই না।'

অদ্ভুত একটা আনন্দ অনুভব করল অন্তরা, জোহরাকে বলল, 'ধর্মীয় সব অনুশাসন যে আমিও মেনে চলি, তা নয়। বিশ্লেষণ করলে হয়ত দেখা যাবে, ধর্মীয় ব্যাপারে আমার ও আপনার দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় সমান। আমিও ধর্মীয় গোঁড়ামিকে ঘৃণা করি। ও-সব আমি ধর্মীয় কারণে খাই না, তা নয়। খাই না, কারণ ও-সব আমার কোন দরকার নেই। আমার শরীর ও মন এমনিতেই যথেষ্ট সুস্থ-সবল, টনিকের কোন প্রয়োজন হয় না। শরীর ভাল রাখার জন্যে যথেষ্ট শাক-সব্জি খাই, আর মন ভাল রাখার জন্যে মানুষকে ভালবাসি।'

'কী সাংঘাতিক!' টেবিলে একটা চাপড় দিলেন এনাম আহমেদ। 'অন্তরা, আমার ধারণা ছিল না, এত সুন্দর কথা বলতে পারো তুমি।'

মাসুদুর রহমান যে অস্বস্তি বোধ করছেন, সেটা তাঁর চেহারা দেখেই বোঝা গেল। তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে জোহরার দিকে ফিরল অন্তরা। 'আপনি কিছু মনে করবেন না, ভাই। আমি খাই না, সেজন্যেই খাব না, এর মধ্যে আপনাকে বা আর কাউকে অপমান করতে চাওয়ার কোন ব্যাপার নেই। আমি যদি কোন বেয়াদপি করে থাকি, সেজন্যে ক্ষমাপ্রার্থী।'

'না, ঠিক আছে, আমারই ভুল হয়েছে,' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল উষ্মে জোহরা। 'আমরা তাহলে বারে গিয়ে বসি, কেমন? এসো, মাসুদ।'

মাসুদুর রহমান চেয়ার ছাড়তে যাচ্ছে দেখে ভয় পেয়ে গেল অন্তরা, তাড়াতাড়ি বলল, 'মাসুদ ভাই, আপনি একটু আমার সাথে বসবেন?

আপনাকে একটা কথা বলার ছিল আমার।'

রীনা চৌধুরী জাহিদ হাসানের হাত ধরে টান দিলেন, উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। 'চলো হে জাহিদ, আমরাও চীফ ডিজাইনারের সাথে যাই। ও-সব খাওয়ার সাহস তো জীবনে হবে না, অন্তত কাউকে খেতে দেখে সাধটা মেটাই।' ওদের দেখাদেখি এনাম আহমেদও উঠলেন।

ওয়াংচুক চেয়ার ছেড়ে বলল, 'আমি কিন্তু শুধু বিয়ার খাব। কিম বলে দিয়েছে, দেশের বাইরে থাকলে বিয়ার ছাড়া আর কিছু খাওয়া আমার জন্যে সম্পূর্ণ নিষেধ।'

ওরা রেস্তোরাঁ ছেড়ে বেরিয়ে গেল, অন্তরা বুঝল মাসুদুর রহমানের সঙ্গে ওকে একা থাকার সুযোগ দেয়াটাই উদ্দেশ্য। হঠাৎ করে মাসুদুর রহমান বললেন, 'জোহরার কথায় বা আচরণে তুমি কিছু মনে কোরো না, অন্তরা।'

'না, কেন, মনে করার কি আছে,' হাসি মুখে বলল অন্তরা। 'মাত্র পরিচয় হল, ওঁকে বুঝতে আরও কিছু সময় লাগবে আমার।'

'খুবই বুদ্ধিমতী, তবে কঠিন পাত্রী,' ধীরে ধীরে বললেন তিনি। 'ভেরি ক্রিয়েটিভ। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।' মাথার চুলে আঙুল চালালেন তিনি, চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। একটু যেন অস্থির দেখাচ্ছে ভদ্রলোককে। 'জোহরা···জোহরা আমাকে···আমার ওপর খুব দুর্বল।'

'সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়,' ভাবল অন্তরা, তবে কথা না বলে চুপচাপ শুনে যাচ্ছে। 'মহিলা আপনাকে ভালবাসে, আপনি জানেন না? জানেন হয়ত, তবে বোধহয় এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন।'

'ও আমার মেয়েকে মানুষ করেছে,' বললেন মাসুদুর রহমান, শুনে দম বন্ধ হয়ে এল অন্তরার। রেস্তোরাঁর ম্লান, সাদা আলোয় রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর চেহারা। চোখ দুটো বিশাল দেখাল, দৃষ্টিতে

কেমন যেন একটা ভয়। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলেন ভদ্রলোক, ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা ফটো। ফটোটা অন্তরার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। ফটোটা হাতে নিয়ে দেখল অন্তরা। বেশ কয়েক বছর আগের ছবি, উম্মে জোহরার বয়স আরও কম ছিল তখন। তার কোলে পাঁচ-ছ'মাসের একটা বাচ্চা দেখা যাচ্ছে। জোহরার দু'পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাসুদুর রহমান ও একজন ভদ্রমহিলা। ভদ্রমহিলার সঙ্গে জোহরার চেহারার অদ্ভুত মিল।

ফটোর দিকে তাকিয়ে আছে অন্তরা, জানে না জোরে চেপে ধরায় বাঁকা হয়ে গেছে সেটা। মাসুদুর রহমান ওর হাত থেকে ফটোটা নেয়ার পর ব্যাপারটা বুঝতে পারল ও, বিড়বিড় করে ক্ষমা চাইল। মাসুদুর রহমান উত্তরে বললেন, কিছু এসে যায় না, ফটোটার আরও অনেক কপি আছে তাঁর কাছে।

'আপনার মেয়ে,' ফিসফিস করে বলল অন্তরা। 'আপনি তাহলে বিবাহিত?' নিজের গলাই চিনতে পারছে না ও, এতই বেসুরো। 'কত বয়েস ওর?' মাসুদুর রহমান জানালেন, আট।

মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকল অন্তরা, ভয় হচ্ছে ওর চোখে যে বেদনা ফুটে উঠেছে সেটা না ভদ্রলোক দেখে ফেলেন। মনে মনে ভাবছে ও, ওঁকে আমার অবিবাহিত বলে ধরে নেয়া উচিত হয়নি। বিরাট ধনী পরিবারের একমাত্র সন্তান, ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়েসে বিয়ে না হবে কেন!

'ফাতেমা-তুন-সাহারা, আমার স্ত্রী, মারা গেছেন আজ আট বছর,' মৃদু, শান্ত গলায় বললেন মাসুদুর রহমান। 'বাচ্চা প্রসব করার সময়। আমার মেয়ের নাম বৃষ্টি। ওর মা মারা যাবার পর দু'বছর ওকে জোহরাই দেখাশোনা করেছে। কুয়ালালামপুরে দাদুর কাছে থাকে ও।'

মুখ ফিরিয়ে তাকাল অন্তরা, ভদ্রলোকের চেহারায় বিষাদ দেখে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল ওর।

'তুমি আমার সম্পর্কে খুব কম জানো, অন্তরা,' আবার বললেন মাসুদুর রহমান। 'যদি শোনার আগ্রহ থাকে, তোমাকে আমি সব কথা বলতে চাই।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল অন্তরা। ওর মাথাটা যেন ঘুরছে। একটা ঝড় উঠেছে মনের ভেতর, সেটাকে কিভাবে শান্ত করতে হবে জানা নেই ওর। কথা না বলে মাথাটা শুধু ঝাঁকাল ও।

পাঁচ

'জেসমিন চৌধুরী, আমার মা সম্পর্কে, বেশি কিছু তুমি জানো না,' বললেন মাসুদুর রহমান।

মাথা নাড়ল অন্তরা।

'আমার বাবা, খালেদুর রহমান, হংকং-এ একটা শিপিং কোম্পানীতে কেরানির চাকরি করতেন। পরে তিনি ব্রোকার হিসেবে ব্যবসা শুরু করেন। সফল ব্যবসায়ী তিনি, প্রচুর আয় করার পর নিজেই একদিন শিপিং ব্যবসা শুরু করেন। ওখানে, হংকঙেই, আমার মার সাথে তাঁর পরিচয় হয়। আমার মার বয়েস ছিল তখন একুশ, বাবার চল্লিশ। প্রথম দেখাতেই প্রেম, ওঁদের ব্যাপারটা সেরকমই ছিল বলে শুনেছি। প্রথম দেখাতেই প্রেম এবং সর্বনাশ।'

'সর্বনাশ? এ-কথা কেন বলছেন?'

ওয়েটারকে ডেকে দু'কাপ কফি দিতে বললেন মাসুদুর রহমান। ওয়েটার চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তিনি, তারপর

বললেন, 'বিয়ের পর কুয়ালালামপুরে চলে যান ওঁরা। মার ধারণা ছিল, মালয়েশিয়ায় তার ফ্যাশন ও গার্মেন্টিস ব্যবসার ভবিষ্যৎ ভাল। সেটা সত্যি বলেও প্রমাণিত হয়। অগত্যা বাবাও তাঁর ব্যবসার হেড অফিস হংকং থেকে কুয়ালালামপুরে সরিয়ে আনেন। অবশ্য, দেশেও নিয়মিত আসা-যাওয়া ছিল ওঁদের। প্রতি দু'বছরে একবার এসে মাস কয়েক বেড়িয়ে যেতেন। বিয়ের তৃতীয় বছরে নারায়ণগঞ্জে আমার জন্ম।

'আমার মা প্যারিসে লেখাপড়া করেছে, ডিজাইনের ওপর ডিগ্রীও নিয়েছেন ওখান থেকে। তার বাবা, আমার নানু, নারায়ণগঞ্জে থাকতেন। ভদ্রলোক এডভোকেট ছিলেন। নানু মারা গেছেন আজ অনেক বছর হল, তবে বাড়িটা এখনও আছে।'

'কিন্তু আপনি সর্বনাশের কথা কি যেন বলছিলেন...।'

'বয়েসটা...বয়েসের পার্থক্যটাই ছিল অশান্তির আসল কারণ,' বললেন মাসুদুর রহমান। 'অন্যান্য কারণও ছিল। আমার বাবা অত্যন্ত রগচটা টাইপের মানুষ। স্ত্রীকে তিনি ঘরনী হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন, ব্যস্ত ফ্যাশন ডিজাইনার বা গার্মেন্টিস ব্যবসায়ী হিসেবে নয়। মার একটা আলাদা জগত ছিল, সে জগতের সাথে বাবা নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে পারেননি। বয়স কম বলে, মার বন্ধু-বান্ধবরাও ছিল তরুণ। তাদের সাথে স্ত্রীর মেলামেশাটা আমার বাবা ভাল চোখে দেখতেন না।'

'ও।'

'দিনে দিনে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে পরস্পরকে ওরা আর সহ্যই করতে পারতেন না।'

'তারমানে কি বিয়েটা ভেঙে গিয়েছিল?' জানতে চাইল অন্তরা।

'না, তা ভাঙেনি। তবে দেখা-সাক্ষাৎ প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। মা বেশিরভাগ সময় ইউরোপে থাকত। ইতিমধ্যে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে সারা দুনিয়ায়। বাবা তাঁর নিজের শিপিং ব্যবসা নিয়ে আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর এই ব্যাপারটা আজও আমি ঠিক বুঝি

না। টাকার কোন অভাব নেই, অথচ ব্যবসা ছাড়া আর কিছু বুঝতে চান না। এমন ব্যবসা পাগল মানুষ দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। ব্যবসা বোঝেন, স্বার্থ বোঝেন, টাকা বোঝেন। অত্যন্ত রগচটা মানুষ।'

'ওঁনার তো অনেক বয়েস হয়েছে, তাই না? দেশে ফিরে না এসে কুয়ালালামপুরে থাকছেন কেন?'

'বয়স হয়নি মানে? সত্তর। তবে এখনও তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করেন। তিনি যে কি রকম ব্যস্ত থাকেন, না দেখলে বিশ্বাস করবে না তুমি। রোগা-পাতলা মানুষ, কিন্তু শরীরে ক্লান্তি বা রোগ বলে কিছু নেই। দেশে ফিরছেন না, কারণ তাঁর সমস্ত ব্যবসায়িক স্বার্থ মালয়েশিয়ায়। ফিরছেন না বটে, তবে মাঝে মধ্যেই ঘুরে যাচ্ছেন। ওখানে তাঁকে থাকতে হচ্ছে, কারণ শিপিং ব্যবসা তো আছেই, হাউস অভ জেসমিন কুয়ালাও তো রয়েছে। কুয়ালা গার্মেন্টসে কাজ করছে প্রায় বারো হাজার কর্মচারী, বিরাট ব্যবসা, তিনি বাংলাদেশে চলে এলে দেখাশোনা করবে কে?'

'কেন, আপনি?'

ক্ষীণ হেসে মাসুদুর রহমান বললেন, 'তাঁর সাথে আমার বিরোধটা এখানেও। কুয়ালালামপুরের ফ্যাশন ও গার্মেন্টস ব্যবসা ঢাকায় তুলে আনতে চেয়েছিলাম আমি। বাবার কথা হল, কুয়ালালামপুরে যেটা আছে সেটা থাক, ঢাকায় কিছু করতে হলে আমাকে নতুন করে শুরু করতে হবে। মোট কথা, স্থায়ীভাবে ঢাকায় আসার কোন ইচ্ছে বাবার নেই।'

'উনি হয়ত ঠিকই ভাবছেন,' বলল অন্তরা। 'নিজের বা স্ত্রীর হাতে গড়া বিরাট সব ব্যবসা ছেড়েছুড়ে চলে আসবেন, তাঁর তো ভাল লাগার কথা নয়।'

'হ্যাঁ, যুক্তির কোন অভাব নেই বাবার। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি

একজন ব্যবসায়ী। যেখানে টাকা আছে, সেখানে তিনিও আছেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শুধু টাকা কামাতে হবে, আর সব কিছু বাদ দিয়ে, এর কোন মানে হয়? একটা সময় তো মানুষকে ছুটি নিতে হবে, নাকি? এই বয়েসেও তিনি যদি আঠারো ঘন্টা পরিশ্রম করেন...,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে গেলেন মাসুদুর রহমান।

একদৃষ্টে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে থাকল অন্তরা। হঠাৎ উপলব্ধি করল ও, মাসুদুর রহমান তাঁর বাবাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। কিন্তু তাঁর বাবা, খালেদুর রহমান কি তা জানেন? ওঁরা দু'জন কি মন খুলে কখনও আলাপ করেছেন? চেষ্টা করেছেন পরস্পরকে বোঝার, পরস্পরের কাছাকাছি হওয়ার? মনে হয় না। বাপ ও ছেলের মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, কেউ কাউকে ভাল করে বোঝেন না।

মাসুদুর রহমান জানালেন, কুয়ালালামপুরে তাঁর একটা আলাদা বাড়ি আছে। বাবার কাছ থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করেন তিনি। কারণটা কি, জানতে চাইল অন্তরা। মাসুদুর রহমান বললেন, সাংসারিক ব্যাপারে অকারণে কর্তৃত্ব ফলাবার একটা প্রবণতা আছে তাঁর বাবার, যেটা তিনি একদম পছন্দ করেন না। তাঁর ধারণা, বাবার এই স্বভাবের জন্যেই মার সঙ্গে বনিবনা হয়নি।

'কিন্তু আপনার মেয়ে? তাকে আপনি ঢাকায় আনেননি কেন?'

'প্রথম দিকে বৃষ্টি ছিল ওর আন্টি জোহরার ন্যাওটা,' হেসে উঠে বললেন মাসুদুর রহমান। 'ফটো আর নাম দেখে নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ, উম্মে জোহরা আমার শ্যালিকা?' মাথা ঝাঁকাল অন্তরা। 'বড় হবার পর জোহরাকে কাছে পায়নি বৃষ্টি, আমাকেও পায়নি, ফলে এখন সে তার দাদুর ন্যাওটা। দাদুকে ছাড়া কোথাও যাবে না, এমনকি আমার কাছেও আসতে রাজি নয়।'

'মাসুদ ভাই, বৃষ্টির কোন ফটো আছে আপনার কাছে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, এই তো।' মানিব্যাগ খুলে আবার একটা ফটো বের

করে অন্তরার হাতে ধরিয়ে দিলেন মাসুদুর রহমান।

একহারা গড়নের সুন্দর একটা মেয়ে। মা বিদেশী হলেও, চেহারাটা বৃষ্টি বাপেরই পেয়েছে। ক্যামেরার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে সে, মুখে হাসি নেই। মুখটা গোল। 'আপনার মেয়ে খুব সুন্দরী হবে,' বলল ও। 'ওর দাদু নিশ্চয়ই খুব ভালবাসেন ওকে?'

'সাংঘাতিক। ব্যবসা আর বৃষ্টি, এই দুটোই তাঁর জীবনের অবলম্বন।' মাসুদুর রহমানের মুখে গম্ভীর হাসি। 'নিজের কথা অনেক হয়েছে, এবার তোমার কথা বলো অন্তরা। তখন তুমি বললে, কি যেন কথা আছে আমার সাথে?'

'হ্যাঁ,' মনে পড়ে যাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে উঠল অন্তরা। 'মাসুদ ভাই, আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে হবে। ঝোঁকের মাথায় বলে ফেললাম, ডিনারটা আমি খাওয়াব, কিন্তু আমার টাকা তো সব বাড়িতে!'

'সেটা কোন সমস্যা নয়, তোমার হয়ে বিলটা আমিই দিয়ে দেব।'

'না, তা দিতে পারবেন না,' জেদ ধরল অন্তরা। 'বিল আপনিই দেবেন, তবে টাকাটা আমি ধার নিচ্ছি আপনার কাছে। আরেকটা কথা, মাসুদ ভাই...,' হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে উঠল অন্তরা, প্রসঙ্গটা কিভাবে তুলবে ভেবে পেল না।

'হ্যাঁ, বলো।'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে অন্তরা বলল, 'স্রেফ কৌতূহল। আপনি কিছু মনে করবেন না তো?'

'আরে না, কি জানতে চাও বলে ফেলো।'

'উমা বলছিল, কিম তাকে বিয়ার ছাড়া আর কিছু খেতে নিষেধ করেছে। কিম কে?'

'কিম ওর স্বামী, আবার কে। কেন, হঠাৎ এ-প্রশ্ন করছ কেন?'

'না, এমনি!' অন্তরা ভাবছে, উমা ওয়াঙচুক তাহলে বিবাহিতা? মালয়েশিয়ায় তার স্বামী আছে। বিবাহিতা একটা মেয়ে তো উম্মে

জোহরার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। তারমানে, ভুল বুঝেছিল ও। তারমানে দাঁড়াল, জোহরা একাই, তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। না, আছে, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী অবশ্যই আছে। ও নিজে।

আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে অন্তরার মনে। মাসুদুর রহমান কি তাঁর শ্যালিকাকে ভালবাসেন? কিন্তু এ এমন একটা প্রশ্ন, সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায় না। এমনকি আভাসে জিজ্ঞেস করাও কঠিন। আসলে এ-ধরনের প্রশ্নর উত্তর পেতে হলে চোখ-কান খোলা রেখে অপেক্ষা করতে হবে ওকে। সময় হল সবচেয়ে বড় উত্তরদাতা। সময়ের উত্তরে কোন ভুল থাকে না। নির্মম হলেও, সঠিক উত্তরই দেয়। কোন ভাবে যদি প্রশ্নটা করতে পারে অন্তরা, মাসুদুর রহমানের কাছ থেকে একটা উত্তর হয়ত এখুনি আদায় করে নিতে পারে ও। কিন্তু সেটা যে সঠিক উত্তর হবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই অপেক্ষা করাই ভাল।

'তোমার আর কোন প্রশ্ন নেই?' ওর দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন মাসুদুর রহমান।

তাঁর দৃষ্টি লক্ষ করে লজ্জা পেল অন্তরা। 'ন্‌না!' কোনরকমে বলল ও। চোখ দুটো নামিয়ে নিল।

'তোমাকে আরও সপ্রতিভ দেখালে আমার ভাল লাগবে,' নরম সুরে, নিচু গলায় বললেন মাসুদুর রহমান। 'জানি, সেজন্যে আরও কিছু সময় দরকার তোমার। তবু একটা কথা আমি ভুলে থাকতে পারি না তোমার বয়েস অত্যন্ত কম। তোমার সাথে আমার বৃষ্টির বয়েসের পার্থক্য মাত্র বারো কি তেরো বছরের। আমি বলতে চাইছি, তোমার সাথে আমার বয়েসের পার্থক্য এত বেশি যে সব সময় একটা সঙ্কোচের মধ্যে থাকি। সব সময় ভয় হয়, তুমি আমাকে না আবার ভুল বোঝো।' কথাগুলো থেমে থেমে বলছেন। 'সেজন্যে তোমার সাথে কথা বলার সময় খুব সাবধানে থাকি আমি, কারণ আমি চাই না তুমি কোন আঘাত

পাও।'

ঘামতে শুরু করেছে অন্তরা। সেই যে চোখ নামিয়েছে, তা আর তুলতে পারছে না। কথা বলার সময় মনে হল, আওয়াজ বেরুবে না। ও বলল, 'আপনার কোন কথাই আমাকে আঘাত করবে না,' অনুভব করল, গলাটা কাঁপছে। 'আপনার সাবধান হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।'

অন্তরা দেখতে পেল না, শুধু অনুভব করল—ওর একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিলেন মাসুদুর রহমান, তারপর ছেড়ে দিলেন। 'ধন্যবাদ, অন্তরা। আমার সামনে থেকে যেন একটা পাঁচিল সরে গেল। আমি ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা বলছি বলে তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হচ্ছ না তো? কিংবা আমার ওপর রাগ হচ্ছে না তোমার?'

'ন্‌না!' এখনও মুখ তুলে তাকাতে পারছে না অন্তরা। 'আপনার ওপর রাগ করব, সে সাধ্য আমার নেই।' মনে মনে ভাবছে, এখনও কি তুমি বুঝতে পারছ না, মাসুদ? আর কিভাবে বলব যে আমি তোমাকে ভালবাসি?

'আমি যদি তোমাকে বিব্রত করে থাকি, ক্ষমা চাই,' মৃদু কণ্ঠে বললেন মাসুদুর রহমান। 'কিন্তু ওভাবে যদি মুখ নামিয়ে রাখো, ওরা কি ভাববে বলো তো? ওরা কিন্তু ফিরে আসছে...।'

ডিনারে বসে চুপচাপ খেল অন্তরা, কেউ কিছু জিজ্ঞেস না করলে কথা বলল না। খেতে প্রায় এক ঘন্টা সময় নিল ওরা, এই এক ঘন্টা মাসুদুর রহমানের দিকে ভাল করে একবার তাকাতেও পারল না ও। ভয় হল, তাঁর দিকে ও তাকালেই সবাই বুঝে ফেলবে, ও তাঁকে ভালবাসে।

ফেরার সময় মাসুদুর রহমান নিজের গাড়িতে তুলে নিলেন অন্তরাকে, পৌঁছে দিলেন এলিফেন্ট রোডে।

উম্মে জোহরা ও মাসুদুর রহমান, দু'জনের কাছ থেকেই হাসিমুখে

বিদায় নিল ও। নিজের ঘরে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি জানালা খুলে রাস্তায় তাকাল, দেখল বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে গাড়িটা।

বিছানায় শোয়ার পরও এক ঘন্টা জেগে থাকল অন্তরা। মাসুদুর রহমান জানেন না, আজ কত খুশি ও। খানিকটা হলেও ভদ্রলোক সম্পর্কে আজ কিছু কথা জানা গেছে। কিভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে অন্তরার। অকস্মাৎ পরিচয়, প্রায় দুর্ঘটনাই বলা যায়। প্রথম দেখাতেই অন্তরার মনে তুমুল একটা আলোড়ন উঠেছিল। ভয় লেগেছিল, ভালও লেগেছিল। ভয়টা ধীরে ধীরে দূর হয়ে গেছে, এখন তাঁর সবটাই ওর ভাল লাগে। ভদ্রলোক ওকে তাঁর জীবনের সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে চাইছেন। নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে হল অন্তরার। মাসুদুর রহমানকে মাঝেমধ্যে কেন ক্লান্ত ও বিষণ্ন লাগে কারণটা আজ বুঝতে পেরেছে ও। কিন্তু জানতে পারেনি, ওর সম্পর্কে তাঁর অনুভূতিটা কি রকম। ওর কাজ তিনি পছন্দ করেন, মূল্য দেন ওর মেধার, কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে ওর সম্পর্কে তাঁর ধারণা? উনি কি বছরের পর বছর ধরে শুধু ইতস্তত করবেন, যেমন ইতস্তত করছেন উম্মে জোহরার বেলায়?

এ-সব কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল অন্তরা।

বিলটা সেদিন মাসুদুর রহমানই দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে আর টাকাটা তিনি অন্তরার কাছ থেকে ফেরত নিতে রাজি হলেন না। অগত্যা আবার সেই আগের সিদ্ধান্তেই ফিরে যেতে হল অন্তরাকে, অফিস স্টাফদের একদিন দাওয়াত করে খাওয়াবে ও। কথাটা শুনে অত্যন্ত খুশি হল অন্তরার ভাবী, বলল, 'হোটেলে নয়, আমাদের ফ্ল্যাটেই ডাকো ওদেরকে। ঘরোয়া পরিবেশে আন্তরিকতার যে ছোঁয়া থাকে, হোটেল-রেস্তোরাঁয় তা কি পাওয়া যায়!' কথাটা মনে ধরল অন্তরার। ঠিক হল, ফ্ল্যাটের বেশিরভাগ ফার্নিচার এক রাতের জন্যে দোকানে নামিয়ে রাখা

হবে, তাহলে আর জায়গার কোন অভাব থাকবে না। সীমা ভাবী জানতে চাইল, 'ক'জনকে ডাকছ তুমি? তাদের মধ্যে হাসিখুশি জাহিদ হাসান থাকছেন তো?' তার চোখে কিসের যেন ইঙ্গিত। 'জাহিদ হাসান, যে ভদ্রলোক রোজ তোমাকে অফিসে নিয়ে যাচ্ছেন, পৌঁছে দিচ্ছেন?'

কথা বলতে বলতে চিন্তা করছে অন্তরা, 'খুব বেশি লোককে বলব না। 'মাসুদুর রহমান, আমাদের বস্। এনাম সাহেব, ম্যানেজার। আর্ট ডিপার্টমেন্টের চীফ রীনা চৌধুরী। সিনিয়র স্টাফ ও মডেল, উমা ওয়াঙচুক। হ্যাঁ, জাহিদ হাসানকেও ডাকব। বেচারা খুব ভাল মানুষ। আর কে? কণাকে বলতে হবে, আমাদের রিসেপশনিস্ট। তানি আর ইতিকেও বলব, ওরাও আমাদের স্টাফ, আমার বান্ধবী। তোমরা তো আছই। আর একজনকে না বললেই নয়—মমতা আন্টি।'

দাওয়াত পেয়ে মমতা মামুন বললেন, 'আমি কিন্তু তোমাদের সাথে খেতে বসব না। আমার কাজ হবে মেহমানদের পরিবেশন করা, আর তোমার বসের ওপর নজর রাখা। আমি দেখতে চাই, ইতিমধ্যে তোমার দিকে কতটা ঝুঁকেছেন তিনি।'

'চুপ!' ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল অন্তরা, ফিসফিস করে বলল, 'ভাবী শুনতে পাবে!'

তারপর দিন-তারিখ ঠিক হল। প্রত্যেককে হাতে লেখা একটা করে নিমন্ত্রণ-পত্র দিল অন্তরা, প্রত্যেকটা কার্ডে থাকল একটা করে কমিক ফিগার। সবাই গ্রহণ করল ওর নিমন্ত্রণ, শুধু মাসুদুর রহমান জানালেন জরুরী কাজে তাঁকে একবার মালয়েশিয়ায় যেতে হতে পারে, তবে কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে অবশ্যই যাবেন।

শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল অন্তরার। কিন্তু সবাইকে দাওয়াত করা হয়ে গেছে, এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই।

দেখতে দেখতে নির্দিষ্ট দিন এসে পড়ল। ছুটির দিন রাতে আয়োজন করা হয়েছে, কিন্তু জাহিদ হাসান ও উমা ওয়াঙচুক বিকেলেই এসে হাজির, ঘর সাজানো ও রান্নাবান্নার কাজে সাহায্য করবে। অন্তরা তার বান্ধবীদেরও আগে চলে আসতে বলেছিল, খানিক পর তারাও হাজির। ফলে ডিনার পার্টির শুরুটাই হল খুব হাসি-ঠাট্টা আর হৈ-চৈ-এর মধ্যে দিয়ে। তারপর সন্ধে থেকে শুরু হল মেহমানদের আগমন। পরিবেশ আরও কৌতুকমুখর হয়ে উঠল। সবাই এসেছে, যদিও আসল মানুষটির দেখা নেই। মাসুদুর রহমান বলেছেন বটে সময়মত ঢাকায় ফিরতে পারলে এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি এলিফেন্ট রোডে চলে আসবেন, কিন্তু রাত আটটা বাজার পরও তাঁর দেখা পাওয়া গেল না। খুবই খারাপ হয়ে আছে অন্তরার মন, যদিও কাউকে সেটা বুঝতে দিচ্ছে না ও।

আজ কালো একটা স্কার্ট পরেছে অন্তরা, গায়ে চড়িয়েছে স্লীভলেস টকটকে লাল টপ, শরীরের বাঁক ও মোচড়গুলো চেপে ধরে আছে। গায়ের ত্বকের সঙ্গে মিশে গেছে পায়ের মোজা, কৌতুক করে জাহিদ হাসান জানতে চেয়েছে, সত্যি কি কোন মোজা পরেছে ও? তার আরও একটা মন্তব্যে লজ্জা পেয়েছে অন্তরা। এর আগে কেউ ওর পা দেখেনি। কথাটা সত্যি।

সবাই খুব হাসিখুশি। ইতিমধ্যে দু'বার কফি পরিবেশন করা হয়েছে। এটা মমতা মামুনের বুদ্ধি। মেহমনদের ডিনারে বসতে দেরি করিয়ে দিতে চান তিনি। তার ধারণা, মাসুদুর রহমান আসবেনই। সবাইকে অপেক্ষা করিয়ে রাখতে চাইছেন তিনি। খুশি অন্তরার শিপুল ভাই আর সীমা ভাবীও। অনেক দিন ওদের দু'জনকে এভাবে হাসতে দেখেনি অন্তরা।

সবার অনুরোধে অন্তরা একটা গান গাইল। ওর গান শেষ হয়েছে, কানের কাছে কে যেন হাততালি দিল। ঘাড় ফেরাতেই ছলকে উঠল

বুকের রক্ত। ভাষা হারিয়ে মাসুদুর রহমানের দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল ও।

'তোমাকে তো বলেইছিলাম, আমি আসব,' বললেন তিনি। 'অন্তরা, দারুণ দেখাচ্ছে তোমাকে। স্কার্টে তোমাকে অসম্ভব মানায় তো!'

এরপর অনুষ্ঠানটা জাদু হয়ে উঠল। মেহমানদের মাঝখানে পাখির মত উড়ে বেড়াচ্ছে অন্তরা। সবার অনুরোধে আবার একবার গাইতে হল ওকে। গাইলেন সীমা ভাবী, ইতি আর উমা ওয়াংচুক। তারপর এক সময় ওরা খেতে বসল। কাঁচের গ্লাসগুলো দেখে কে যেন মন্তব্য করল, 'এগুলো তো অ্যান্টিকস!'

'এই ফ্ল্যাটের নিচে একটা দোকান আছে,' বললেন মাসুদুর রহমান। 'সেখানে অ্যান্টিকস বিক্রি হয়। ওই দোকানেই পাই আমি অন্তরাকে। কিন্তু অন্তরা বিক্রয়যোগ্য কোন পণ্য নয়। কাজেই ওকে আমি ফাঁদে ফেলে ভাগিয়ে নিয়ে যাই।' কথাটা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, তা একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না।

শুনে হেসে উঠল সবাই, একা শুধু অন্তরা নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করল। মুখে হাসি নেই, কিন্তু মনের আনন্দ চেপে রাখবে কিভাবে। উজ্জ্বল লালচে একটা আভা ফুটে থাকল ওর চেহারায়।

মাসুদুর রহমান শিপলু ভাইয়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন। অন্তরার কে আছে না আছে, নিজেই প্রশ্ন করে সব জেনে নিলেন তিনি।

হঠাৎ প্যাসেজের কোণে শুভ্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল অন্তরা। সামান্য অপ্রতিভ বোধ করল ও, চোখের ইশারায় ঘরে ঢুকতে বলল শুভ্রকে। ঘন ঘন মাথা নেড়ে পিছিয়ে গেল শুভ্র, ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল অন্তরার জন্যে ফ্ল্যাটের বাইরে অপেক্ষা করবে সে।

মাসুদুর রহমান প্যাসেজটার দিকে পিছন ফিরে রয়েছেন, অন্তরা

জানতে পারল না ওর চেহারায় হঠাৎ ফুটে ওঠা বিস্ময়ের ভাবটুকু তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। একটু পর ক্ষমা চেয়ে নিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল অন্তরা। ভুরু জোড়া সামান্য কুঁচকে উঠল মাসুদুর রহমানের, তবে তিনি তাঁর চেয়ার ছেড়ে নড়লেন না।

ফ্ল্যাটের বাইরে ছোট ল্যাণ্ডিঙে দাঁড়িয়ে, ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইল অন্তরা, 'কেন তুমি ভেতরে ঢুকবে না, শুভ্র? প্লীজ, এভাবে ফিরে যেয়ো না। ওদেরকে আমি দাওয়াত দিয়েছি, তোমাকেও দিতাম, কিন্তু তোমার ঠিকানা কেউ আমরা জানি না। সীমা ভাবী বোধহয় দেখেছেন তোমাকে, এখন যদি তুমি ভেতরে না ঢোকো, কি ভাববে বলো তো ওরা?'

কথা না বলে ঘন ঘন সিগারেটে টান দিল শুভ্র। তার গায়ের কাপড়চোপড় ময়লা, এলোমেলো হয়ে আছে চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। চেহারা দেখে মনে হল, কয়েক রাত ঘুমায়নি সে। 'না,' অবশেষে বলল সে। 'কেউ আমাকে দেখেনি। তুমি তাহলে পার্টি দিচ্ছ, কেমন?' অন্তরার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল সে।

অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না অন্তরা। 'ভেতরেই যদি না ঢুকবে, তাহলে এসেছ কেন?'

'এসেছিলাম তোমাকে একটা কথা বলতে,' ধীরে ধীরে বলল শুভ্র।

কথা বলতে এসেছে, কিন্তু বলছে না। বলতে সাহস পাচ্ছে না। তারমানে, অন্তরা ভাবল, আবার নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে। এর আগে কখনও শুভ্রকে এরকম বিধ্বস্ত দেখেনি ও। যে-কোন মুহূর্তে ওর খোঁজে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসতে পারে কেউ, তাই আবার শুভ্রকে ভেতরে ঢোকার অনুরোধ করল ও। 'কিছু একটা মুখে দাও, তোমাকে আমি শুধু মুখে ফিরে যেতে দেব না,' জেদের সুরে বলল অন্তরা।

'শোনো, অন্তরা,' ওর কথায় কান না দিয়ে বলল শুভ্র। 'তোমাকে

আমি এ-মাসে বেশি টাকা দিতে পারছি না।' মনটা খারাপ হয়ে গেল অন্তরার। টাকাটা বড় কথা নয়। শুভ্রর কথা শুনে মনে হচ্ছে, আবার কোন বিপদে পড়েছে সে। আচ্ছা, বিপদ আর সমস্যা কি কোনদিন ওর পিছু ছাড়বে না? 'ও, বলল অন্তরা। 'ঠিক আছে, সেজন্যে তোমাকে অস্থির হতে হবে না। যা পারো দাও।'

পকেট থেকে হাত বের করে অন্তরার হাতে কয়েকটা নোট গুঁজে দিল শুভ্র। বলল, 'কি কথা হয়েছে আমাদের মধ্যে, মনে আছে তো, অন্তরা?' একটা আঙুল খাড়া করল সে। 'তোমার সাথে আমার বিয়ে হবার কথা পাকা হয়ে আছে...।'

হঠাৎ দড়াম করে পুরোপুরি খুলে গেল ফ্ল্যাটের দরজা। চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল অন্তরা, দেখল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন মাসুদুর রহমান।

বিড়বিড় করে কি যেন বলল শুভ্র, সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে যাচ্ছে। তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

'বন্ধু?' ঠাণ্ডা সুরে জিজ্ঞেস করলেন মাসুদুর রহমান, এখনও দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন, অন্তরা যাতে ভেতরে ঢুকতে না পারে।

'আমার ভাই,' বলল অন্তরা। 'ফুফাত ভাই।'

'অবশ্যই,' বললেন মাসুদুর রহমান। তাঁর গলায় ব্যঙ্গের সুরটুকু চাপা থাকল না। তিনি যেন বলতে চান, ফুফাত ভাই হলে তাঁকে দেখে এভাবে পালাবে কেন?

অন্তরা ভাবল, আমার কথা উনি বিশ্বাস করছেন না। শুভ্র যে আচরণ করে গেল, বিশ্বাস করার কথাও নয়। দেখতে যত সুন্দরই হোক, তার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে আজেবাজে সন্দেহ হওয়ারই কথা। কে জানে, ওদের অনেক কথাই হয়ত তাঁর কানে গেছে। অন্তরা শুভ্রকে বলেছে, 'তোমার জন্যে অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। এত দিন কোথায় ছিলে?' শেষের দিকে শুভ্র ওকে বলেছে, 'কি কথা

হয়েছে আমাদের মধ্যে, মনে আছে তো, অন্তরা? তোমার সাথে আমার বিয়ে হবার পাকা কথা হয়ে আছে...।'

অন্তরার ইচ্ছে হল, সব কথা খুলে বলে মাসুদুর রহমানকে। কিন্তু তারপরই মনে পড়ে গেল, শুভ্রকে কথা দিয়েছে সে। আঙুল ছুঁয়ে তিন সত্যি করেছে। তাছাড়া, বললেও যে উনি ওর কথা বিশ্বাস করবেন, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়!

শুভ্রর ওপর রাগ হল অন্তরার। তার বিদঘুটে আচরণের জন্যেই তিনি ওকে সন্দেহ করছেন। কিছুই মনে করত না ও, যদি না ভদ্রলোককে ভালবাসত। তাঁকে অন্তরা ভালবাসে, অথচ ওর দিকে তিনি কটমট করে তাকিয়ে আছেন। রাগে ওর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, গরম হয়ে উঠেছে মুখ। এভাবে ওর দিকে তাকানর কোন অধিকার তাঁর নেই। কিংবা এভাবে ব্যঙ্গ করারও কোন অধিকার তিনি রাখেন না। 'আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেবেন, প্লীজ?' জানতে চাইল অন্তরা। একদৃষ্টে ওর দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর মাথা ঝাঁকালেন মাসুদুর রহমান, পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন এক পাশে।

তারপরও অনেকক্ষণ থাকল মেহমানরা। সীমা ভাবীর মনে হল, অন্তরাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সবাই বিদায় নেয়ার পর অন্তরাকে বলল, 'যাও, শুয়ে পড়ো তুমি, তোমাকে খুব কাহিল মনে হচ্ছে। যতটা পারি, পরিষ্কার করছি আমরা, বাকিটা কাল সকালে হবে।'

নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল অন্তরা।

ছয়

অন্তরার দাদু প্রায়ই একটা কথা বলেন, কাজের ভেতর ডুবে থাকো, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সেদিন রাতের দুঃখজনক ঘটনার পর কথাটাকে বেদ বাক্য হিসেবে গ্রহণ করল অন্তরা, পরদিন থেকে অফিসের কাজে নিজেকে সাংঘাতিক ব্যস্ত করে তুলল। ওর ধারণা, ওকে এভাবে কাজ করতে দেখলে ওর যে মন খারাপ সেটা কারও চোখে ধরা পড়বে না। সকাল ঠিক ন'টায় অফিসে চলে আসে ও, জাহিদ হাসান কখন গাড়ি নিয়ে ওকে তুলে নিতে আসবে সেজন্যে অপেক্ষা করে না। সারাদিন প্রয়োজন না পড়লে কারও সঙ্গে কথা বলে না, করার মত কিছু না থাকলে নিজেই তৈরি করে নেয় কাজ। পাঁচটায় ছুটি, কিন্তু রাত ন'টা দশটা পর্যন্ত অফিসে থাকে অন্তরা, জাহিদের লিফট দেয়ার প্রস্তাব ম্লান হেসে প্রত্যাখ্যান করে।

সবাই ধরে নিল, হঠাৎ অন্তরার ঘাড়ে খুব কাজ চেপেছে। কিন্তু একজনের চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না ও। সে হল উমা ওয়াঙচুক। ইতিমধ্যে সে লক্ষ করেছে; ওদের বস্ মাসুদুর রহমানকে এড়িয়ে চলছে অন্তরা। মাসুদুর রহমানও অন্তরার ব্যাপারে কেমন যেন নির্লিপ্ত হয়ে উঠেছেন। অন্তরার চেয়ে অন্তরার বান্ধবী তানির ব্যাপারে আজকাল আগ্রহী হয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক। তানিকে নিজের চেম্বারে ডেকে অনেকক্ষণ ধরে গল্প-গুজব করেন তিনি। তানি যখন বসের চেম্বারে থাকে, উমা ওয়াঙচুক লক্ষ করেছে, চেম্বারের বন্ধ দরজার দিকে কেমন

করুণ দৃষ্টিতে বারবার তাকায় অন্তরা। কিছু একটা ঘটছে, কিন্তু সেটা যে কি তা ঠিক ধরা যাচ্ছে না। কাজেই একদিন অন্তরাকে চেপে ধরল সে। নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে বসাল ওকে।

'তোমার মন ভাল নেই,' উমা ওয়াংচুক বলল অন্তরাকে। 'আমাদের অন্তরা মন খারাপ করে থাকুক এ আমি দেখতে চাই না। কি হয়েছে বলবে আমাকে?'

'কই, কি হবে।' এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল অন্তরা।

'আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। কিছু একটা অবশ্যই ঘটেছে। বলে ফেলো, অন্তরা। আমি হয়ত তোমাকে সাহায্য করতে পারব। সাহায্য করতে না পারি, পরামর্শ তো দিতে পারব।'

চুপ করে থাকল অন্তরা। কোন কারণ নেই, তবু ওর চোখ দুটো ভিজে আসছে।

ওর দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওয়াংচুক। 'ব্যাপারটা আমাদের বস্‌কে নিয়ে, তাই না?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল অন্তরা।

ওর দিকে ঝুঁকল ওয়াংচুক। 'কতদূর গড়িয়েছে ব্যাপারটা? একতরফা?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিড়বিড় করল অন্তরা। 'আমি জানি না।'

'আমি জানি,' বলল ওয়াংচুক। 'অফিসের প্রায় সবারই সন্দেহ হয়েছে। না, বোধহয় একতরফা নয়। দু'পক্ষ থেকে বেশ অনেকদূর গড়িয়েছিল ব্যাপারটা, তারপর হঠাৎ তোমাদের মধ্যে কি এমন ঘটল যে পরস্পরকে এড়িয়ে যাচ্ছ?'

চোখে পানি, চুপ করে থাকল অন্তরা।

'চুপ করে থেকো না, অন্তরা। সব কথা খুলে বলো আমাকে। তুমি যেদিন আমাদেরকে দাওয়াত করে খাওয়ালে, সেদিন থেকেই ব্যাপারটা

শুরু হয়েছে, ঠিক কিনা? কিছু একটা করেছ তুমি। কি করেছ?'

ওয়াঙচুকের নরম কথায় সব কথা বলে ফেলার তীব্র একটা ঝোঁক চাপল অন্তরার মনে। শুরুও করল, কিন্তু সব কথা বলতে পারল না। মাসুদুর রহমানকে পাগলের মত ভালবাসে ও, কথাটা কাউকে বলতে পেরে মনটা আশ্চর্য হালকা হয়ে গেল ওর। এতদিন একা যে বোঝাটা বহন করছিল, সেটা আরেকজনকে ভাগ করে দেয়ায় খানিকটা স্বস্তি ফিরে এল মনে। কিন্তু কেন মাসুদুর রহমান ওকে ভুল বুঝেছেন, সেটা ব্যাখ্যা করে বলতে পারল না। কারণ, ওয়াঙচুককে সব কথা বললে শুভ্রর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

'ওই ছেলেটা কে, প্রায় রোজই তোমার সাথে দেখা করতে আসছে?' জানতে চাইল ওয়াঙচুক।

শুভ্রর কথা জানতে চাইছে ওয়াঙচুক। হ্যাঁ, প্রায় রোজই অফিসে আসছে শুভ্র। গার্মেন্টিসের চাকরিটা হারিয়েছে সে, এখন বেকার। তার ধারণা, অন্তরা চেষ্টা করলেই কুয়ালা ফ্যাশন হাউসে তার একটা চাকরি হতে পারে। হবে, এ-কথা বলে আশ্বাস দেয়নি অন্তরা, আবার হবে না বলে এড়িয়েও যায়নি। শুভ্র যে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে, মাসুদুর রহমানও তা জানেন। কয়েকদিন তাকে তিনি দেখেছেনও। শুভ্রকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়নি অন্তরা, মাসুদুর রহমানও যেচে পড়ে তার সঙ্গে কোন কথা বলেননি।

চাকরির জন্যে রোজই তাগাদা দিচ্ছে শুভ্র। হঠাৎ ক'দিন আগে একটা সুযোগ পেয়ে সেটা কাজে লাগিয়েছে অন্তরা। আরও কয়েকজন সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ দরকার, এনাম আহমেদের মুখে এ-কথা শুনে শুভ্রকে আবেদন করতে বলেছিল অন্তরা। ছবি ও বায়ো-ডাটা সহ আবেদন পত্র জমা দিয়ে গেছে সে। কাগজগুলো মাসুদুর রহমানের চেম্বারে পাঠানর জন্যে এনাম আহমেদের হাতে পৌঁছে দিয়েছে অন্তরা। ও আশা করছে, দু'একদিনের মধ্যে মাসুদুর রহমানের সিদ্ধান্ত জানতে

পারবে ও। গার্মেন্টসে কাজ করার ভাল অভিজ্ঞতা আছে শুভ্রর, অন্তত ইন্টারভিউয়ে তাকে না ডাকার কোন কারণ নেই।

'ও আমার ফুফাত ভাই, আমরা ছোটবেলায় একসাথে মানুষ হয়েছি,' ওয়াঙচুকের প্রশ্নের উত্তরে বলল অন্তরা।

'কেন আসে, রোজ রোজ?'

'ওর একটা চাকরি দরকার।'

'কিন্তু আমি যে শুনলাম, ওর সাথে তোমার বিয়ে হবে?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইল ওয়াঙচুক। 'যদিও কথাটা আমি বিশ্বাস করিনি…।'

ছ্যাঁৎ করে উঠল অন্তরার বুক। চমকে উঠে তাকাল ওয়াঙচুকের দিকে। 'কে…কে বলল আপনাকে?'

'তানি।'

অন্তরার দম বন্ধ হয়ে গেল। প্রশ্নটা তানিও ওকে করেছিল। তানি প্রশ্ন করায় অন্তরা ধরে নিয়েছিল, এটা আসলে সেই বাজে মেয়ে ফারজানার প্রশ্ন। শুভ্রর কথা সত্যি কিনা জানার জন্যে তানিকে ধরেছে ফারজানা। উত্তরে চুপ করে ছিল অন্তরা, হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনি। তারমানে, তানি ধরে নিয়েছে, কথাটা সত্যি। সেক্ষেত্রে ফারজানা তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে। অর্থাৎ শুভ্রর সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

কিন্তু শুভ্রর সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে অন্তরা পড়ে গেছে মহা বিপদে। তানি জানে, শুভ্রর সঙ্গে অন্তরার বিয়ে হবে। তানির সঙ্গে মাসুদুর রহমানের সম্পর্ক এখন খুব ভাল, প্রায়ই তারা নিভৃত আলাপ করছে। তারমানে, সম্ভবত মাসুদুর রহমানও জানেন যে শুভ্রর সঙ্গে অন্তরার বিয়ে হবার কথা পাকা হয়ে আছে। শুধু মাসুদুর রহমানই নন। অফিসে অনেকেই জানে। এই যেমন ওয়াঙচুক।

হঠাৎ এত অসহায় বোধ করল অন্তরা, নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল। কি কুক্ষণেই না শুভ্রকে কথা দিয়েছিল ও। না কাউকে বলা যাচ্ছে, না চেপে রাখা যাচ্ছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে এল ওয়াঙচুক, ওর কাঁধে হাত

রেখে সান্ত্বনা দিল।

চোখ মুছে নিজেকে শান্ত করল অন্তরা। বুঝতে পারছে, এরপরও যদি মুখ বুজে থাকে, মাসুদুর রহমানকে চিরকালের জন্যে হারাতে হবে ওকে। শুভ্রকে দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা বলতে যাবে ও, হঠাৎ ইন্টারকমটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল ওয়াঙচুক। একটু পর নামিয়ে রেখে বলল, 'বস্। জানতে চাইলেন, আমি আছি কিনা। বোধহয় কিছু বলবেন। আসছেন উনি।'

মাসুদুর রহমান আসছেন শুনে নিজের কামরায় ফিরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল অন্তরা। কিন্তু বেরুনো হল না, তার আগেই ভেতরে ঢুকলেন মাসুদুর রহমান, সঙ্গে উম্মে জোহরা। আজকাল সব সময় দু'জনকে একসঙ্গেই দেখা যায়। মাসুদুর রহমান অন্তরার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না, বুঝতে পেরে অকারণে হাসি লেগে থাকে জোহরার ঠোঁটে, নিঃশব্দে অন্তরাকে উপহাস করে সে।

আজও ঠিক তাই ঘটল। ঘরে ঢুকে অন্তরাকে ঠিকই দেখতে পেলেন মাসুদুর রহমান, কিন্তু ভান করলেন দেখতে পাননি। সরাসরি ওয়াঙচুকের টেবিলের সামনে বসলেন তিনি, ব্যবসা নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। অন্তরার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বাঁকা করে হাসল জোহরা, জানতে চাইল, 'কাজের সময় এখানে তুমি কি করছিলে? গল্প-গুজব করবে অফিস আওয়ারের পরে। তা নতুন কোন মক্কেল ফাঁসাতে পারলে, অন্তরা?'

'নতুন মক্কেল, মানে?'

'না, মানে, জানতে চাইছি, কিছু বেচতে-টেচতে পারলে?' কৌশলে প্রসঙ্গটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল জোহরা। 'তুমি তো আবার মক্কেল ফাঁসাতে সাংঘাতিক পটু।'

কাঁপতে শুরু করেছে অন্তরা, রাগে কিছু বলতেই পারল না।

ওর হয়ে জবাব দিল উমা ওয়াঙচুক। 'আপনার ভুল হচ্ছে, মিস

জোহরা। অন্তরা সেলস্ ডিপার্টমেন্টে কাজ করে না। সেদিন আমেরিকান ডেলিগেটদের রেট দিয়েছিল ও, কারণ অফিসে তখন সেলসের কেউ ছিল না।'

'সেলসের কথা যখন উঠল,' ঘাড় ফিরিয়ে অন্তরার দিকে তাকালেন মাসুদুর রহমান, 'তাহলে কথাটা জানিয়ে দিই। অন্তরা, সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে তিনজনকে নেব আমরা। আমার টেবিলে দশজনের বায়ো-ডাটা দেখলাম। একজনকে বাদ দিয়ে বাকি নয়জনকে ইন্টারভিউয়ের জন্যে ডাকতে পারো তুমি।'

'বাদ পড়ল কে?'

'তোমার ফুফাত ভাই, কবির সিকদার ওরফে শুভ্র,' বললেন মাসুদুর রহমান। 'ওর সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছি আমি। আগে যে গার্মেন্টসে চাকরি করত, সেখানে তার অনেক দুর্নাম। এমনকি তহবিল তসরুপের অভিযোগও আছে।'

'না-না, এ-ধরনের লোককে আমরা চাকরি দিতে পারি না,' আঁতকে উঠে মন্তব্য করল জোহরা।

'ঠিক আছে, ওকে আমি জানিয়ে দেব,' বলে কামরা থেকে বেরিয়ে এল অন্তরা, কান্না লুকোবার জন্যে ছুটে ঢুকে পড়ল নিজের কামরায়।

দরজা বন্ধ করে একা কিছুক্ষণ কাঁদল অন্তরা। উপকারই হল, হালকা হয়ে গেল মনটা। চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে কাজ নিয়ে বসল ও। মন থেকে সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। ঠিক করেছে, কে কি বলল সে-কথা ভেবে নিজেকে কষ্ট পেতে দেবে না।

একটু পরই ফোন এল। রিসিভার তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কে?' অপরপ্রান্ত থেকে শুভ্র জানতে চাইল, তার চাকরি কি হবে? 'না,' বলল অন্তরা। 'বস্ তোমার সম্পর্কে খবর নিয়েছেন, জানতে পেরেছেন তোমার নামে অনেক দুর্নাম। কাজেই তোমাকে আমরা ইন্টারভিউয়ের

জন্যে ডাকছি না।' শুভ্রকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রিসিভারটা রেখে দিল ও। চেষ্টা করল তার কথা ভুলে থাকার।

দুপুরে কিছু খেল না অন্তরা। পিয়নকে ডেকে শুধু এক কাপ চা আনতে বলল। ইতিমধ্যে রীনা চৌধুরী ডেকে পাঠিয়েছিলেন ওকে। কাজ নিয়ে আলাপ করার পর আবার নিজের কামরায় ফিরে এসেছে। সারাটা দুপুর ও বিকেল ব্যস্ত থাকল ডিজাইন তৈরির কাজে। ক'দিন পরই কুয়ালা ফ্যাশন হাউসের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে, প্রচুর দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। বিকেলে মিলাদ, মিলাদে কোন বিদেশী উপস্থিত থাকবেন না। রাতে পার্টি। সেখানে শুধু খানা নয়, পিনারও ব্যবস্থা থাকবে। নিমন্ত্রণ-যোগ্য অতিথিদের তালিকা তৈরি, উদ্বোধন উপলক্ষে ডেকোরেশন, কোন রেস্তোরাঁকে খাবার ও পানীয় সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া হবে, ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারে ওর পরামর্শ চাইছেন এনাম আহমেদ ও রীনা চৌধুরী। কাজেই কাজের কোন শেষ নেই অন্তরার। তার ওপর, ডিজাইনের কাজ তো আছেই।

সোয়া পাঁচটায় ওর কামরায় ঢুকল জাহিদ হাসান। জিজ্ঞেস করল, বাড়ি ফিরবে কিনা। 'না,' জবাব দিল অন্তরা, কাজ থেকে মুখ না তুলেই। 'আপনি যান। আমার দেরি হবে।'

'হোক দেরি, আমি তাহলে অপেক্ষা করি।'

এবার মুখ তুলল অন্তরা। 'জাহিদ ভাই, সত্যি আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনি আমার জন্যে অনেক কষ্ট করেছেন। কিন্তু রোজ আপনি আমাকে সকালে অফিসে নিয়ে আসবেন, আবার বিকেলে পৌছে দেবেন, এটা ভাল দেখায় না। ভাল দেখায় না, উচিতও নয়। তাই আমি ঠিক করেছি, এখন থেকে আমি একাই বাড়ি ফিরব। আপনি কিছু মনে করবেন না, প্লীজ।'

'ও, আচ্ছা, ঠিক আছে,' বলে দরজার কাছ থেকে সরে গেল জাহিদ হাসান। বুদ্ধিমান মানুষ সে, যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। জাহিদ চলে

যাবার পর মনটা খারাপ লাগলেও, স্বস্তিও বোধ করল অন্তরা। কথাগুলো জাহিদকে আরও অনেক আগেই বলা উচিত ছিল। দেরিতে হলেও, আজ বলতে পেরে ঝামেলা-মুক্ত লাগছে নিজেকে ওর। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ভাবল, এভাবে যদি সমস্ত ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারতাম! কিন্তু তা হবার নয়। মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর হওয়ারও তো একটা সীমা আছে। শুভ্র বেকার, তাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারছে না ও। এখন যদি তাকে দেয়া প্রতিশ্রুতিটা ভঙ্গ করে, নিজের কাছেই ছোট হয়ে যাবে অন্তরা। ছোটবেলার পবিত্র একটা আদর্শ, চাইলেই সেটার অমর্যাদা করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

অফিসে কেউ নেই, প্রায় ন'টার মত বাজে। পিয়নকে ডেকে পেল না অন্তরা, কাজেই দারোয়ানকে ডেকে আলোগুলো নিভিয়ে দিতে বলল ও। দারোয়ান আলো নিভিয়ে অফিস কামরার দরজায় তালা দিচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল অন্তরা।

ক্লান্ত লাগছে ওর। খিদেও পেয়েছে খুব। ফ্ল্যাটে ফিরে প্রথমে গোসল করবে, তারপর খেতে বসবে। সিঁড়ি বেয়ে নামছে অন্তরা, হঠাৎ আবছা ম্লান আলোর মধ্যে কাকে যেন শেষ ধাপটায় বসে থাকতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কে ওখানে?' জিজ্ঞেস করেও কোন জবাব পেল না।

ধীরে ধীরে, সাবধানে আরও কয়েকটা ধাপ নেমে লোকটার পিছনে চলে এল অন্তরা। অফিস বিল্ডিঙের গেটটা খোলা, রাস্তার আলো পড়েছে ভেতরে। লোকটা সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে অসম্ভব হাঁপাচ্ছে। তাকে পাশ কাটিয়ে নেমে এল অন্তরা, ভাল করে তাকাতে দেখল, প্যান্ট-শার্ট পরা একজন বুড়ো। রোগা-পাতলা, অসুস্থ মানুষ। এতই অসুস্থ যে মুখ তুলে তাকাতে পারছে না, কথাও বলতে পারছে না। তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে ভয় পেয়ে গেল অন্তরা। অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকাল, কি করবে বুঝতে পারছে না।

'আপনি কি অসুস্থ?'

বুড়ো মাথা ঝাঁকাল। বিড়বিড় করে কি বলল, বুঝতে পারল না অন্তরা।

'এখানে কারও সাথে দেখা করতে এসেছেন?' আবার জানতে চাইল অন্তরা।

মাথা নেড়ে হাতটা লম্বা করল বুড়ো, রাস্তার দিকটা দেখাল।

'অসুস্থ? বিশ্রাম নিচ্ছেন এখানে?'

মাথা ঝাঁকাল বুড়ো।

অন্তরা ভাবল, দারোয়ানের জন্যে অপেক্ষা করবে ও। কিন্তু দারোয়ান নিচে নামছে না দেখে বুড়োর দিকে তাকাল আবার। লোকটা এখনও হাঁপাচ্ছে, এক হাতে খামচে ধরে আছে বুকটা। হার্ট অ্যাটাক নাকি? 'আপনি কি হাসপাতালে যাবেন? খুব অসুস্থ?' অসুস্থ একজন বুড়োকে একা ফেলে চলে যেতে মন চাইছে না ওর।

'ট্যাক্সি... ।'

অফিস বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল অন্তরা। ভাগ্য ভাল, সামনেই একটা বেবি ট্যাক্সি পাওয়া গেল। বুড়োর কাছে ফিরে এল ও, এই সময় দারোয়ানও নিচে নেমে এল। অন্তরা বলল, 'লোকটাকে ধরে গাড়িটায় তুলে দাও তো। অসুস্থ, এখানে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল।'

দারোয়ান একা পারবে না, বেবির ড্রাইভারকে ডেকে আনল সে। দু'জন ধরাধরি করে বুড়োকে তুলে দিল বেবি ট্যাক্সিতে। কি মনে করে, হাতব্যাগ খুলে ড্রাইভারের হাতে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট গুঁজে দিল অন্তরা। বলল, 'যেখানে যেতে চান, ভালভাবে পৌঁছে দেবেন।'

তিন দিন পরের ঘটনা। অফিসে নিজের কামরায় বসে কাজ করছে অন্তরা, ওদের একজন পিয়ন বিরাট একটা ফুলের তোড়া নিয়ে ভেতরে ঢুকল। এক লোক অন্তরাকে পাঠিয়েছে এটা। লোকটা কে, পিয়ন

বলতে পারল না। লাল একটা গাড়ি চালিয়ে এসেছিল লোকটা, সম্ভবত ড্রাইভার। গাড়ি থেকে তোড়াটা নামিয়ে দারোয়ানকে দিয়ে গেছে, বলেছে মিস অন্তরাকে দিতে হবে।

অফিসে হৈ-চৈ পড়ে গেল। এত বড়, এত সুন্দর একটা ফুলের তোড়া কে পাঠাল অন্তরাকে? সবাই একবার করে ওর ঘরে ঢুকে দেখে গেল তোড়াটা। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু মন্তব্যও করল। তবে ব্যাপারটা নিয়ে অন্তরা বেশি কিছু বলল না। যদিও মনে মনে ভারি বিস্মিত হয়েছে ও। এরকম একটা ফুলের তোড়া কে তাকে উপহার দিতে পারে? শুভ্র? না, সম্ভব নয়। লাল গাড়িতে করে এত সুন্দর একটা ফুলের তোড়া পাঠাবার সামর্থ্য তার নেই। মাসুদুর রহমান? অসম্ভব, সে প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর সঙ্গে অন্তরার যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, ফুলের তোড়া উপহার দেয়া তো দূরের কথা, পারলে বোধহয় চাকরিটাও কেড়ে নেন। তাহলে কে হতে পারে?

ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাথাও ঘামাল না অন্তরা। নিজের সিদ্ধান্তের কথাটা মনে পড়ে গেল ওর। কোন ব্যাপারেই কিছু ভাববে না। যা ঘটে ঘটুক, নিজেকে কষ্ট পেতে দেবে না।

মাথা না ঘামালেও, ফুলের তোড়াটা খুব যত্নের সঙ্গে নিজের কামরায় সাজিয়ে রাখল ও। সাদা দেয়ালের এমন এক জায়গায় ঝুলিয়ে রাখল ওটা, দরজার সামনে দিয়ে কেউ গেলেই তার চোখে পড়বে।

বাথরুমে গিয়েছিল অন্তরা, বেরিয়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকবে, দেখল ঘরটার সামনে রীনা চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলছেন মাসুদুর রহমান। ওদের সঙ্গে উম্মে জোহরাও রয়েছে। অন্তরা শুনতে পেল, রীনা চৌধুরী বলছেন, 'ওটা কে পাঠিয়েছে অন্তরা তা জানে না। হ্যাঁ, খুব সুন্দর তোড়াটা।'

দাঁড়িয়ে পড়ল অন্তরা, পা দুটো চলছে না। করিডরে ওর উপস্থিতি ওরা কেউ টের পাননি।

জোহরা মন্তব্য করল, 'আমাদের অন্তরা খুব সুন্দরী, তার ভক্তের সংখ্যাও নিশ্চয় কম নয়। বোধহয় তাদেরই কেউ পাঠিয়েছে। ওর তো ফুফাত ভাই আর মামাতো ভাইয়ের কোন অভাব নেই।' কথার শেষে শব্দ করে হাসল সে।

'আমি তোমার এ-ধরনের কথার কোন অর্থ খুঁজে পাই না,' গম্ভীর স্বরে বললেন মাসুদুর রহমান। 'কারও পিছনে আজেবাজে মন্তব্য কি না করলেই নয়, জোহরা? ফুলের তোড়াটা সুন্দর, দেখে ভাল লাগছে— ব্যস, আলোচনাটা তো এখানেই শেষ হতে পারে, নাকি?'

'কি আশ্চর্য! আমি কি সিরিয়াসলি কিছু বলেছি? তুমি মাইণ্ড করবে জানলে…।'

'রীনা, খোঁজ নিয়ে দেখুন তো, কে পাঠিয়েছে তোড়াটা,' মাসুদুর রহমানের ভারি গলা গমগম করে উঠল করিডরে। 'অন্তরা সম্ভবত জানে, কিন্তু স্বীকার করছে না। ওকে বলুন, কে পাঠিয়েছে আমি জানতে চাই।'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে রীনা চৌধুরী বললেন, 'ঠিক আছে, অন্তরাকে জিজ্ঞেস করব…।'

'কি জিজ্ঞেস করবেন, রীনা আন্টি?' ওদের দিকে এগোল অন্তরা, থমথম করছে চেহারা।

'অন্তরা, এই যে তুমি এসে গেছ,' বললেন রীনা চৌধুরী। 'বস্ জানতে চাইছেন, তোড়াটা কে পাঠিয়েছে তুমি জানো?'

'আমি তো আমার কামরায় ছিলাম, পিয়ন এসে দিয়ে গেল। বলল, এক লোক দারোয়ানকে দিয়ে গেছে। দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন, সে হয়ত বলতে পারবে।'

'রীনা, আপনার কামরায় দারোয়ানকে ডেকে পাঠান। আমিও আসছি। জোহরা, তুমিও ওঁর সাথে যাও।'

'কে পাঠিয়েছে, তোমার কোন ধারণা নেই?' এবার সরাসরি

জানতে চাইলেন মাসুদুর রহমান, ওরা দু'জন চলে যাবার পর।

'না,' সংক্ষেপে জবাব দিল অন্তরা। রাগে ফুলছে ও। কেউ ফুলের তোড়া পাঠালে ওকে জবাবদিহি করতে হবে নাকি? ওর চাকরির সঙ্গে সেরকম কোন শর্ত জুড়ে দেয়া আছে বলে তো ওর জানা নেই। মাসুদুর রহমান ওর দিকে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন দেখে রাগটা আরও বেড়ে গেল ওর। বলল, 'যদি জানতামও বা ধারণা করতে পারতাম যে কে পাঠিয়েছে, অফিসকে আমি তার পরিচয় বলতাম বলে মনে হয় না। এটা নেহাতই আমার ব্যক্তিগত বিষয়।'

'কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ, এখানে আমরা স্টাফদের নিরাপত্তা ও মঙ্গল-অমঙ্গল সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন,' শান্ত গলায় বললেন মাসুদুর রহমান। 'কেউ ভুল বা বোকামি করে কোন বিপদে জড়িয়ে পড়ছে কিনা, এটা দেখা আমাদের দায়িত্ব।'

'ধন্যবাদ, শুনে খুব খুশি লাগছে,' বলল অন্তরা। 'তবে, দুঃখিত। এটা কে পাঠিয়েছে আমি জানি না।'

'শুভ্র নয় তো, তোমার ফুফাত ভাইটি?' জানতে চাইলেন মাসুদুর রহমান।

'হতে পারে, কি করে বলব।'

অন্তরার গলায় ঝাঁঝ থাকলেও, মাসুদুর রহমান উত্তেজিত হলেন না। বললেন, 'তোমার ভালর জন্যেই বলছি, তাকে তোমার এড়িয়ে চলা উচিত। কারণ তার সম্পর্কে ইতিমধ্যেই যা শুনেছি...।'

'তার সম্পর্কে আপনি যা-ই শুনে থাকুন, সে আমার ভাই,' দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করল অন্তরা। 'তাকে এড়িয়ে চলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

মাসুদুর রহমান সামান্য হেসে বললেন, 'তবু ভাল যে তার সম্পর্কে অভিযোগগুলো তুমি অস্বীকার করছ না।' তাঁর গলায় ব্যঙ্গ।

অন্তরাও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'তবে এ-কথাও জানি যে আপনাদের কারও কোন ক্ষতি করেনি সে!'

'করেনি, তবে করতে পারে,' মন্তব্য করলেন মাসুদুর রহমান।

'করতে পারে মানে?'

'তোমার কোন ক্ষতি হলে সেটা আমাদেরও ক্ষতি নয়?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন মাসুদুর রহমান।

'আপনি বলতে চাইছেন শুভ্র আমার ক্ষতি করবে? অসম্ভব, এ আমি বিশ্বাস করি না। শুভ্র আর আমি, আমরা দু'জন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি বা সে, আমরা কেউ কারও ক্ষতি করতে পারি না।'

'তুমি যে পারো না, সেটা বেশ বুঝতে পারি,' বললেন মাসুদুর রহমান। 'কিন্তু তোমার ফুফাত ভাইটি পারে। বোধহয় এরইমধ্যে তোমার যথেষ্ট ক্ষতি করেছে সে, যতটুকু বুঝতে পারছি।'

'শুভ্র? আমার ক্ষতি করেছে? কার কাছে কি শুনে এ-কথা বলছেন আপনি?'

'তার সম্পর্কে আরও খোঁজ-খবর নিতে হবে আমাকে, তারপর বুঝতে পারব আসলে কতটুকু ক্ষতি করেছে সে,' বললেন মাসুদুর রহমান। 'যার কাছে যা-ই শুনে থাকি, তার কথা সবটুকু আমি বিশ্বাস করিনি—এখনও।'

'আমার এই ভাইটিকে অনেকেই সহ্য করতে পারে না,' চিবুক উঁচু করে বলল অন্তরা। 'খারাপ ভাল যেমনই হোক, শুভ্র আমার ছেলেবেলার বন্ধু, তাকে আমি ত্যাগ করতে পারি না।'

'কেউ তোমাকে ত্যাগ করতে বলছেও না। আমি শুধু বলতে চাইছি, আরও সতর্ক হওয়া উচিত্ তোমার।'

'উপদেশ দেয়ার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলে তাকে পাশ কাটিয়ে নিজের কামরায় ঢুকে পড়ল অন্তরা। করিডরে আরও কয়েক সেকেণ্ড একা দাঁড়িয়ে থাকলেন মাসুদুর রহমান, তারপর ধীরে ধীরে নিজের চেম্বারের দিকে চলে গেলেন, থমথম করছে তাঁর চেহারা।

সাত

অন্তরাকে কেউ ফুলের তোড়া পাঠালে মাসুদুর রহমান যদি অসন্তুষ্ট হন, তাহলে ধরে নিতে হবে ওর ব্যাপারে এখনও আগের মতই দুর্বলতা আছে ভদ্রলোকের মনে। কিন্তু অন্তরা ব্যাপারটা বুঝতে চাইল না। ওর মনে হল, শুভ্রর ব্যাপারটা নিয়ে ওর ওপর অকারণে রেগে আছেন তিনি। শুভ্র ওর ফুফাত ভাই, এ-কথাটা প্রথমদিনই মাসুদুর রহমান বিশ্বাস করেননি, তাঁর ওপর ওর রাগের সেটাই আসল কারণ। আজ কথা কাটাকাটির পর রাগটা শুধু বাড়ল না, মাসুদুর রহমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠল ওর মন। শুভ্র ওর ফুফাত ভাই, তাকে অন্তরার এড়িয়ে চলতে হবে, এ-কথা বলার অধিকার তিনি রাখেন না। এটা একটা অন্যায় আবদার। এ অন্যায়ের কাছে কোনমতেই মাথা নত করবে না ও।

মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল অন্তরা, যে যত বারণই করুক, শুভ্রকে ত্যাগ করবে না। টেলিফোনে তার সঙ্গে অত্যন্ত বাজে আচরণ করেছে ও, মনটা সেজন্যে খুব খারাপ হয়ে আছে। শুভ্র তার ছেলেবেলার বন্ধু, চাকরিটা হচ্ছে না এটা তাকে জানানর সময় দুটো সান্ত্বনার কথা বলা উচিত ছিল ওর। তা না, কটু কয়েকটা কথা শুনিয়ে ঝনাৎ করে রেখে দিয়েছে রিসিভার। হঠাৎ শুভ্রর জন্যে হু হু করে উঠল বুকটা। একটু হয়ত উচ্ছৃঙ্খল, অসৎ সংসর্গে পড়ে নষ্ট হতে চলেছে, কিন্তু তাই বলে তাকে ভাল করার চেষ্টা করা যাবে না কেন? শুভ্রর এখন বিপদ, এই

সময় ও যদি তাকে সাহায্য না করে, কে করবে? সাহায্য পাবে জানে বলেই তো ওর কাছে ধরনা দেয় সে। আর কে আছেই বা তার!

শুভ্রর জন্যে কিছু একটা করা দরকার, অনুভব করল অন্তরা। সীমা ভাবীকে ফোন করল ও, বলল, 'শুভ্রর সাথে দেখা হলে বলবে, আমি তার সাথে কথা বলতে চাই।' কেন, কিছু ঘটেছে নাকি, জানতে চাইল সীমা। অন্তরা বলল, 'শুভ্র খুব বিপদের মধ্যে আছে, ভাবী। ওর চাকরিটা গেছে। আমার কাছে এসেছিল, কিন্তু আমাদের এখানে তার চাকরি হবার কোন আশা নেই। অনেক গার্মেন্টস মালিকের সাথে আমার পরিচয় আছে তো, ভাবছি তাদের কারও কাছে তাকে একবার পাঠিয়ে দেখতে পারি। দেখা হলে বলবে আমার সাথে যেন যোগাযোগ করে। বলবে, জরুরী।'

শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে স্টাফরা সবাই তাদের একজন বন্ধুকে অনুষ্ঠানে নিয়ে আসতে পারবে, এ-কথা শুনেই সিদ্ধান্ত নিল অন্তরা, শুভ্রকে নিয়ে আসবে ও। মাসুদুর রহমান তাকে চাকরি না দিন, কুয়ালা ফ্যাশন হাউসে যতদিন আছে অন্তরা, সুযোগ পেলেই শুভ্র এখানে আসবে। সিদ্ধান্তটা নিয়ে এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব করল ও। ও যে শুভ্রকে ত্যাগ করেনি, এটা মাসুদুর রহমানকে জানানো যেন অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। কথাটা অফিসের অনেককেই আগাম জানিয়ে দিল ও, মাসুদুর রহমানের কানে যাতে ওঠে। ওর ইচ্ছে, কথাটা জানুন তিনি, এবং দগ্ধে মরুন।

পরদিন শুভ্রর সঙ্গে দেখা হল অন্তরার। সীমা ভাবীর কাছে খবর পেয়ে সকাল আটটার সময় এসে হাজির সে। ভাই-ভাবী জানল না, দরজা খুলে দিয়ে নিজের ঘরে তাকে বসাল অন্তরা। এখনও নাস্তা খায়নি শুনে নিজের নাস্তার অর্ধেকটা খাওয়াল তাকে। সেদিন টেলিফোনে অভদ্র আচরণ করার জন্যে ক্ষমা চাইল। তারপর বলল,

'আগামী হপ্তায় আমাদের ফ্যাশন হাউস উদ্বোধন উপলক্ষে পার্টি। অনেক বড় বড় গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা আসবেন। দু'একজনের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আমি। স্টাফরা সবাই তাদের একজন ভাই-বোন বা বন্ধুকে নিয়ে যাবে, আমি নিয়ে যাব তোমাকে। তুমি যাবে তো?'

মাথা চুলকে কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করল শুভ্র, বলল, 'অত বড় পার্টি, কত নামী-দামী লোকজন আসবেন, আমি থাকলে তোমার অসুবিধে হবে না তো? তোমার বসকে সাংঘাতিক ভয় পাই আমি।'

'অসুবিধে? অসুবিধে হবে কেন?'

'না, তোমার বস্ আমার ইন্টারভিউ পর্যন্ত নিলেন না, ভাবছি আমার উপস্থিতি তিনি কিভাবে নেবেন...।'

'এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কে কিভাবে নিলেন তাতে আমার কিছুই আসে যায় না,' জেদের সুরে বলল অন্তরা। 'তাঁকে ভয় পাবারও কিছু নেই তোমার। তাছাড়া, পার্টিতে তিনি সম্ভবত থাকছেনও না।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর আবার মাথা চুলকে শুভ্র বলল, 'তাহলে যাওয়া যায়। কিন্তু আমার যে ভাল কাপড়চোপড় নেই!'

সর্বনাশ! এ কথাটা তো ভেবে দেখেনি অন্তরা। পার্টিতে আজেবাজে কাপড় পরে তো যাওয়া চলবে না তার। ওখানে অন্তত একজন থাকবে, শুভ্রকে বেহাল অবস্থায় দেখলে প্রকাশ্যেই হাসবে, ব্যঙ্গ করতেও ছাড়বে না—উম্মে জোহরা। সম্ভবত মাসুদুর রহমানও শুভ্রকে বিদ্রূপ করার এই সুযোগটা ছাড়বেন না। শুভ্র অপমানিত হবে, তা তো হতে দিতে পারে না অন্তরা।

চিন্তায় পড়ে গেল ও। হাতে বেশি সময়ও নেই যে শুভ্রকে একটা স্যুট বানিয়ে নিতে বলবে। তাছাড়া, শুভ্রর কাছে টাকা কোথায় যে স্যুট বানাবে। টাকা না হয় ও-ই দিল, কিন্তু ওর টাকায় শুভ্রকে স্যুট বানিয়ে দিলে ভাই-ভাবী ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবেন...।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। 'ভাল কাপড়চোপড়ের ব্যবস্থা আমি করব, তুমি যেতে রাজি আছ কিনা বলো।'

'কাপড়চোপড়ের ব্যবস্থা হলে যাব,' বলল শুভ্র।

'ব্যবস্থা হবে,' আশ্বাস দিল অন্তরা। 'কোলকাতায় যাবার আগে শিপলু ভাই নতুন একটা স্যুট বানিয়েছে, আমি বললে ওটা তোমাকে একদিনের জন্যে পরতে দিতে আপত্তি করবে না। হয়ে গেল সমাধান!'

'শিপলু ভাই আমার ওপর এমনিতেই খেপে আছে,' বলল শুভ্র। 'স্যুট চাইলে তেড়ে মারতে আসবে।'

'সে-সব আমি দেখব। নিজে না পারি, ভাবীকে দিয়ে রাজি করাব,' বলল অন্তরা। 'রোববার বিকেলে সরাসরি আমার কাছে চলে আসবে তুমি, আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখো,' বলে উঠে দাঁড়াল শুভ্র। 'আমি এবার যাই।'

'দাঁড়াও, তোমার সাথে আরও কথা আছে আমার,' তার হাত ধরে বিছানায়, নিজের পাশে বসাল অন্তরা। 'তোমার ফারজানার খবর কি, বললে না তো? সে তোমার পিছু ছেড়েছে?'

'তোমার সাথে আমার বিয়ে হবে, এটা তার কানে গেছে,' বলল শুভ্র। 'কেউ নিশ্চয়ই তোমাকে প্রশ্ন করেছিল, তাই না? কিন্তু কথাটা সে পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি।'

'আমাকে প্রশ্ন করেছিল তানি, আমার বান্ধবী, তাকে তো তুমি চেনই,' বলল অন্তরা। 'আমি হ্যাঁ বা না, কিছুই বলিনি। সে ধরে নিয়েছে, কথাটা সত্যি।'

'মনে হয় না,' বলল শুভ্র। 'তানি বোধহয় ধরে নিয়েছে, কথাটা সত্যি নয়। অন্তরা, আমি আশা করেছিলাম, কেউ তোমাকে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করলে তুমি তাকে স্পষ্ট করে জানাবে যে, হ্যাঁ, তোমার সাথে আমার বিয়ে হবার কথা পাকা হয়ে আছে। তুমি হ্যাঁ-ও বলবে না, না-

ও বলবে না, এটা আমি আশা করিনি। তিন সত্যি করেছিলে, কথাটা কি ভুলে গেছ?'

'ছি-ছি, শুভ্র, ভুলে যাব কেন!'

অন্তরার মুখের সামনে একটা আঙুল খাড়া করল শুভ্র। 'তাহলে বলছ, আবার কেউ প্রশ্ন করলে তাকে তুমি স্পষ্ট করে জানাবে?'

আঙুলে আঙুল ছুঁয়ে আবার প্রতিজ্ঞাটা ঝালাই করে নিল ওরা। অন্তরা বলল, 'ঠিক আছে, এবার স্পষ্ট করেই বলব।'

এতক্ষণে হাসল শুভ্র। 'আমি জানতাম, তিন সত্যি করার পর তুমি তোমার কথা রাখবে। আচ্ছা, অন্তরা, একটা সত্যি কথা বলবে?'

'কি কথা?'

'কিছু মনে কোরো না, কথাটা তোমার বস্ সম্পর্কে। আমি ঈর্ষাকাতর নই বা তাঁর নিন্দাও করছি না,' ইতস্তত করছে শুভ্র। 'কিন্তু তাঁকে যতবার দেখেছি ততবারই একটা প্রশ্ন জেগেছে আমার মনে।'

'কি প্রশ্ন?'

'ভদ্রলোক কি একটু বেশি মেয়ে ঘেঁষা? মানে, তাঁর সাথে সুন্দরী মেয়ে নেই, এরকম অবস্থায় কখনও দেখিনি কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি। ব্যাপারটা কি বলো তো?'

হাতের তালু ঘামতে শুরু করল অন্তরার। কথাটা ওরও মনে জেগেছে। সত্যিও বটে। মাসুদুর রহমানের চারপাশে ভিড় করে আছে সুন্দরী মেয়েরা। তাঁর কাছ থেকে প্রশ্রয় না পেলে মেয়েরা সব সময় তাঁকে ঘিরে থাকতে পারে না। এধরনের একটা পুরুষের চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক। একা ওর নয়, সঙ্গত কারণে শুভ্রর মনেও প্রশ্নটা জেগেছে। তবু তো শুভ্র জানে না যে ইদানিং মাসুদুর রহমান ওর বান্ধবী তানির সঙ্গেও মেলামেশা করছেন। এ-সব কিসের লক্ষণ? শুভ্র ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে দেখে জোর করে হাসল অন্তরা। 'ওটা একটা ফ্যাশন হাউস,গার্মেন্টসের ব্যবসা করেন তিনি, তাঁর আশপাশে মেয়েরা

তো থাকবেই,' বলল ও। কিন্তু, মনে মনে নিজেকে অন্য কথা শোনাল অন্তরা—গার্মেন্টসের ব্যবসা কি উনি একা করছেন? আরও অনেক গার্মেন্টিস মালিককে চেনে ও, কই, তাঁরা তো সারাক্ষণ মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা মারছেন না।

'তা বটে,' হেসে উঠে বলল শুভ্র। 'তবু, একটু যেন অন্যরকম লাগে চোখে। যাকগে, আমাদের কি আসে যায়। তা আমার চাকরিটা ওখানে কেন হল না, তা তো বললে না, অন্তরা?'

অন্তরা ভাবছে, হ্যাঁ, আমাদের কি আসে যায়। তবে চোখে অন্যরকম লাগে বৈকি। বিশেষ করে উম্মে জোহরার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। সবাই জানে, মেয়েটা তাঁকে বিয়ে করার জন্যে পাগল। সম্পর্কটাও দীর্ঘদিনের। অথচ তাকে ঝুলিয়ে রেখেছেন মাসুদুর রহমান। কেন, পরিষ্কার জানিয়ে দিলেই তো হয় যে তাকে উনি বিয়ে করতে ইচ্ছুক নন। তা তিনি জানাচ্ছেন না বলেই তো এখনও আশা ছাড়তে পারেনি জোহরা। সে হয়ত সত্যি তাঁকে ভালবাসে, কাজেই তাকে দোষ দিতে পারে না অন্তরা।

তারমানে কি? তারমানে মেয়েদের নিয়ে খেলতে ভালবাসেন ভদ্রলোক। এ-ধরনের বিপজ্জনক পুরুষদের কথা বান্ধবীদের মুখে অনেক শুনেছে অন্তরা। সরল, ভালমানুষ মেয়েদের জীবন নষ্ট করতে এদের জুড়ি নেই। কাজেই সাবধান হওয়া দরকার ওর।

কিন্তু মাসুদুর রহমানের জীবন থেকে সরে আসার কথা ভাবতেই কান্না পেয়ে গেল ওর। অনেকদূর এগিয়ে গেছে ও, এত দূর যে তাঁকে ছাড়া নিজের অস্তিত্বের কথা ভাবতেই পারে না। তারপরই অন্তরার মনে পড়ল, ওয়াংচুক বা আর সবাই যাই বলুক, ব্যাপারটা কিন্তু একতরফাই। একতরফা নয় তো কি, মাসুদুর রহমান কি কোনদিন বলেছেন যে তিনি ওকে ভালবাসেন? বলেননি, এমনকি আভাসও দেননি। তারমানে কি? তারমানে ওর দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছেন

ভদ্রলোক। আর সব মেয়েদের মত, ওকে নিয়েও খেলছেন তিনি।

অন্তরার মনে হল, যে লোক ওকে ভালবাসে না, কেউ ওকে ফুলের তোড়া পাঠালে ওর ওপর রাগ করারও কোন অধিকার তাঁর নেই। মাসুদুর রহমান যে স্বার্থপর ও ঈর্ষাকাতর, এটা যেন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ওর কাছে। ভালও বাসবেন না, আবার ওর জীবনে অন্য কোন পুরুষকে সহ্যও করতে পারবেন না। আশ্চর্য, নিজেকে কি ভাবেন ভদ্রলোক? সুপুরুষ, বিপুল টাকা আছে, কাজেই দুনিয়ার সব মেয়ে তাঁর খেলার সামগ্রী হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকবে? দুঃখিত, অন্তরা সে প্রকৃতির মেয়ে নয়।

'কি, কিছু বলছ না যে?' আবার জানতে চাইল শুভ্র। 'আমার চাকরিটা হল না কেন?'

'হল না নয়, আমি চাইনি এত কম বেতনের চাকরি করো তুমি,' বলল অন্তরা। 'এ-লাইনে তোমার অভিজ্ঞতা আছে, আমি চাই আরও ভাল চাকরি পাও তুমি।'

'কিন্তু সেদিন যে ফোনে বললে...।'

শুভ্রকে থামিয়ে দিয়ে অন্তরা বলল, 'সেদিন আমার মেজাজটা খারাপ ছিল, শুভ্র। সেজন্যে তো প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিলাম আমি, নিইনি?'

'ঠিক আছে, বুঝলাম। কিন্তু প্রথমে একটা ছোটখাট চাকরিতে ঢুকে পড়লে হত না? তারপর না হয় ভাল একটার জন্যে চেষ্টা করা যেত।'

'না, শুভ্র। তুমি আমার চেয়ে বয়েসে বড়, আমার চেয়ে তোমার অভিজ্ঞতাও বেশি, একই প্রতিষ্ঠানে আমার চেয়ে কম বেতনে চাকরি করবে তুমি, এ আমি দেখতে চাই না। তুমি একটু যদি বুঝে চলো, একটু যদি শান্ত হও, ভাল একটা চাকরি যোগাড় করা কোন সমস্যা হবে না। রাগের মাথায় কথাটা বললেও, মিথ্যে বলিনি সেদিন—তোমার নামে সত্যি অনেক দুর্নাম, শুভ্র। যা হবার হয়েছে, এখনও

নিজেকে তুমি শুধরে নিতে পারো। শিক্ষিত ছেলে তুমি, তোমার মত চেহারাই বা ক'জনের আছে সারা দেশে? বংশ মর্যাদাতেও কারও চেয়ে কম কিসে তুমি? তাহলে কেন তুমি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না? কেন আমরা তোমাকে নিয়ে গর্ব অনুভব করতে পারব না?'

'আমার কথা এত ভাবো তুমি?' হেসে উঠল শুভ্র। 'আমাকে নিয়ে গর্ব অনুভব করতে চাও?' হাসছে বটে, তবে বিস্মিতও হয়েছে সে।

'কেন তোমাকে নিয়ে ভাবব না বলতে পারো? ছোটবেলা থেকে একসাথে মানুষ হইনি আমরা? মনে আছে, দোষ করেছ তুমি, আর শাস্তি ভোগ করেছি আমি? আজও তুমি আমাকে কম জ্বালাতন করছ না। কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কিছুই আমি মনে করি না। তোমার সব অন্যায় অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিতে পারি, শুভ্র, শুধু যদি নিজেকে তুমি মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে নিতে চেষ্টা করো। ভাল হওয়া কি এতই কঠিন, শুভ্র? তোমার জন্যে সবাই আমরা অনেক করেছি, তুমি আমাদের জন্যে এটুকু করতে পারো না? কেউ আমরা তোমার কাছে কিছু চাইছি না, তোমাকে শুধু নিজের দিকে একটু তাকাতে বলছি। এটুকু চাওয়ার অধিকার কি আমাদের নেই?'

অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না শুভ্র। মাথাটা নিচু করে বসে থাকল সে, যেন অপরাধী একটা শিশু।

দেখে মায়া লাগল অন্তরার। শুভ্রর জন্যে দুঃখে মোচড় দিয়ে উঠল ওর বুকটা। প্রিয় মানুষগুলোকে ভাল থাকতে না দেখলে প্রাণে কি যে কষ্ট লাগে। শুভ্রর কাঁধে একটা হাত রাখল ও। নরম সুরে জিজ্ঞেস করল, 'কি, রাগ করলে নাকি?'

অন্তরার হাতের ওপর একটা হাত রাখল শুভ্র। 'না, অন্তরা। সত্যি আমি নষ্ট হয়ে গেছি। কেন নষ্ট হয়েছি, সে-কথা বললে কেউ বুঝবে না। তবে তুমি আমাকে যেরকম ভালবাস, সে রকম ভালবাসা আর কারও কাছে কোনদিন পাইনি আমি।' অন্তরার হাতটায় মৃদু চাপ দিল

সে, বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'তোমার অফিসের দেরি হয়ে যাবে আজ যাই, কেমন? যাবার আগে তোমাকে শুধু একটা কথা বলে যাই—আমি যদি কোনদিন ভাল হতে পারি, জানবে শুধু তোমার জন্যে হয়েছি,' বলে আর দাঁড়াল না সে, দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ফ্ল্যাট থেকে।

চোখে পানি বেরিয়ে এসেছে, খোলা দরজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল অন্তরা।

আর দু'দিন পর উদ্বোধন, অফিসে এসে নিশ্চিতভাবে জানতে পারল অন্তরা, মিলাদে উপস্থিত থাকলেও, জরুরী কি একটা কাজ থাকায় পার্টিতে উপস্থিত থাকতে পারবেন না মাসুদুর রহমান। কথাটা আগেই শুনেছিল, কিন্তু বিশ্বাস করেনি। ওর মত আর সবাইও খুব হতাশ হল। রীনা চৌধুরী বললেন, 'জরুরী কাজটা কি, জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি। বস্ বললেন, ব্যক্তিগত। ওই সময় তাঁকে নাকি একটা ক্লিনিকে থাকতে হবে।'

উমা ওয়াঙচুককেও চিন্তিত মনে হল। 'ক্লিনিকে? কেন? কেউ অসুস্থ নাকি?'

জাহিদ হাসান জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, দু'দিন ধরে জোহরাকে দেখছি না যে?'

'তুমি দেখছ না, আমরা রোজই দেখছি,' বলল ওয়াঙচুক। 'ঠিক পাঁচটার সময় বসকে নিতে আসে সে।'

অন্তরা ভাবল, কি কারণে পার্টিতে উপস্থিত থাকতে চাইছেন না ভদ্রলোক? কিসের এত ব্যস্ততা তাঁর? ক্লিনিকে থাকতে হবে, এটা বোধহয় একটা অজুহাত। পার্টিতে শুভ্রকে নিয়ে আসবে ও, এটাই কি তাঁর উপস্থিত না থাকতে চাওয়ার কারণ? তারপর নিজেকে শোনাল, ব্যাপারটাকে এত বেশি গুরুত্ব না দিলেও চলে ওর। পার্টিতে কে

উপস্থিত থাকল না থাকল তাতে ওর কি আসে যায়? মনের গভীরে খানিকটা উদ্বেগ ও অপরাধবোধ জাগলেও, পাত্তা দিল না অন্তরা।

গত দু'দিন ধরে রোজই শুভ্রর সঙ্গে দেখা হচ্ছে ওর। ইতিমধ্যেই সীমা ভাবীর সঙ্গে তার ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করেছে ও। শিপলু ভাইও পার্টিতে পরে যাবার জন্যে তার নতুন স্যুটটা শুভ্রকে দিতে রাজি হয়েছে। শুধু স্যুট নয়, এরইমধ্যে এক জোড়া করে প্যান্ট-শার্টও দিয়েছেন ছোট ভাইকে, প্রায় নতুনই বলা যায়। ওগুলো পরায়, সাংঘাতিক স্মার্ট দেখায় শুভ্রকে। পর পর দু'দিন ওরা বেড়াতে বেরিয়েছে—একদিন গেছে বেলি রোডে নাটক দেখতে, একদিন গেছে ক্রিসেন্ট লেকে হাওয়া খেতে। অন্তরা লক্ষ করেছে, একসঙ্গে বেরুলেই রাস্তা-ঘাটের মানুষ মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে, বিশেষ করে শুভ্রর দিকে। ওদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখে কে কি ভাবছে, কল্পনা করে ভারি মজা পায় অন্তরা। তবে রিকশায় থাকলে, সামান্য একটু সরে বসার চেষ্টা করে ও, যতটা সম্ভব ব্যবধান রচনা করার প্রয়াস। আর লেকের কিনারা ধরে যখন হাঁটে, অকারণে শব্দ করে হাসে, কৃত্রিম ধমক দেয় শুভ্রকে, শুভ্রর চেয়ে বেশি মনযোগ থাকে পরিবেশের ওপর—সাধারণত একজন প্রেমিকার মধ্যে যা দেখা যায় না। তবু কারও কারও দৃষ্টি দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারে অন্তরা, ওদের সম্পর্কে কি ভাবছে তারা। তখন খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ও। শুভ্রর সঙ্গে এখানে কি করছি আমি? নিজেকে প্রশ্ন করেও কোন সদুত্তর পায় না। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা মুখ। একটা অভিমান উথলে ওঠে বুকের ভেতর। চোখ দুটো যাতে ভিজে না ওঠে, সেজন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয় তখন অন্তরাকে। গতকাল এরকম অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অন্তরা, হঠাৎ আবিষ্কার করল, একটা গাড়ির নম্বর প্লেটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও। সাদা একটা টয়োটা, নম্বরটাও মেলে—মাসুদুর রহমানের গাড়ি। গাড়িতে কেউ নেই, আশপাশেও কাউকে

দেখতে পেল না অন্তরা। বিশ্রী একটা সন্দেহ জাগল ওর মনে। ভদ্রলোক কি গোপনে ওদেরকে অনুসরণ করছেন? আড়াল থেকে নজর রাখছেন ওদের ওপর?

বাড়ি ফেরার পথে মনটা এত খারাপ হয়ে ছিল অন্তরার, শুভ্রর প্রশ্নের উত্তরে জানিয়ে দিয়েছে, না, আগামী দু'দিন বেড়াতে বেরুবে না ও।

মাসুদুর রহমানকে ছাড়াই দারুণ জমে উঠল কুয়ালা ফ্যাশন হাউসের পার্টিটা। উদ্বোধন আসলে আগেই করা হল, মিলাদের পরপর। উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষ করেই জোহরাকে নিয়ে চলে গেলেন তিনি, তখনও শুভ্রকে নিয়ে পৌঁছায়নি অন্তরা। ওরা পৌঁছুল ঠিক সাড়ে সাতটায়, পার্টি শুরু হবার মুহূর্তে।

ক'দিন আগেই শুনেছে অন্তরা, বিদেশী অতিথিদের খুশি করার জন্যে ওদের স্টাফদের অনেকেই নাকি পার্টিতে মদ্যপানের কথা ভাবছে। তখনই ওর মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি চাপে। কাউকে কিছু জানায়নি ও, এমনকি শুভ্রকেও বলেনি কি করবে। ও জানে, আর জানে যারা পানীয় পরিবেশন করবে। দায়িত্বটা দেয়া হয়েছে একটা চাইনীজ রেস্টুরেন্ট ও বারকে। ওয়েটারদের সঙ্গে একটা গোপন চুক্তি করেছে অন্তরা।

ঘটনাটা অন্তরা ঘটাবে কিনা, তা নির্ভর করে পরিবেশের ওপর। মাসুদুর রহমান উপস্থিত থাকবেন না, এটা জানা থাকাতেই পরিকল্পনাটা নিয়ে এগোবার সাহস পায়। ভদ্রলোকের উপস্থিতিতে আড়ষ্টবোধ করবে, কাজেই গান গাওয়া বা মাতলামো করা, কোনটাই সম্ভব নয়। যদিও, পার্টিতে ও মাতলামো করেছে, এটা মাসুদুর রহমানকে জানানই ওর পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। তিনি জানবেন, তবে পরে জানবেন।

পার্টি শুরু হবার পর অন্তরা লক্ষ করল, প্রথম সারির স্টাফরা অনেকেই বিদেশী অতিথিদের সঙ্গে দু'এক ঢোক খাচ্ছেন, তবে বেশিরভাগই বিয়ার। শুনেছে বিয়ার খেয়ে কেউ কখনও মাতলামো করে না, কাজেই মনে মনে খানিকটা হতাশ হল অন্তরা।

ওর সঙ্গে শুভ্রকে দেখে অনেকেই প্রশ্ন করল, ছেলেটি কে? আমার ভাই, এ-কথা ভুলেও কাউকে জানাল না অন্তরা। বলল, আমার বন্ধু। শিপলু ভাইয়ের নতুন স্যুট দারুণ মানিয়েছে তাকে। চেহারাটা তো এমনিতেই চোখ ঝলসানো, একবার তাকালে দৃষ্টি ফেরানো কঠিন। অন্তরা লক্ষ করল, বেশ ক'টা সুন্দরী মেয়ে এরইমধ্যে ঘিরে ধরেছে তাকে। শুভ্রও অত্যন্ত সপ্রতিভ, সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলছে।

স্টাফরা অনেকেই অনুরোধ করল, অন্তরাকে গাইতে হবে। রাজি হচ্ছে না ও। ওর পরিকল্পনায় আছে, গান ও গাইবে, কিন্তু তার আগে মদ খেয়ে মাতাল হতে হবে ওকে। কিন্তু কেউ যদি মদ খাবার অনুরোধ না করে, খায় কিভাবে?

ন'টায় ডিনার। অপেক্ষা করছে অন্তরা। অপ্রত্যাশিতভাবে সুযোগটা এল সাড়ে আটটার দিকে। কানাডিয়ান এক বৃদ্ধ, এক বায়ার্স হাউসের প্রতিনিধি, হেঁড়ে গলায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুরু করলেন অন্তরার। তাঁর মূল বক্তব্য, ডিজাইনের কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্তরার উচিত মডেল হওয়া। বৃদ্ধ চিৎকার করে জানালেন, 'এরকম একটা ফিগার অপচয় হয়ে যাচ্ছে দেখেই মনের দুঃখে আজ তিনি মদ খেয়ে মাতাল হতে চাইছেন।'

জবাবে অন্তরা বলল, 'আপনার দুঃখে আমি কাতর, আমারও মদ খেয়ে মাতাল হতে ইচ্ছে করছে।'

ওর কথা শেষ হতে যা দেরি, কানাডিয়ান বৃদ্ধ চিৎকার জুড়ে দিলেন, 'ওয়েটার! ওয়েটার!'

ছুটে এল একজন ওয়েটার, তার সঙ্গে আগেই কথা হয়ে আছে

অন্তরার। অন্তরার হাতে একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল সে। কেউ জানল না, অন্তরাকে দেয়া গ্লাসটায় হুইস্কি নয়, আছে পানি।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে মুখ কোঁচকাল অন্তরা, যেন চিরতার পানি খেয়েছে। ওকে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে দেখে গম্ভীর, থমথমে হয়ে উঠল রীনা চৌধুরীর চেহারা। এনাম আহমেদের কানে কানে কি যেন বললেন তিনি। ম্যানেজার এনাম আহমেদও ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলেন ওর দিকে। খানিক পর উমা ওয়াঙচুকের প্রতিক্রিয়াও লক্ষ করল অন্তরা। সে গম্ভীর নয়, সকৌতুকে লক্ষ করছে ওকে। তবে অবাক হয়েছে শুভ্র, রীতিমত হা করে তাকিয়ে আছে সে। অবাক হয়েছে জাহিদ হাসানও।

গ্লাসটা শেষ হতেই ওয়েটার এসে সেটা ভরে দিল আবার। এভাবে তিন গ্লাস খাওয়ার পর মাতলামো শুরু করল অন্তরা। ইতিমধ্যে রীনা চৌধুরী উঠে এসে ওর হাত ধরে টানাটানি করেছেন একবার, খিলখিল করে হেসে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছে অন্তরা, ভিড়ের মাঝখান থেকে নড়তে চায়নি। রীনা চৌধুরী যে আড়ালে নিয়ে গিয়ে ওকে ধমক দিতে চান, এটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি ওর।

কেউ অনুরোধ করবে, অপেক্ষায় আছে অন্তরা। অবশেষে, ডিনার শুরু হবার মিনিট দশেক আগে, কে যেন বলল, 'অন্তরা গাইছে না কেন?'

দ্বিতীয়বার বলতে হল না, গ্যালারির খানিকটা ওপরে উঠে গাইতে শুরু করল অন্তরা। প্রথমে একটা বাংলা গান গাইল ও। তারপর একটা ইংরেজি। ওর দ্বিতীয় গান শেষ হয়ে এসেছে, হাততালি দিচ্ছে সবাই, টেবিল চাপড়াচ্ছে, শিসও দিচ্ছে কেউ কেউ, এই সময় অকস্মাৎ সমস্ত শব্দ থেমে গেল। হকচকিয়ে গেল অন্তরা, ব্যাপারটা কি? তারপর দেখতে পেল ও। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন মাসুদুর রহমান, পাশে উম্মে জোহরা।

সিনিয়র স্টাফরা ছুটে গেলেন তাঁর দিকে। তাঁদের সাথে নিচু গলায় কথা বললেন তিনি। জোর করে হাসলেনও একটু। তারপর সবাইকে নিয়ে হেঁটে এলেন ডিনার টেবিলের দিকে। দেখাদেখি সবাই লম্বা টেবিলের দিকে এগোল। মাথা নিচু করে গ্যালারি থেকে নেমে এল অন্তরাও, তবে হাঁটার সময় এলোমেলো ভাবে পা ফেলতে ভুল করল না।

টেবিলের মাথায় দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটা ভাষণ দিলেন মাসুদুর রহমান। প্রতিশ্রুতি দিলেন, কুয়ালা ফ্যাশন হাউস দেশীয় ঐতিহ্যকে মর্যাদা দেয়ার চেষ্টা করবে। সংশিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করলেন। সবশেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন সর্বস্তরের স্টাফদের প্রতি। এরপরই শুরু হল ডিনার।

ডিনারে বসে কিছুই খাওয়া হল না অন্তরার। মাতল্লামোর অভিনয় করতে হচ্ছে, সেটা কারণ নয়। কারণ হল, মাসুদুর রহমান হঠাৎ উদয় হবার পর শুভ্রকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না। একশোর ওপর অতিথি, অনেকগুলো টেবিল জোড়া লাগিয়ে দু'সারিতে বসেছে সবাই—বারবার সবার ওপর চোখ বুলিয়েও শুভ্রকে খুঁজে পেলো না ও। প্রথমে ভাবল, বোধহয় বাথরুমে গেছে। কিন্তু ডিনার শেষ হয়ে এল, শুভ্রর দেখা নেই। আশ্চর্য, ওকে কিছু না বলে কোথায় গেল সে?

এক সময় শেষ হল ডিনার। অতিথিরা একে একে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন। বাকি থাকল শুধু স্টাফরা। তাদের মধ্যে শুভ্র নেই। অন্তরার ইচ্ছে হল সীমা ভাবীকে ফোন করে জিজ্ঞেস করে, শুভ্র ওখানে গেছে কিনা। কিন্তু ফোন করার সুযোগ পাওয়া কঠিন। এই সময় হঠাৎ ওর সামনে এসে দাঁড়ালেন মাসুদুর রহমান। 'তোমার সাথে আমার কথা আছে, অন্তরা। একটু অপেক্ষা করো, আমি তোমাকে গাড়ি করে পৌছে দেব।'

'আমাকে পৌছে দেবেন আপনি?'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর সুরে বললেন মাসুদুর রহমান। 'এই অবস্থায় নিশ্চয়ই তুমি একা বাড়ি ফেরার কথা ভাবছ না?'

'একা কোথায়, আমার সাথে শুভ্র আছে না!'

'শুভ্র? না, সে নেই। এখনও বুঝতে পারোনি, আমাকে দেখেই পালিয়েছে সে?'

'আপনি ওকে চেনেন না।' প্রতিবাদ করল অন্তরা। 'কাউকে দেখে পালাবার ছেলে শুভ্র নয়। কাছেই কোথাও আছে, এখনি এসে পড়বে। আমি তার সাথেই বাড়ি ফিরব।'

'না, তুমি আমার সাথে ফিরবে,' বলে অন্তরার হাতটা খপ করে চেপে ধরলেন মাসুদুর রহমান। স্টাফরা সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল, তাদের চোখের সামনে অন্তরাকে টানতে টানতে সিঁড়ির দিকে এগোলেন তিনি। অন্তরা লক্ষ করল, উম্মে জোহরাও ওদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে।

বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে নিজের সাদা গাড়িতে অন্তরাকে উঠতে বাধ্য করলেন মাসুদুর রহমান। সামনের সীটে ওকে তুলে নিয়ে নিজে বসলেন ওর পাশে। ওর প্রতিবাদে কান না দিয়ে ছেড়ে দিলেন গাড়ি।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে দেখে চুপ করে গেল অন্তরা। সারাটা পথ দু'জনের কেউই কোন কথা বলল না। এলিফেন্ট রোডে, ফ্ল্যাটের সামনে থামল টয়োটা। অন্তরার সঙ্গে মাসুদুর রহমানও নামলেন। অনুরোধের অপেক্ষায় থাকলেন না, অন্তরার পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন। চাবি খুলে নিজের কামরায় ঢুকল অন্তরা, আলো জ্বালল, দেখল চৌকাঠে হেলান দিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক।

এসেছেনই যখন, ভেতরে ঢুকুন,' বলল অন্তরা। 'বলেন তো চা খাওয়াই।'

'না, ও-সব দরকার নেই,' বললেন মাসুদুর রহমান। 'আমি তোমাকে ক'টা কথা বলে চলে যাব।'

'কথা বলতে হলে ভেতরে ঢুকতে হবে,' বলল অন্তরা। 'কারও কাছে এলে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে নেই।'

নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকলেন মাসুদুর রহমান, দরজাটা বন্ধ করে বিছানার এক কোণে বসলেন। থমথম করছে চেহারা।

'মনে হচ্ছে আমার ওপর খুব রেগে আছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল অন্তরা। মুখে হাতচাপা দিয়ে হাসি চাপার চেষ্টা করছে। বসেনি ও, মেঝেতে দাঁড়িয়ে সামান্য টলছে। 'কারণ, আমি মদ খেয়েছি, সবাইকে নিয়ে হৈ-চৈ করেছি?'

মুখ তুলে তাকালেন মাসুদুর রহমান। 'তোমার যে এতটা অধপতন হতে পারে, এ আমার ধারণার বাইরে ছিল, অন্তরা। আশ্চর্য, এরকম একটা কাণ্ড ঘটাতে তোমার ভয় লাগল না?'

'আপনার মধ্যে আসলে রসকষ বলতে কিছু নেই। ইংরেজিতে যাকে বলে সেন্স অব হিউমার, আপনার ভেতর ওটার সাংঘাতিক অভাব।'

'ও, আচ্ছা। আমি তাহলে একটা নিরস মানুষ?'

'নিরস শুধু আমার বেলায়,' বলল অন্তরা। 'আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে ব্যাপারটা আপনি দারুণ উপভোগ করতেন। আমার বেলায় খারাপ লাগছে, কারণ আমাকে আপনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে দেখতে চান। যেহেতু আপনি আমাকে চাকরি দিয়েছেন, তাই ধরে নিয়েছেন আমার ওপর একা শুধু আপনার অধিকার আছে, একা শুধু আপনিই আমার ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারবেন। আজ যদি আমার জায়গায় উম্মে জোহরা মদ খেয়ে মাতলামো করত, আপনি হাসতেন…।'

'এইমাত্র না বললে, আমার ভেতর সেন্স অব হিউমার বলে কিছু

নেই? আগে ঠিক করো, কি বলতে চাও।'

'বলতে চাই, আমার বেলায় আপনি একটা কাঠখোট্টা। কেন, মিস্টার মাসুদুর রহমান? আমার বেলায় আপনি এত নিষ্ঠুর কেন?'

'আমি নিষ্ঠুর? আর তুমি? তুমি কি?'

'আমি? শুনতে চান? আমি আপনার তৈরি নিষ্ঠুর পরিবেশের শিকার।' টলে উঠল অন্তরা। খপ করে খাটের স্ট্যাণ্ডটা ধরে ফেলে সামলাল নিজেকে।

'তুমি মাতলামো করছ,' বলে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মাসুদুর রহমান। 'কাজেই তোমার সাথে কথা বলার কোন মানে হয় না।' দরজার দিকে এক পা এগিয়ে আবার ফিরলেন অন্তরার দিকে। 'যাবার আগে শুধু একটা কথা বলে যাই। মদ খেলেও, আশা করি আমার কথার গুরুত্ব বুঝতে পারবে তুমি। আজকের ঘটনা আমি ভুলে যেতে পারি, যদি কথা দাও আর কোনদিন এরকম ঘটবে না। যদি ঘটে, যদি ঘটে...,' কথাটা শেষ করতে পারলেন না বা করলেন না, অন্তরার দিকে পিছন ফিরে আবার এগোলেন দরজার দিকে।

'দাঁড়ান!' পিছন থেকে তীক্ষ্ণ গলায় বলল অন্তরা। 'এরকম ঘটনা আবার যদি ঘটে, কি করবেন বলে যান। আমার চাকরিটা থাকবে না, এই কথাই বলতে চান তো?'

'ছি-ছি, অন্তরা! তোমার সাথে আমার কি শুধুই চাকরির সম্পর্ক? কি করে ভাবতে পারলে যে... ' আবার ওর দিকে ফিরলেন মাসুদুর রহমান।

'আরও কোন সম্পর্ক আছে নাকি? আশ্চর্য, আর কোন সম্পর্ক থাকলে আমি তা জানি না কেন?'

'তুমি আমাকে জানানর সময় বা সুযোগ দাওনি।'

'তাই? সময় ও সুযোগ দিইনি? তা নিন না, সুযোগ নিন। এখুনি নিন। বলে ফেলুন, আপনার সাথে আর কিসের সম্পর্ক আমার।'

'তোমার এই অবস্থায় আজ আমি সে-কথা বলতে চাই না।' ঘুরলেন মাসুদুর রহমান, হাত বাড়িয়ে খুলে ফেললেন দরজা।

'এই অবস্থা মানে কি? ভেবেছেন আমি সত্যি সত্যি মদ খেয়েছি?' অন্তরার গলার আওয়াজ এত শান্ত ও স্বাভাবিক, অবাক হয়ে ঝট করে ওর দিকে ফিরলেন মাসুদুর রহমান। 'মদ আমি খাইনি, ওদের সাথে মজা করার জন্যে খাবার ভান করেছি মাত্র। কাজেই, কিছু যদি বলার থাকে, বলতে পারেন।'

পিছন হাত বাড়িয়ে দরজাটা বন্ধ করলেন মাসুদুর রহমান। এগিয়ে এসে অন্তরার সামনে দাঁড়ালেন তিনি। 'তোমার এরকম উদ্ভট আচরণের মানে?'

'উদ্ভট কেন বলছেন? মানুষের জীবনে হাসি-আনন্দ থাকতে নেই?'

'শুধু আজকের কথা বলছি না। মাঝে মধ্যেই তুমি উদ্ভট আচরণ করো। তুমি খুব সুন্দরী, যুবকরা তোমাকে পেতে চাইবে এটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি এমন আচরণ করো যে...।'

গলা একটু নামাল অন্তরাও। 'নিজের কথা ভেবেছেন কখনও? আপনি নিজেও যে উদ্ভট আচরণ করেন, বুঝতে পারেন?'

ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল মাসুদুর রহমানের। 'মানে?'

'আপনার আজকের আচরণের কথাই ধরুন,' বলল অন্তরা। 'জোহরার সামনে আপনি আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। এর মানেটা কি? জোহরা আপনাকে বিয়ে করতে চায়, সবাই জানে। কিন্তু আপনি তাকে হ্যাঁ-ও বলবেন না, না-ও বলবেন না। ঝুলিয়ে রাখবেন। আজ সেজন্যেই তাকে দেখিয়ে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন আপনি, বিয়ের ব্যাপারে তাকে হতাশ করার জন্যে। আমার এ অভিযোগ আপনি অস্বীকার করতে পারবেন? তাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে আমাকে আপনি একটা ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছেন।'

'আচ্ছা, বলতে পারো, কি করেছি আমি যে আমার ওপর এতটা

খেপে আছ তুমি?' শান্ত গলায় জানতে চাইলেন মাসুদুর রহমান। 'রীতিমত প্রলাপ বকছ তুমি, কারণটা কি?'

এই প্রথম ভদ্রলোকের চোখের তারায় বেদনার ছায়া পড়তে দেখল অন্তরা। বুকটা কেঁপে উঠল ওর। 'খেপে আছি কারণ...।'

'হ্যাঁ, বলো।'

'কারণ আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না। কারণ শুভ্রকে আপনি সহ্য করতে পারেন না। শুভ্র শুধু আমার ভাই নয়, তারচেয়ে অনেক বেশি কিছু। সেদিন রাতে এই ফ্ল্যাটে যা ঘটেছিল, সে-কথা আপনাকে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোনদিনই সম্ভব নয়...।'

'আর কিছু?'

তাঁর ওপর আর কি কারণে খেপে আছে অন্তরা? অনেক খুঁজেও আর কোন কারণ খুঁজে পেল না ও। জোহরার কথা মনে পড়ল, সে ওকে অপমান করেছে। কিন্তু জোহরার কথা তুলে নিজেকে সস্তা ও ঈর্ষাকাতর হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চায় না ও। তারপর মনে পড়ল। 'ফুলের তোড়া। একটা ফুলের তোড়া নিয়ে কি কাণ্ডই না করলেন!'

চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল, তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইলেন মাসুদুর রহমান, 'কে পাঠিয়েছিল ওটা?'

'কি আসে যায় তাতে?'

'আমার আসে যায়,' বলে এগিয়ে এলেন মাসুদুর রহমান, অন্তরার একটা হাত ধরে ঝাঁকি দিলেন, তারপর কাছে টানলেন ওকে। 'বলো, কে পাঠিয়েছিল ওটা?'

ওর হাত ধরায় থরথর করে কাঁপতে শুরু করল অন্তরা। সারা শরীর অবশ হয়ে এল ওর। ইচ্ছে হল, মাসুদুর রহমানের বুকের ওপর নেতিয়ে পড়ে। 'হাত ছাড়ুন,' খসখসে গলায় বলল ও। 'উফ্, ব্যথা লাগছে!'

মুঠোটা ঢিলে করলেন মাসুদুর রহমান, কিন্তু হাতটা ছাড়লেন না। 'না, তোমাকে বলতে হবে—কে পাঠিয়েছিল ফুলের তোড়াটা?' আবার

নিজের দিকে টানলেন অন্তরাকে, মুখটা নিচের দিকে নামালেন, যেন চুমো খেতে যাচ্ছেন ওকে।

'কে আবার, শুভ্র পাঠিয়েছিল!'

অন্তরার হাতটা ছেড়ে দিলেন মাসুদুর রহমান। হঠাৎ যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছেন তনি। 'তুমি প্রথম থেকেই জানতে?'

'হ্যাঁ, জানতাম। আপনি তাকে সহ্য করতে পারেন না বলে ভান করেছিলাম জানি না,' মিথ্যে কথা বলছে অন্তরা।

'কিন্তু...এ অন্যায়, অন্তরা!'

'অন্যায়? কেন? আমার কোন বন্ধু থাকতে নেই? তারা আমাকে ফুল পাঠাতে পারে না?'

'শুভ্রর মত বন্ধু থাকতে নেই, অন্তরা,' নিচু গলায় বললেন মাসুদুর রহমান। 'শুভ্রর মত একটা নষ্ট ছেলে তোমাকে এভাবে প্ররোচিত করতে পারে না। তাকে আমি একবার সাবধান করে দিয়েছি। এরপর যদি আবার... ।'

'সাবধান করে দিয়েছেন মানে?'

'কালও তার সাথে দেখা হয়েছে আমার। বলে দিয়েছি, সে যদি তোমার পিছু না ছাড়ে, তার কপালে খারাবি আছে।'

হতভম্ব হয়ে গেল অন্তরা। 'এত সাহস আপনার? সে আমার ভাই, তাকে আপনি হুমকি দেন? আপনার স্পর্ধা তো কম নয়।'

'আমি যা ভাল বুঝেছি, তাই করেছি... ।'

'আমি চাই, এই মুহূর্তে আপনি চলে যান,' কেঁদে ফেলল অন্তরা। 'আপনার সাথে আর কোনদিন আমি কথা বলব না। একদিন মনে হয়েছিল...মনে হয়েছিল... ।'

'বলো।'

'মনে হয়েছিল, আমি বুঝি আপনার প্রেমে পড়েছি। কিন্তু আপনি আসলে আমাকে ভালবাসেন না, আমাকে আপনার দরকার নেই। প্লীজ,

যান আপনি! আমি একটু একা থাকতে চাই।'

কয়েক সেকেণ্ড নড়লেন না মাসুদুর রহমান। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন অন্তরার দিকে। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, অন্তরা। আমি চলে যাচ্ছি। তুমি আসলে ক্লান্ত। তোমার ছুটি দরকার। আজ থেকে সাতদিন ছুটি পেলে তুমি। নিজের সাথে বোঝাপড়া করার একটা সুযোগ নাও। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো। গেলাম।'

দরজা বন্ধ করে বিছানায় বসে থাকল অন্তরা, যেন একটা পাথুরে মূর্তি। মাসুদুর রহমান এতটা ঈর্ষাকাতর, ওর ধারণা ছিল না। শুভ্রর সঙ্গে দেখা করে তাকে হুমকি দিয়েছেন! আশ্চর্য! এরকম একটা সন্দেহপ্রবণ মানুষকে আমি ভালবাসলাম কেন? ওর মনে হল, ভদ্রলোক শুধু হুমকি দিয়ে ক্ষান্ত হবেন না। তাঁর টাকা আছে, আছে বিপুল ক্ষমতা, একা নিজে ওর ওপর কর্তৃত্ব ও অধিকার ফলাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। ওর জীবনে আর কারও অস্তিত্ব সহ্য করতে রাজি নন। একটা ভয় জাগল ওর মনে। শুভ্রর জন্যে ভদ্রলোক না একটা বিপদ হয়ে ওঠেন।

আর শুভ্রই বা ব্যাপারটা ওকে জানায়নি কেন? জানালে আজ তাকে নিয়ে পার্টিতে যেত না ও। আচ্ছা, তাহলে মাসুদুর রহমানকে দেখেই পার্টি থেকে পালিয়ে গেছে শুভ্র। এরপর আর ওখানে চাকরি করা সাজে না ওর, সিদ্ধান্ত নিল অন্তরা। ছুটিটা পেয়ে ভালই হয়েছে। নারায়ণগঞ্জে দাদা-দাদীর কাছে ক'দিন বেড়ানো হবে। তারপর সিদ্ধান্ত নেবে কুয়ালা ফ্যাশন হাউসে ফিরে যাবে কিনা। আপাতত ওর পালিয়ে যাওয়াই দরকার। গোটা ব্যাপারটা এলোমেলো হয়ে গেছে, এ আর নতুন করে সাজানো সম্ভব বলে মনে হয় না। মাসুদুর রহমানকে আঘাত করতে চেয়েছিল ও, জানে তাঁর সঙ্গে অসম্ভব খারাপ ব্যবহার করেছে ও, কিন্তু এ-ও তো সত্যি যে মাসুদুর রহমানও ওকে কম আঘাত করেননি। আঘাত, পাল্টা আঘাত, একে যদি প্রেম বলে, তার কাছ

থেকে পালাতেই চায় অন্তরা। যা ঘটে গেছে, তারপর আর মাসুদুর রহমানকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তর্কের খাতিরে ধরা যাক্, কাল সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিজের আচরণের জন্যে ক্ষমা চাইল ও। কিন্তু উনি যে ক্ষমা করবেন, তার নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া, ওর তুলনায় তাঁর অপরাধ আরও অনেক বেশি, তিনি কি নিজের ভুল স্বীকার করবেন?

এ-সব কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল অন্তরা। জানে না, কাল সকালে কি মর্মান্তিক একটা খবর শুনতে হবে ওকে।

আট

পরদিন সকালে সীমা ভাবীর তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার শুনে ঘুম ভাঙল অন্তরার। বিছানার ওপর ধড়মড় করে উঠে বসল ও, বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার দিয়ে চুপ করে গেছে সীমা, কয়েক সেকেণ্ড আর কোন শব্দ নেই। তারপরই আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। অন্তরার প্রথমে মনে হল, শিপলু ভাইয়ের কিছু হয়েছে। সম্ভবত আবার হার্ট অ্যাটাক। কিন্তু না, সীমা ভাবীর কান্নার ফাঁকে শিপুল ভাইয়ের উদ্বিগ্ন গলাও শুনতে পেল ও, ব্যাকুলস্বরে কাকে যেন কি জিজ্ঞেস করছে। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল, ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল ওর। নারায়ণগঞ্জে ওর বুড়ো দাদা-দাদী রয়েছেন, তাঁদের কিছু হল নাকি? চাদরের ভাঁজে কোথায় চাপা পড়েছে, ওড়নাটা দেখতে পেল না অন্তরা। ওড়না ছাড়াই দরজা খুলে বেরিয়ে এল

প্যাসেজে, ছুটল শিপলু ভাইদের ঘরের দিকে। ছুটছে, এই সময় ওর মনে পড়ল শুভ্রর কথা। তার কিছু হয়নি তো? রাতে খুব খারাপ একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে ও। শুভ্রকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে এক লোক, দেখতে পেয়ে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্তরা, ধস্তাধস্তির ফাঁকে দেখতে পেল লোকটা আর কেউ নয়, মাসুদুর রহমান। আততায়ীকে চিনতে পেরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল অন্তরা, তারপর তার ঘুম ভেঙে যায়। ঘড়িতে তখন রাত আড়াইটা। এক গ্লাস পানি খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে অন্তরা। দুঃস্বপ্ন দুঃস্বপ্নই, তেমন গুরুত্ব দেয়নি।

'শিপলু ভাই! ভাবী! কি হয়েছে?' বলতে বলতে ওদের ঘরে ঢুকে পড়ল অন্তরা।

'ঠিক আছে, এখুনি আমি আসছি,' বলে ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখল শিপলু ভাই, অন্তরা দেখল অপর হাত দিয়ে সীমা ভাবীকে জড়িয়ে ধরে আছে।

চোখের পানিতে ভিজে গেছে মখ, এখনও গলা ছেড়ে কাঁদছে সীমা ভাবী। 'বিপদের সময় অস্থির হতে নেই, সীমা,' বলল শিপলু। 'এখুনি হাসপাতালে যেতে হবে আমাকে। টাকা বের করো। তুমিও চলো, শুভ্রকে রক্ত দিতে হবে। এখন কান্নাকাটি করলে ওর কোন উপকার হবে না।'

'কি...? কি...?' গলাটা বুজে এল অন্তরার।

'কাল রাত এগারোটার দিকে কারা যেন ছুরি মেরেছে শিপলুকে,' অন্তরাকে বলল শিপলু। 'ফুলবাড়িয়ার কাছে, একটা গাঁজার আড্ডায়।' ছলছল করছে তার চোখ। 'নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়েছে...বোধহয় বাঁচবে না।' স্ত্রীকে শান্ত হবার পরামর্শ দিলে কি হবে, এবার আর নিজেকেই ধরে রাখতে পারল না সে। 'আমার একটি মাত্র ভাই...,' বলেই হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল।

অন্তরার ইচ্ছে হল এই মুহূর্তে দেয়ালে মাথা ঠুকে আত্মহত্যা করে।

থরথর করে কাঁপছে সে। মনে পড়ে গেল, মাত্র পরশুদিন মাসুদুর রহমান শুভ্রকে বলেছেন, ওর পিছু না ছাড়লে তার কপালে খারাবি আছে। আর কিছু ভাবতে পারল না অন্তরা, মাথাটা ঘুরে উঠল। পড়ে যাচ্ছিল, সীমা ভাবী ছুটে এসে ধরে ফেলল ওকে। শিপলু ভাইকে ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে নিজেকে সামলে নিয়েছে সে। অন্তরাকে বিছানার ওপর বসিয়ে দিয়ে আলমারির তালা খুলল, এখনও ফোঁপাচ্ছে। ধরা গলায় বলল, 'অন্তরা, শক্ত হও ভাই। তোমার ভাইকে শান্ত হতে বলো।' ব্যাগে টাকা ভরল সে। 'দশ হাজার টাকা নিচ্ছি,' স্বামীর দিক থেকে অন্তরার দিকে তাকাল। 'তুমি থাকো, ভাই, আমরা হাসপাতাল থেকে ফোন করব।'

ডুকরে কেঁদে উঠল অন্তরা। বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'না! আমিও যাবো!'

মাত্র সাতটা বাজে, নিচে নেমে এসে একটা বেবি ট্যাক্সি নিল ওরা। ইতিমধ্যে তিনজনই ওরা নিজেদেরকে সামলে নিয়েছে। শিপলু জানাল, পিজি হাসপাতালে আছে শুভ্র। রাত চারটে পর্যন্ত অপারেশন থিয়েটারে ছিল সে, চেরা পেট কোনরকমে সেলাই করা সম্ভব হয়েছে, তবে ডাক্তাররা এখনও আশাবাদী নন। প্রচুর রক্ত দিতে হয়েছে তাকে, আরও দিতে হবে। সম্ভবত আরেকবার অপারেশনও করতে হবে। সকাল ছ'টার দিকে একবার কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে জ্ঞান ফিরেছিল। কথা থামিয়ে কয়েক সেকেণ্ড অন্তরার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল শিপলু।

'কিছু বলেছে সে?' জানতে চাইল সীমা ভাবী। 'কারা ছুরি মেরেছে, চিনতে পেরেছে তাদের?'

'শুধু দুটো নাম উচ্চারণ করেছে শুভ্র,' রুমাল দিয়ে চোখ দুটো চেপে ধরে বলল শিপলু। 'অন্তরা আর মাসুদ সাহেব। তারপর আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে।'

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল অন্তরার। 'অন্তরা...আর...মাসুদ সাহেব...এর মানে কি?' আপনমনে বিড়বিড় করল সে।

'হাসপাতাল থেকে আমাকে ফোন করেছিলেন পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টর। নাম দুটো আমার পরিচিত কিনা জানতে চাইলেন। বললাম, অন্তরা আমার বোন, আর মাসুদুর রহমান আমার বোনের বস্। শুনে উনি বললেন, যাক, পরিচয় সম্পর্কে কনফার্ম হওয়া গেল। ব্যাপারটা বুঝলাম না। কারা ছুরি মেরেছে না বলে, শুভ্র শুধু তোদের নাম উচ্চারণ করায় পুলিশও খুব অবাক হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেউ গ্রেফতার হয়েছে কিনা। বলল, গাঁজা আর হিরোইন বিক্রি করে যে লোকটা, একা শুধু তাকেই পেয়েছে ওরা। একটা পান-বিড়ির দোকান চালায় লোকটা, ওখান থেকে বিক্রি করে ও-সব। দোকান ফেলে পালাচ্ছিল, টহল পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। কিন্তু সে বলছে, শুভ্রকে যারা ছুরি মেরেছে তাদেরকে সে চেনে না।'

মাত্র কয়েক মিনিট লাগল হাসপাতালে পৌঁছুতে। প্রথমে ইমার্জেন্সীতে গেল ওরা, তারপর অপারেশন থিয়েটারের কাছে। জানা গেল, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়েছে শুভ্রকে, এখনও বিপদমুক্ত নয়। শরীরের ভেতর রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্যে আবার তার অপারেশন দরকার হতে পারে। একজন ডাক্তার জানালেন, আরও রক্ত লাগবে, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন।

'আমি রক্ত দেব,' একজন নার্সের সঙ্গে রক্তের নমুনা পরীক্ষা করার জন্যে চলে গেল অন্তরা। রক্ত দেয়ার পর ফিরে এসে দেখল, শিপলু ভাইকে যিনি ফোন করেছিলেন, সাব-ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক, সীমা ভাবীর সঙ্গে নিচু স্বরে কথা বলছেন। করিডরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শিপলু ভাই, দেয়ালে কপাল ঠেকিয়ে। সীমা ভাবী ও সাব-ইন্সপেক্টর, দু'জনেই কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

নার্স এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের মধ্যে আর কে রক্ত দেবেন?

কিনে দেয়ার চেয়ে নিজেরা দিতে পারলে ভাল হয়।'

দেয়াল থেকে কপাল তুলে শিপলু বলল, 'চলুন।' নার্সের সঙ্গে রওনা হল সে, ওদের সঙ্গে সাব-ইন্সপেক্টরকেও যেতে দেখল অন্তরা।

'শুভ্রকে একবার দেখতে পারি না আমরা?'

'ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলেন আমাকে। বললেন, দেখা করার সময় হলে আমরাই বলব। যতটুকু বুঝতে পারছি, অপারেশন থিয়েটার তাকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি হচ্ছে।' ফুঁপিয়ে উঠল সীমা।

'অপারেশন থিয়েটার নয়, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে...।'

'না,' বলল সীমা। 'এইমাত্র আবার ওকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

সাংঘাতিক ভয় পাচ্ছে অন্তরা, সীমা ভাবীর দৃষ্টির মধ্যে কি যেন একটা আছে। ও জানতে চাইল, 'ভাবী, সাব-ইন্সপেক্টরের সাথে কি কথা হল তোমার?'

'যা বললেন, মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারিনি,' বলল সীমা। 'শুভ্রকে ছুরি মারার পর ফুলবাড়িয়ায় ছুটোছুটি শুরু হয়ে যায়, যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায় লোকজন। টহল পুলিশ খবর পেয়ে ছুটে যায়, তখনই ধরে ফেলে গাঁজার দোকানদারকে। তাকে নিয়ে দোকানের সামনে এসে দেখে রক্তাক্ত শুভ্রকে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছেন...।'

'থামলে কেন, ভাবী?' ব্যাকুলকণ্ঠে জানতে চাইল অন্তরা।

'শুভ্রকে গাড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে তোমার বস্, মাসুদুর রহমান,' অন্তরার দিকে তাকিয়ে বলল সীমা। 'অত রাতে ওখানে তিনি কি করছিলেন বলো তো? পুলিশকে অবশ্য বলেছেন, শুভ্রর খোঁজেই ওখানে গিয়েছিলেন তিনি, গাড়ি থেকে নেমেই দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে সে। শুভ্রর খোঁজে অত রাতে ওখানে তিনি গিয়েছিলেন কেন?'

এ-সব কি ঘটছে আমার জীবনে! এ-সব কি সত্যি, না আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি? অন্তরার মাথার ভেতর সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। ওর মন নিঃশব্দে চিৎকার করছে, না, এ অসম্ভব! মাসুদুর রহমান শুভ্রকে খুন করতে পারেন না। তিনি নিতান্তই একজন নিরীহ ভদ্রলোক।

কিন্তু মনের ভাবাবেগ বর্জিত আরেকটা অংশ অঙ্ক করতে বসে গেছে। মাসুদুর রহমান চান না অন্তরা ও শুভ্র পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করে। অন্তরাকে বারণ করেছিলেন, কিন্তু অন্তরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, শুভ্রকে ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। শুভ্রকেও নিষেধ করেছেন তিনি, কিন্তু সে-ও তাঁর কথা শোনেনি। শুভ্রকে তিনি নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ধরে নিয়েছেন, সেজন্যেই ওর ওপর তাঁর এত আক্রোশ। আক্রোশটা যে মনে মনে পুষে রেখেছিলেন, তা-ও নয়, প্রকাশ্যেই হুমকি দিয়ে বলেছেন, শুভ্র যদি অন্তরার পিছু না ছাড়ে তাহলে তার কপালে খারাবি আছে। হ্যাঁ, নেহাতই নিরীহ ভদ্রলোক, কাজেই নিজের হাতে কাউকে খুন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর টাকা আছে, আর টাকায় কি না হয়। শুভ্রকে ছুরি মারার জন্যে নিশ্চয়ই কয়েকজন গুণ্ডাকে ভাড়া করেন তিনি। তারাই তাঁর কথামত শুভ্রকে ছুরি মেরে পালিয়েছে। তার পরের ঘটনাটা মাসুদুর রহমানের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় বহন করে। একই সঙ্গে দুটো উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে ফুলবাড়িয়ায়, গাঁজার আড্ডায় গিয়েছিলেন তিনি—নিশ্চিতভাবে জানা, শুভ্র সত্যি সত্যি মারা গেছে কিনা, পুলিশ ও অন্তরাকে বোঝান যে তিনি নিরপরাধ। শুভ্র যে-মুহূর্তে ছুরি খেয়েছে, তার এক মুহূর্ত পর খুনী সেখানে যাবে না, এটাই ধরে নেবে পুলিশ। গুণ্ডা লাগিয়ে খুন করার চেষ্টা, তারপর আহত শুভ্রকে নিজেই গাড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে আসা, তাঁর সাহস ও চাতুর্যেরই পরিচয় বহন করে। এ-সবই তিনি একটি মাত্র উদ্দেশ্যে করেছেন, কেউ যাতে তাঁকে সন্দেহ করতে না পারে।

'সকাল পর্যন্ত এখানেই ছিলেন ভদ্রলোক,' সীমা বলল। 'আমরা আসার খানিক আগে চলে গেছেন, বলে গেছেন আবার আসবেন। শুভ্রকে রক্ত দিয়েছেন, ওষুধ কেনার জন্যে টাকাও দিয়েছেন...।'

রক্ত দিয়েছেন? মাসুদুর রহমান শুভ্রকে রক্ত দিয়েছেন?

অন্তরার মন দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। মনের একটা অংশ মাসুদুর রহমানকে নিরপরাধ ভাবছে। আরেকটা অংশ অঙ্ক কষে বোঝাতে চাইছে, শুভ্রর এই অবস্থার জন্যে তিনিই দায়ী।

একজন নার্স এসে জিজ্ঞেস করল, 'অন্তরা কে?' মুখ তুলল অন্তরা। 'আপনার ফোন, আমাদের অফিসে।'

অন্তরা নড়ল না। 'কার ফোন?'

'মাসুদুর রহমান নামে এক ভদ্রলোক কথা বলতে চাইছেন।'

'ভাবী, তুমি যাও,' বলল অন্তরা। 'আমি এখন কারও সাথে কথা বলতে পারব না।'

নার্সের সঙ্গে চলে গেল সীমা। প্রায় সাত মিনিট পর করিডরে বেরিয়ে এল সে। 'তোমার বস্ থানা থেকে ফোন করেছিলেন। শুভ্র কেমন আছে জানতে চাইলেন...।'

কি এক আতঙ্কে গলাটা বুজে এল অন্তরার, ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'থানায় কেন?'

'থানায় কেন...তা তো বলতে পারব না! বললেন, এখান থেকে সরাসরি থানায় গেছেন তিনি, আরও কিছুক্ষণ থাকবেন, তারপর আবার এখানে আসবেন। তোমার সাথে কথা বলতে চাইলেন। বললাম, ও খুব মুষড়ে পড়েছে, কারও সাথে কথা বলতে চাইছে না।'

'পুলিশ কি থানায় আটকে রেখেছে ভদ্রলোককে?' কেঁপে গেল অন্তরার গলা। 'শুভ্রকে ছুরি মারার জন্যে তাঁকে দায়ী করা হচ্ছে?'

'মানে? একি বলছ তুমি?' সীমা হতভম্ব। 'তোমার বস্ কেন...?'

অন্তরা ঠোঁট কামড়ে কান্না চাপার চেষ্টা করল। 'আমি শুভ্রর সাথে

মেলামেশা করি, উনি তা পছন্দ করতেন না।'

'পছন্দ করতেন না? কেন? ভদ্রলোকের সাথে তোমার…,' হঠাৎ এগিয়ে এসে অন্তরার একটা হাত চেপে ধরল সীমা। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। সব কথা খুলে বলো আমাকে, অন্তরা। কি ঘটেছে?'

'কি ঘটবে!' নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে অন্তরা। 'আমার ওপর ভদ্রলোকের সম্ভবত দুর্বলতা আছে। বোধহয় সেজন্যেই উনি চান না যে আমি আর শুভ্র মেলামেশা করি। তাই ভাবছি…।'

'তোমার সাথে ভদ্রলোকের এরকম একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, কই, আমাকে তো বলোনি!' ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল সীমার। 'তা না হয় হল, কিন্তু তাই বলে তোমার এ-কথা কেন মনে হবে যে শুভ্রকে উনি ছুরি মারবেন?'

'মারবেন তা বলব কেন!' প্রতিবাদ করল অন্তরা। 'শিপলু ভাই বলল, জ্ঞান ফেরার পর ভদ্রলোকের নাম বলেছে শুভ্র। তারপর এখন শুনছি থানায় রয়েছেন উনি, তাই ভাবলাম…।'

'শুভ্র ভদ্রলোকের নাম বলেছে…তার অনেক কারণ থাকতে পারে। সে তো তোমার নামও বলেছে। আর থানায় রয়েছেন, তারও অনেক কারণ থাকতে পারে।'

মুখে কথা নেই, নিঃশব্দে কাঁদছে অন্তরা। একটু পরই ফিরে এল শিপলু, বলল, 'ভাগ্য ভাল যে আমাদের সবার রক্তের গ্রুপই এক। দরকার হলে তুমিও দিতে পারবে, সীমা। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব বাইরে অপেক্ষা করছেন, আমাকে একবার থানায় যেতে হবে।'

বেলা ন'টার দিকে ওদেরকে জানানো হল, অপারেশন থিয়েটার থেকে আবার ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শুভ্রকে। কেমন আছে সে, জিজ্ঞেস করল ওরা। জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখে চলে গেলেন ডাক্তার।

সাড়ে ন'টার দিকে আবার হাসপাতালে এলেন মাসুদুর রহমান।

তাঁকে দেখেই একপাশে সরে গেল অন্তরা, তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। শুনতে পেল সীমা ভাবীকে বলছেন তিনি, 'আপনাদের সবাইকে এখন শক্ত হতে হবে। টাকা-পয়সার ব্যাপারে কিছু চিন্তা করবেন না, এদিকটা আমি সামলাব।' কেন, উনি কেন টাকা দেবেন, ভাবল অন্তরা, উনি শুভ্রর কে? 'শরিফ সাহেবকে থানায় রেখে এসেছি, বলে চলেছেন মাসুদুর রহমান, শরিফ সাহেব মানে শিপলু। 'যে-লোকটা ধরা পড়েছে আজই তাকে কোর্টে চালান দেয়া হবে। তাকে তিন দিনের রিম্যাণ্ডে রাখতে চাইবে পুলিশ। পুলিশের ধারণা, আমারও, শুভ্রকে যারা ছুরি মেরেছে তাদের চেনে সে, কিন্তু ভয়ে স্বীকার করতে চাইছে না।'

সীমা ভাবীর কথাও শুনতে পেল অন্তরা। 'আপনার ঋণ আমরা কোন দিন শোধ করতে পারব না। সময় মত আপনি না পৌঁছুলে শুভ্র হয়ত ওখানেই পড়ে থাকত। কিন্তু আপনি কেন টাকা-পয়সা খরচ করবেন? যতটুকু করেছেন, এটাই তো অপ্রত্যাশিত...।'

আড়ষ্ট হেসে মাসুদুর রহমান বললেন, 'ভাবী, আপনার কাছে অবশ্য অপ্রত্যাশিত মনে হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ সব কথা আপনি তো আর জানেন না।' সব কথা মানে? কান খাড়া হয়ে উঠল অন্তরার, এরপর কি বলবেন ভদ্রলোক? 'শুভ্রকে আমি ছোট ভাইয়ের মত দেখি। ওর এই বিপদে আমি চুপ করে থাকি কি করে?' অন্তরা ভাবল, ছোট ভাইয়ের মত দেখেন? সেজন্যেই শুভ্রর ইন্টারভিউ পর্যন্ত নিতে রাজি হননি? মাসুদুর রহমান বলে চলেছেন, 'শুভ্র কোথায় যায়, কি করে, কাদের সাথে মেশে, সব খোঁজ নিয়ে জেনেছি। অন্তরার ভাই, কাজেই ওর প্রতি আমারও একটা দায়িত্ব বোধ আছে।' এ-সব কি শুনছি আমি, ভাবল অন্তরা। ইচ্ছে হল, চিৎকার করে প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলার প্রবৃত্তি হল না ওর। 'সেজন্যেই শুভ্রর পিছনে লাগি আমি। ওর সাথে আমার কথাও হয়েছিল। ওকে জিজ্ঞেস

করেছিলাম, আমি যদি ওকে জাপানে একটা চাকরি দিয়ে পাঠাই, ও যাবে কিনা। বলল, জাপানে যেতে অনেক টাকা লাগে। আমি বললাম, টাকার কথা ভাবতে হবে না, ওদিকটা আমি দেখব...।'

'কিন্তু এ-সব কথা অন্তরা তো আমাকে কিছু বলেনি!' অবাক হয়ে অন্তরার দিকে তাকাল সীমা।

চট করে একবার অন্তরাকে দেখে নিয়ে মাসুদুর রহমান তাড়াতাড়ি বললেন, 'অন্তরাকে এসব আমি জানাইনি। শুভ্রকে আমি এত টাকা খরচ করে বিদেশে পাঠাতে চাইছি, এ-কথা শুনে ওর আত্মসম্মানে আঘাত লাগতে পারে, ও আমাকে ভুল বুঝতে পারে, তাই ভেবেছিলাম শুভ্র আগে চলে যাক, তারপর জানাব।'

এগিয়ে এসে সীমার কাঁধে মুখ গুঁজলো অন্তরা, মাসুদুর রহমানের দিকে তাকাল না। 'শুভ্রর কি হয় না হয়, এই সময় তুমি এ-সব ব্যাপার নিয়ে আলাপ করছ, ভাবী?' নিচু গলায়, তবে স্পষ্ট কণ্ঠে কথাগুলো বলল ও। মাসুদুর রহমানের প্রতিটি কথা মিথ্যে বলে মনে হয়েছে ওর। এই পরিবেশে এ-সব কথা বেমানানই শুধু নয়, প্রকৃত পরিস্থিতির সঙ্গে মেলেও না। শুভ্রকে যে ভদ্রলোক সহ্য করতে পারেন না; এটা ওর চেয়ে ভাল আর কে জানে? 'শুভ্র ভাল হোক মন্দ হোক, আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। তার কিছু হলে ক্ষতিটা হবে আমাদের—আমাদের একার। ভাবী, এখন শুধু দুটো কাজ করার আছে আমাদের। আল্লাহকে বলব, শুভ্রকে যেন তিনি ভাল করে দেন। আর পুলিশকে বলব, তারা যেন অপরাধীকে খুঁজে বের করে। অপরাধী যে-ই হোক, আমরা দেখতে চাই সে ধরা পড়েছে, তার বিচার হয়েছে। শুভ্রর ভবিষ্যৎ, ক্যারিয়ার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করার সময় এটা নয়।'

অন্তরাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল সীমা, তার শরীর থর থর করে কাঁপছে।

ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে থাকলেন মাসুদুর রহমান; কি যেন বলতে

গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন। অন্তরা তাঁর দিকে একবারও ভাল করে তাকায়নি, তাকালে দেখতে পেত কাল সারারাত এবং আজ এত বেলা পর্যন্ত জেগে থাকায় কি রকম ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। একটু পর নিচু গলায় বললেন তিনি, 'ভাবী, আপনারা সবাই এখানে দাঁড়িয়ে থেকে শুধু শুধু কষ্ট করছেন। একজন অন্তত বাড়ি ফিরে যান। আপনিই যান, খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিয়ে দুপুরে আসুন। আমি অন্তরার জন্যে নাস্তা কিনে আনি। দুপুরে আপনি ফিরে এলে অন্তরাকে পৌঁছে দিয়ে আমিও বাড়ি যাব...।'

'না ভাই, বাড়ি ফিরে আমি স্থির হতে পারব না,' বলল সীমা। 'তবে কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন। অন্তরা, তুমি বরং ফিরে যাও। দোকানের চাবি না পেয়ে মমতা মামুন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবেন।'

'আগে শুভ্রর জ্ঞান ফিরুক। ওর সাথে কথা না বলে কোথাও আমি যাব না।'

'জ্ঞান ফিরলেও, ডাক্তাররা ওকে কথা বলতে দেবেন বলে মনে হয় না,' বললেন মাসুদুর রহমান।

'ভাবী, শুভ্রকে একবার না দেখে আমি বাড়ি ফিরব না,' বলল অন্তরা, এখনও সীমার কাঁধে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে সে।

এরপর আর মাসুদুর রহমান কিছু বললেন না।

শুভ্রর জ্ঞান সেদিন একবার ফিরল বটে, কিন্তু তা মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। জ্ঞান ফিরলেও, মরফিনের প্রভাবে চোখ দুটো পুরোপুরি মেলতেও পারল না সে। সারাটা দিন হাসপাতালের করিডরে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। মাসুদুর রহমান একবার ফিরে গেলেন দুপুরের দিকে, ফিরলেন সন্ধের আগে। খালি হাতে নয়, ওদের তিনজনের জন্যে খাবার নিয়ে এলেন তিনি। কিন্তু অনেক সাধাসাধি করেও কাউকে কিছু খাওয়াতে পারলেন না। মমতা মামুনকে খবর দেয়া হয়েছিল, তিনিও এখন ওদের সঙ্গে রয়েছেন। রয়েছে জহির মিয়াও।

রাত এগারোটার সময় একজন ডাক্তার ওদেরকে জানালেন, অপারেশন সফল হলেও, শুভ্র বিপদমুক্ত কিনা তা আরও চব্বিশ ঘন্টার আগে বলা যাবে না। এরপর প্রায় জোর করেই ওদেরকে নিজের গাড়িতে তুললেন মাসুদুর রহমান, পৌঁছে দিলেন ফ্ল্যাটে। বিদায় নেয়ার সময় জানালেন রাত একটা পর্যন্ত হাসপাতালে থাকবেন তিনি। একটার পর থেকে থাকবে কুয়ালা ফ্যাশন হাউসের দু'জন কর্মচারী। আর 'শোভা'-র কর্মচারী জহির মিয়াও তো সারারাত থাকবে। কাল সকালেই আবার তিনি হাসপাতালে যাবেন।

ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। শিপলু বলল, 'আপনি ব্যস্ত মানুষ, কাল আর আপনার হাসপাতালে না গেলেও চলে। আপনি যা করেছেন, কোনদিন আমরা ভুলব না।'

'অন্তরার মত আমিও ছুটি নিয়েছি,' বললেন মাসুদুর রহমান। 'অন্তত শুভ্রর বিপদ না কাটা পর্যন্ত আপনাদের সাথে আছি আমি। তারপর যদি আমাকে আপনাদের উপদ্রব বলে মনে হয়...,' ম্লান হেসে কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি, আর কিছু না বলে চলে গেলেন।

'উপদ্রব...এ-কথা কেন বললেন উনি?' সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময় জানতে চাইল শিপলু।

'অন্তরার সাথে কিছু একটা হয়েছে ভদ্রলোকের,' ক্লান্ত সুরে বলল সীমা। 'তাঁর সাথে অন্তরা আজ একটা কথাও বলেনি। কি হয়েছে, অন্তরা বলতে চাইছে না। ও-সব এখন থাক। আগে সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরুক শুভ্র...।'

পরদিনও সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত হাসপাতালে কাটাল সবাই। ভিড়ও বাড়ল। কুয়ালা ফ্যাশন হাউসের অনেকেই এল হাসপাতালে, যতটা না শুভ্রকে দেখতে, তারচেয়ে বেশি অন্তরাকে সান্ত্বনা দিতে। খবর পেয়ে নারায়ণগঞ্জ থেকে ছুটে এলেন অন্তরার দাদা-দাদী অর্থাৎ শুভ্রর নানা-নানী। বিকেলের দিকে ডাক্তাররা জানালেন, শুভ্রর বিপদ কেটে গেছে,

তবে আরও অন্তত তিন দিন তাকে কথা বলতে দেয়া হবে না। এই মুহূর্তে উত্তেজিত হলে শুভ্রর ক্ষতি হতে পারে, তাই কেউ তাকে দেখতে যেতেও পারবে না। তারপরও হাসপাতাল থেকে ওরা কেউ নড়ল না। দু'দিন পর থেকে পালা করে হাপাতালে থাকল ওরা। সকালে যদি অন্তরা থাকে তো বিকেলে থাকে সীমা ও শিপলু। আরও দিন দুই পরে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে বের কেবিনে আনা হল শুভ্রকে। সেদিন ওরা সবাই দেখা করল তার সঙ্গে। প্রথমে কথা বলল পুলিশ, সেই সাব-ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক। প্রশ্নের উত্তরে শুভ্র জানাল, যারা তাকে ছুরি মেরেছে তাদের কাউকে আগে কখনও দেখেনি সে, তবে আবার দেখলে চিনতে পারবে। না, তার কোন শত্রু আছে বলে সে মনে করে না।

ভাই-ভাবী আর অন্তরাকে দেখে চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল শুভ্রর। তার মুখে হাত বুলিয়ে দিল সীমা। সবার চোখেই পানি, কেউ কোন কথা বলতে পারছে না। তবে সবার আগে নিজেকে সামলে নিল অন্তরা, ও-ই প্রথম প্রশ্নটা করল, 'প্রথমবার জ্ঞান ফেরার পর তুমি আমাদের নাম বললে কেন—আমার আর মাসুদুর রহমানের?'

'তোমাদের নাম বলেছি? কই, আমার তো কিছু মনে নেই।'

শুভ্রকে আরও অনেক কথা জিজ্ঞেস করার ছিল অন্তরার, কিন্তু ভাই-ভাবী ও দাদা-দাদীর সামনে সে-সব কথা জিজ্ঞেস করা যায় না। একটু পরই নার্স এসে বলল, এবার ওদেরকে বেরুতে হবে।

শুভ্র ভাল আছে, কাজেই দু'দিন পর অন্তরার দাদা-দাদী জেদ ধরলেন, অন্তরাকে তাঁদের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জে যেতে হবে। তাঁদের জেদ ধরার কারণ, ইতিমধ্যে শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে অন্তরা। সীমাও সমর্থন করল তাঁদেরকে। অন্তরারও ইচ্ছে, দূরে কোথাও ক'টা দিন কাটিয়ে আসে। বিশেষ করে মাসুদুর রহমানের কাছ থেকে পালাবার একটা তাগাদা অনুভব করছে ও। শুভ্রকে দেখার জন্যে হাসপাতালে

রোজই একবার করে আসেন ভদ্রলোক, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোন কথাই বলে না ও। মাসুদুর রহমান যেচে পড়ে দু'একবার ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোন সাড়া পাননি।

মাসুদুর রহমান বা কুয়ালা ফ্যাশন হাউসের কাউকে কিছু না বলে নারায়ণগঞ্জে চলে এল অন্তরা। আসার দিন জানতে পারল, গাঁজার দোকানদারকে জেরা করেও কোন তথ্য আদায় করতে পারেনি পুলিশ, লোকটাকে কোর্টে হাজির করে আরও ক'দিন রিমাণ্ডে রাখার আবেদন জানানো হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জে আসার দু'দিন পর সীমা ভাবীর ফোন পেল অন্তরা। ভাবী ওকে জানাল, 'তোমার অফিসের ম্যানেজার এনাম আহমেদ ফোন করে আমাকে জানিয়েছেন, তোমার ছুটি আরও এক হপ্তা বাড়ানো হয়েছে, তার মানে মোট পনেরো দিন করা হয়েছে।' শুভ্র কেমন আছে জানতে চাইল অন্তরা। 'ভাল আছে, তবে হাসপাতালে আরও কিছু দিন থাকতে হবে তাকে।'

নারায়ণগঞ্জে এসেছে অন্তরা আজ প্রায় বিশ দিন। টেলিফোনে প্রায়ই সীমা ভাবীর সঙ্গে কথা হয় ওর। সীমার কাছ থেকে জানা গেল, জাপানে পাঠানর একটা প্রস্তাব শুভ্রকে দেয়া হয়েছিল বটে, তবে প্রস্তাবের সঙ্গে একটা শর্তও ছিল। শর্তটা ছিল, অন্তরার সঙ্গে শুভ্র কোন সম্পর্ক রাখতে পারবে না। এ-ব্যাপারে সীমা বা শিপলু কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে তাদের মনোভাব পরিষ্কার হয়ে গেছে একটা সিদ্ধান্তে। সিদ্ধান্তটা হল, শুভ্রকে 'শোভা'-র ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হবে। মাসুদুর রহমানের প্রতি সবাই ওরা কৃতজ্ঞ, কাজেই তাঁর প্রস্তাবটা বিনয়ের সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করেছে অন্তরার ভাই ও ভাবী। ওদের সিদ্ধান্তের কথা শুনে মাসুদুর রহমান কোন মন্তব্য করেননি।

শুভ্রর সঙ্গেও একদিন টেলিফোনে কথা হল অন্তরার। ও-ই ফোন করেছিল হাসপাতালে। কয়েকটা প্রশ্ন অস্থির করে রেখেছে ওকে,

ভাবছিল কিভাবে তুলবে। মাসুদুর রহমানের প্রসঙ্গ অবশ্য শুভ্রই আগে তুলল। 'আমি তাঁকে ভুল বুঝেছিলাম,' বলল সে। 'ভদ্রলোক সত্যি মহৎ, অন্তরা। উনি আমার জন্যে যা করেছেন, চিন্তা করা যায় না। তাছাড়া, ডাক্তাররা শিপুল ভাইকে বলেছেন, হাসপাতালে নিয়ে আসতে আর একটু দেরি হলে আমাকে তাঁরা বাঁচাতে পারতেন না। উনি যদি ঠিক ওই সময় ওখানে না যেতেন, আমাকে যদি হাসপাতালে না আনতেন...।'

'কিন্তু উনি তোমার খোঁজে ওখানে গিয়েছিলেন কেন?' জানতে চাইল অন্তরা।

'সেটা এখনও আমি জানি না,' বলল শুভ্র। 'তবে এর আগেও উনি আমার সাথে ওখানে দেখা করেছেন। তোমাকে আমি বলিনি, কারণ আমাকে মানা করেছিলেন...।'

তারপর শুভ্রকে জাপানে পাঠানর প্রসঙ্গটা তুলল অন্তরা। শুভ্র জানাল, তাকে বলা হয়েছিল সে যদি অন্তরার সঙ্গে মেলামেশা না করে, তাহলে তাকে জাপানে পাঠানর একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে, এটা কোন প্রতিশ্রুতি নয়। শুভ্র স্বীকার করল, ভদ্রলোকের অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবটা লোভনীয় মনে হয় ওর। তাঁর কাছ থেকে জোরালো প্রতিশ্রুতি আদায় করার জন্যেই, তিনি অন্তরার সঙ্গে মেলামেশা করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও, অন্তরার সঙ্গে পার্টিতে গিয়েছিল সে। ভেবেছিল, কথাটা মাসুদুর রহমানের কানে যাবে, তখন তিনি তাকে জাপানে পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠবেন। শুভ্র আরও জানাল, মাসুদুর রহমান প্রায় রোজই ওকে দেখতে আসছেন। ইতিমধ্যে ভদ্রলোকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে সে।

কিন্তু মাসুদুর রহমান শুভ্রকে অন্তরার সঙ্গে মেলামেশা করতে নিষেধ করবেন কেন? কোন অধিকারে নিষেধ করবেন? ভাই-বোনের সম্পর্কটা তো আছেই, ওরা পরস্পরের বন্ধুও বটে, এই বাস্তবতা কেন

তিনি মেনে নিতে পারছেন না?

অন্তরার এ-সব প্রশ্ন শুনে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল শুভ্র। তারপর বলল, 'তাঁর সাথে অনেক কথাই হয়েছে আমার, সব কথা তোমাকে বলতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তবে তুমি যদি কথা দাও, এ-সব কথা কোন দিন তাঁর কানে যাবে না, তাহলে তোমাকে আমি কিছু কিছু অন্তত জানাতে পারি।'

'কথা দিলাম।'

'তিন সত্যি?'

'তিন সত্যি।'

'আঙুল ছুঁয়ে?'

'আঙুল ছুঁয়ে।'

দুর্বল হলেও, হাসপাতাল থেকে শুভ্রর হাসির আওয়াজ পেল অন্তরা। তারপর সে বলল, 'উনি আমাকে তোমার সাথে মেলামেশা করতে নিষেধ করেছিলেন, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। উনি চেয়েছিলেন আমি যেন তোমাকে বিরক্ত না করি। সেটা তোমার ও আমার ভালর জন্যেই চেয়েছিলেন…।'

'উনি জানলেন কিভাবে যে তুমি আমাকে বিরক্ত করো? তাছাড়া, তুমি আমাকে বিরক্ত করলে তাঁর কেন এত অসহ্য লাগবে? আমাদের ভাল চাইতেই বা কে বলেছে তাঁকে?'

'উনি বোধহয় কিছু সন্দেহ করেছেন, অন্তরা। ফারজানার ব্যাপারে তোমার কাছ থেকে আমি যে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছি, তুমি আমাকে টাকা দিয়েছ, এ-সব হয়ত তিনি পরিষ্কার ভাবে জানেন না, তবে কিছুটা আভাস বোধহয় পেয়েছেন। তুমি কি তানিকে কিছু বলেছিলে?'

'না।'

'যেভাবেই হোক, কিছু একটা সন্দেহ হয়েছে তাঁর। আর, তোমাকে বিরক্ত করতে নিষেধ করেছিলেন, এর কারণ হল…আসলে, অন্তরা,

ভদ্রলোক নিজেই একটা প্রচণ্ড দ্বন্দ্বে ভুগছেন।'

'দ্বন্দ্বে ভুগছেন? তারমানে? কিসের দ্বন্দ্ব তাঁর?'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর শুভ্র বলল, 'ভদ্রলোক আসলে তোমাকে ভালবাসেন, অন্তরা। কিন্তু তোমাকে তার ভালবাসা উচিত কিনা, এ নিয়ে তাঁর মনে দারুণ একটা সন্দেহ আছে। আর এই সন্দেহটা আছে বলেই, তোমার কিছু কিছু উদ্ভট আচরণের অন্যরকম অর্থ খুঁজে পান তিনি।'

'কিছুই বুঝলাম না। ভালবাসা উচিত কিনা—মানে? আমার উদ্ভট আচরণের অন্যরকম অর্থ, এ-ও তো ছাই কিছু বুঝলাম না।'

'তাঁর সন্দেহের কারণটা আমাকে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেননি। শুধু বলেছেন তোমাকে ভালবাসা উচিত কিনা, এ নিয়ে প্রচণ্ড এক মানসিক দ্বন্দ্বে ভোগেন তিনি। প্রথমে তাঁর ধারণা হয়েছিল, তুমি যদি আমাকে ভাল না-ও বাসো, আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি। সে ভুলটা ভাঙার পর এখন তাঁর সন্দেহ, তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট অন্য কেউ বোধহয় ভালবাসে তোমাকে।'

'তাঁর এরকম উদ্ভট ধারণার কারণ?' জানতে চাইল অন্তরা।

'কারণ হল ফুলের একটা তোড়া,' বলল শুভ্র। 'তুমি তাকে বলেছ, ফুলের তোড়াটা নাকি আমি পাঠিয়েছি তোমাকে। আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি পাঠাইনি শুনেই এরকম একটা ধারণা হয়েছে তাঁর…।'

ফুলের তোড়ার কথাটা ভুলেই গিয়েছিল অন্তরা। প্রসঙ্গটা অন্যমনস্ক করে তুলল ওকে। একটা রহস্যই বটে, আজও জানা গেল না কে পাঠিয়েছিল ওটা।

টেলিফোনে বক বক করে চলেছে শুভ্র, অন্তরা শুনছে কি শুনছে না সেদিকে খেয়াল নেই। 'শোভা'-য় তাকে ম্যানেজার করা হবে, এ-কথা শুনে খুশিই হয়েছে সে। গলায় সামান্য খেদ নিয়ে এ-কথাও বলল যে

মাসুদুর রহমানের টাকায় চাকরি নিয়ে জাপানে যেতে পারলে মন্দ হত না, তাঁর টাকা ছ'মাসের মধ্যে শোধ করে দিতে পারত সে। তবে ভাই-ভাবীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে মেনে নিয়েছে। অন্তরাকে সে কথা দিল, হাসপাতাল থেকে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে বেরুবে, শুরু করবে নতুন জীবন। সীমা ভাবী বলেছে, চলতি বছরই ওর বিয়ে দেবে তারা। ওদের ইচ্ছে, বিয়ে করে সংসারী হোক সে। প্রস্তাবটা মন্দ লাগেনি তার। অনেক হয়েছে, এবার জীবনটায় খানিক শৃঙ্খলা আনা যেতে পারে। তবে এ-ব্যাপারে অন্তরার মতামতকে সবার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবে শুভ্র। কারণ ওর জীবনে অন্তরার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। সেই ছোটবেলা থেকে নিকট বা আপনজন বলতে অন্তরাকেই চেনে সে। ওর বিয়ের ব্যাপারে অন্তরা যদি মত দেয়, তবেই ভাবীর প্রস্তাবে রাজি হবে। কাকে বিয়ে করবে, সেটাও ঠিক করতে হবে অন্তরাকে। ওর জন্যে কেমন মেয়ের দরকার, অন্তরা ছাড়া আর কেউ তা ভাল বুঝবে না।

উত্তরে অন্তরা বলল, চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে ক'টা দিন সময় দিতে হবে ওকে।

মানুষের জীবনে আদর-যত্ন কতটুকু যে দরকার, অনেক দিন পর দাদা-দাদীর কাছে ফিরে এসে নতুন করে উপলব্ধি করল অন্তরা। বুড়ো দাদা ওকে মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করতে চান না। আর বুড়ি দাদী সারাক্ষণ ওকে ধাওয়া করছেন, অন্তরার জন্যে নতুন আর কি রান্না করবেন জানার জন্যে। ওদের সঙ্গে গল্প-গুজব করে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে ওর। বিকেলে ছাদে উঠে হাঁটাহাঁটি করে। সকালটাও খুব সুন্দর কাটে। বাড়ির পিছনে ছোট্ট একটা বাগান আছে, সেটার পরিচর্যা করে। অনেক দিন পর সময় পেয়েছে, সুজান রুক-এর সঙ্গে নিজের চেহারাটা মিলিয়ে দেখে শুভ্রর কথাটা কতটুকু সত্যি।

শুভ্র শিপলুর দোকানে বসবে, সে কথা দিয়েছে এখন থেকে

সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে, এ-সব কথা শুনে নিজেদের মধ্যে কি যেন ফিসফাস করেন অন্তরার দাদা-দাদী। ফিসফাস করেন আর আড়চোখে অন্তরার দিকে তাকান। ইতিমধ্যে লাবণ্য ফিরে এসেছে অন্তরার চেহারায়, স্বাস্থ্যও একটু ভাল হয়েছে আগের চেয়ে। অন্তরা বুঝতে পারে গোপন কি যেন একটা পরামর্শ চলছে দাদী আর সীমা ভাবীর মধ্যে। প্রায়ই সীমা ভাবীকে ফোন করেন দাদী। সীমা ভাবীকে কি যেন বোঝাতে চেষ্টা করেন তিনি। অন্তরা ঘরে ঢুকলেই তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। এ-সব দেখেও না দেখার ভান করে অন্তরা। আসলে ওর কোন আগ্রহ নেই।

মনে মনে খুবই বিষণ্ন ও হতাশ বোধ করছে অন্তরা। ছোট্ট বাড়িটার শান্তিময় পরিবেশে দিনগুলো ঠিকই পার হয়ে যাচ্ছে, তবে জীবনের ওপর আর কোন আকর্ষণ বোধ করে না ও। নিজেকে নিয়ে কত স্বপ্ন ছিল ওর, সব হারিয়ে ফেলেছে। এখন আর ক্যারিয়ার নিয়েও কিছু ভাবে না। সেদিন এনাম আহমেদ ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন, ছুটি শেষ হয়ে গেল অথচ অন্তরা অফিসে যাচ্ছে না কেন? উত্তরে অন্তরা বলেছে, ছুটিটা বাড়িয়ে পুরো এক মাস করলে ভাল হয়, তার শরীরটা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। তাতেই রাজি হয়েছেন ম্যানেজার সাহেব, তবে জানিয়ে দিয়েছেন, এরপর আর ছুটি বাড়ানো যাবে না।

দেখতে দেখতে ছুটির অতিরিক্ত দিনগুলো শেষ হয়ে গেল, সকালে ঘুম থেকে উঠে অন্তরার মনে পড়ল, কাল থেকে অফিস করতে হবে ওকে। ছুটি শেষ হয়ে গেল, অথচ এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি, চাকরিটা ও আদৌ করবে কিনা। অনেক দিনের অভ্যেস, সকালেই গোসলটা সেরে নিল ও, নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে এল বাগানে। নিরিবিলি পরিবেশে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে ওকে। কাল থেকে অফিস করতে হলে আজই ওকে ফিরতে হবে ঢাকায়। কাজেই চাকরিটা করবে কিনা, এখুনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা দরকার।

মাসুদুর রহমানের সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে যা যা ঘটেছে, সব একে একে স্মরণ করল অন্তরা। একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই মনে, মাসুদুর রহমানকে ভালবেসেছিল ও। বলা যায়, প্রথম দর্শনেই তাঁর প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু মাসুদুর রহমানের ব্যাপারটা কি? তিনিও যে ওকে ভালবেসেছিলেন, এর কোন প্রমাণ ওর কাছে নেই। মুখ ফুটে ভালবাসার কথা কখনও তিনি বলেননি। তা অবশ্য অন্তরাও কখনও বলেনি। তবে ভালবাসাটা একতরফা, এ-কথা বলা যাবে না। ঠিক আছে, ধরা যাক, দু'জনই দু'জনকে ভালবাসত। অন্তরা কথাটা তাঁকে জানায়নি বটে, তবে না জানানর একাধিক কারণও আছে। প্রথম কারণ, যথেষ্ট সময় পায়নি ও। ভালবাসি, এ-কথা হুট করে কাউকে বলা যায় না। দ্বিতীয় কারণ, কয়েকটা ব্যাপার ওকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে। তার একটা হল, মাসুদুর রহমানকে সব সময় সুন্দরী মেয়েরা ঘিরে রাখে। তৃতীয় কারণ, উম্মে জোহরা। অনেকেরই ধারণা, মাসুদুর রহমানকে অনেক দিন থেকে বিয়ে করতে চায় মেয়েটা। কিন্তু মাসুদুর রহমান তাকে ঝুলিয়ে রেখেছেন। আরও একটা কারণে দ্বিধা ছিল অন্তরার—মাসুদুর রহমানের সঙ্গে ওর স্ট্যাটাস মেলে না। উনি বিরাট ধনী মানুষ, আর অন্তরা নিঃস্ব গ্রাজুয়েট। প্রেমে পড়ার জন্যে এটা হয়ত অলঙ্ঘণীয় কোন বাধা নয়, তবে বাংলাদেশের সামাজিক রীতি অনুসারে বিত্ত-বৈভবের এরকম বিস্তর ফারাক থাকলে সাধারণত মিলন হয় না, অন্তত পরিণতি শুভ পরিণয় পর্যন্ত গড়ায় না। দু'একটা ব্যতিক্রম যে নেই তা-ও অবশ্য নয়। তবে অন্তরার দ্বিধাগুলো যে অকারণে, তা বলা যাবে না।

এখন জানা গেছে, ওকে ভালবাসার ব্যাপারে মাসুদুর রহমানের মনেও নাকি দ্বন্দ্ব আছে। কি সেই দ্বন্দ্ব, অন্তরার জানা নেই। তবে আন্দাজ করতে পারে ও। মাসুদুর রহমান সম্ভবত উম্মে জোহরাকে অনেক আগেই আভাস দিয়ে রেখেছেন যে তাকেই তিনি বিয়ে

করবেন।

বাগানে পায়চারি করতে করতে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে অন্তরা। এটা পিছন দিক বলে রাস্তার পাশে বাড়ি হলেও, যানবাহন ও লোকজনের আওয়াজ খুব একটা পৌঁছায় না। সাদা একটা গোলাপ ছিঁড়ে খোঁপায় গুঁজল অন্তরা, খালি পায়ে ভেজা ভেজা ঘাসের ওপর হাঁটছে।

ধরা যাক, ভাবল অন্তরা, মাসুদুর রহমান তাঁর দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠলেন। কিন্তু তারপরও এমন কিছু ঘটনা আছে, যেগুলো ভুলে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ভদ্রলোক প্রচণ্ড রকম ঈর্ষাকাতর, এটা প্রমাণিত সত্য। পরে তিনি শুভ্রর শুভানুধ্যায়ী সাজার চেষ্টা করলেও, প্রথমে তিনি তাকে একেবারেই সহ্য করতে পারেননি। এটা মেনে নেয়া অন্তরার জন্যে সত্যি কঠিন। শুভ্র ওর ভাই ও প্রিয় বন্ধু, কাজেই তাকে ত্যাগ করা কোনদিনই অন্তরার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ এই বাস্তবতা অস্বীকার করতে চান ভদ্রলোক। এ থেকে তাঁর ঈর্ষাকাতর মনের পরিচয়ই প্রকাশ হয়ে পড়ে। শুভ্র আর ওর সম্পর্ক নিয়ে মাসুদুর রহমানের মনে সন্দেহ দেখা দেয়া স্বাভাবিক, স্বীকার করে অন্তরা। ও যদি সব কথা ব্যাখ্যা করে বলতে পারত, তাহলে হয়ত সন্দেহমুক্ত হতে পারতেন ভদ্রলোক। কিন্তু শুভ্রকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে অন্তরা, কাজেই সব কথা খুলে বলা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ভদ্রলোক যদি আরেকটু সহনশীল হতেন, যদি মেনে নিতে পারতেন শুভ্রকে, তাহলে হয়ত একদিন সব কথা তাঁকে জানানর কথা ভাবত অন্তরা। শুভ্রকে দেয়া প্রতিশ্রুতি না ভেঙেও কথাটা তাঁকে জানানর একটা উপায় ঠিকই বের করে নিত ও। কিন্তু শুরুতেই তিনি অন্তরাকে সন্দেহ করে বসেন, শুভ্রকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ধরে নেন। ফলে গোটা ব্যাপারটা স্পর্শকাতর ও জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারপর রয়েছে শুভ্রর আহত হওয়ার ঘটনাটা। আজও পুলিশ অপরাধীকে চিনতে পারেনি, ধরা তো দূরের কথা। ঘটনাটার সঙ্গে

নিজেকে যেভাবে জড়িয়েছেন মাসুদুর রহমান, তাঁর আচরণকে রীতিমত রহস্যময়ই বলতে হয়। গাঁজার আড্ডায় কেন তিনি শুভ্রর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন? কেন তাকে প্রস্তাব দেবেন চাকরি দিয়ে জাপানে পাঠানর? অন্তরা ভোলেনি, শুভ্র আহত হবার আগের দিন রাতে ওকে মাসুদুর রহমান বলেছিলেন, শুভ্র যদি ওর পিছু না ছাড়ে তাহলে তার কপালে খারাবি আছে। ভদ্রলোক হুমকি দিলেন, আর তার পরদিনই ছুরি মারা হল শুভ্রকে। এ থেকে কি ধরে নেয়া যায়?

এমন হতে পারে এ-সবেরই হয়ত গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আছে। হয়ত এ-কথাও সত্যি যে মাসুদুর রহমান নির্দোষ। কিন্তু তারপরও, দু'জনের সম্পর্কটা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা আর মেরামতযোগ্য নয়। মেরামতযোগ্য এই জন্যে নয় যে দু'জনের কেউই ওরা পরস্পরের কিছু কিছু ব্যাপার মেনে নিতে পারবে না কোনদিন। শুভ্রর সঙ্গে ওর গোপন সম্পর্কটা কি, এ-কথা অন্তরা তাঁকে কখনও জানাবে না। ফলে ওকে ভুল বোঝার অবকাশ থেকেই যাবে। উম্মে জোহরাকে দীর্ঘকাল বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছেন মাসুদুর রহমান, কাজেই ওর মনে একটা ভয় সব সময়ই থাকবে যে ওকে নিয়েও খেলবেন তিনি। তাছাড়া, শুভ্রর প্রতি তাঁর বৈরি মনোভাবও মেনে নিতে পারবে না অন্তরা।

তারমানে দাঁড়াল, সম্পর্কটা শেষ হয়ে গেছে।

সম্পর্ক নাহয় শেষ হয়েছে, কিন্তু প্রেম? নারায়ণগঞ্জে আসার পর এমন একটা দিন যায়নি যেদিন মাসুদুর রহমানের কথা ভেবে বালিশে মুখ লুকিয়ে কাঁদেনি অন্তরা। একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, সম্ভবত জীবনের প্রথম প্রেম বলেই হয়ত, ভদ্রলোককে কোনদিন ভুলতে পারবে না অন্তরা। ও জানে, এটাই ওর প্রথম ও শেষ প্রেম। কারণ, এরপর আর কাউকে ভালবাসা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

সম্পর্ক নেই, কিন্তু ভালবাসা আছে। আর ভালবাসা আছে বলেই,

তাঁকে দেখতে চাওয়ার, তাঁর কাছাকাছি থাকার একটা আকুলতাও আছে। কাল থেকে আমি অফিসে যাব, সিদ্ধান্ত নিল অন্তরা। জানে, সম্পর্কটা আর কোনদিনই ঠিক হবে না, তবে নিজের ক্যারিয়ারটাকে নষ্ট হতে দেবে না ও, হাতছাড়া করবে না তাঁকে কাছ থেকে দেখতে পাবার সুযোগটা। এটা যে একটা বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত, সে-ব্যাপারেও সচেতন অন্তরা। ওর চোখের সামনে অন্য মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন মাসুদুর রহমান, তারপর হয়ত উম্মে জোহরা বা অন্য কাউকে বিয়েও করবেন একদিন। কাছ থেকে এ-সব দেখার মানেই হবে নিজেকে কষ্ট দেয়া। এ এক ধরনের আত্মপীড়নেরই নামান্তর।

তবে তাঁর কাছে থাকতে চাওয়ার সিদ্ধান্তের পিছনে ক্ষীণ একটা আশার প্রভাবও কম নয়। দুনিয়ার বুকে কত বিচিত্র ঘটনাই তো ঘটে। একদিন হয়ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে। বোধোদয় হবে দু'জনেরই। অন্তত এটুকু বোঝে অন্তরা, ওর প্রেম যদি মিথ্যে না হয়, তার পরিণতি একটা থাকতেই হবে। 'না,' বিড়বিড় করে বলল ও। 'পালিয়ে থাকা একদমই উচিত হচ্ছে না আমার। তাঁর কাছে একবার অন্তত যেতে হবে আমাকে। তারপর যদি দেখি...।'

'এখানে কেউ তো নেই, তুমি কার সাথে কথা বলছ?'

ভয় পেয়ে আঁতকে উঠল অন্তরা। ঝট করে ঘাড় ফেরাতেই দেখল সাত-আট বছরের আশ্চর্য সুন্দর একটা ছেলে, মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল, কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর সামনে। জিনসের প্যান্ট-শার্ট, পায়ে দামী কেডস, হাতে একটা কার্টুনের বই। কে এই ছেলে? কোত্থেকে এল? চট করে ভাঙা পাঁচিলটার দিকে একবার তাকাল অন্তরা। বোধহয় পাশের কোন বাড়ির ছেলে হবে, ফুল নিতে এসেছে। 'কি নাম তোমার? ফুল নিতে এসেছ বুঝি?' ছেলেটার ম্লান মুখ, রাজ্যের বিস্ময় ভরা সরল দুটো চোখ অন্তরাকে যেন মুহূর্তেই জাদু করে ফেলল। এগিয়ে এসে ছেলেটার একটা হাত ধরল ও।

'আমার নাম বৃষ্টি। আব্বু বলেছে, আমার নাম বললেই তুমি নাকি আমাকে চিনবে। বলো তো, কে আমি?'

বৃষ্টি? বৃষ্টি আবার কোন ছেলের নাম হয় নাকি? 'তুমি…তু-মি…?' হঠাৎ মনে পড়ে গেল অন্তরার।

'দাদুর সাথে এসেছি, আন্টি। তুমি তো অন্তরা আন্টি, তাই না? চলো, দাদু তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।' অন্তরার হাত ধরে টান দিল বৃষ্টি।

ছেলে নয়, মেয়ে। এমন দিশেহারা ও হতভম্ব বোধ করছে অন্তরা, বৃষ্টি ওকে কখন টানতে টানতে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এসেছে, বলতে পারবে না ও। বৈঠকখানা থেকে ভারি, প্রায় কর্কশ একটা পুরুষালি কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, শুনতে পেল ও। দুরু দুরু বুকে ভেতরে ঢুকল, অত্যন্ত সাবধানে। দেখল, ওর দাদা ও দাদীর সামনে সোফায় বসে রয়েছেন এক ভদ্রলোক। মাসুদুর রহমান নন। ভদ্রলোক বৃদ্ধ, খুবই রোগা-পাতলা। হঠাৎ করেই তাঁকে চিনে ফেলল অন্তরা। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোককেই সেদিন রাতে কুয়ালা ফ্যাশন হাউসের সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে থাকতে দেখেছিল ও। ভদ্রলোক অসুস্থ ছিলেন…।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। 'এসো, মা। আমাকে তুমি আগেও দেখেছ, তবে পরিচয়টা বোধহয় জানো না। আমি খালেদুর রহমান কুয়ালা। মাসুদের বাবা।'

নিজের অজান্তেই ডান হাতটা কপালের কাছে উঠে গেল অন্তরার। 'আপনি বসুন,' ফিসফিস করে বলল।

ভদ্রলোক বসলেন না, এগিয়ে এসে অন্তরার সামনে দাঁড়ালেন। 'তুমি দেখছি খুব অবাক হয়ে গেছ,' বললেন তিনি। 'মাসুদ বোধহয় আমার কথা কিছুই তোমাকে বলেনি, তাই না?'

'জ্বী…না…হ্যাঁ…,' বিড়বিড় করে বলল অন্তরা।

'বাপ-বেটায় কথা খুব কম হয়, যে যার ডাঁট বজায় রেখে চলি

আমরা,' বলেই হেসে উঠলেন খালেদুর রহমান। 'তা ফুলের তোড়াটা পেয়েছিলে তো?'

'আ-আপনি?'

'হ্যাঁ, আমি। হার্টের অবস্থা অনেকদিন থেকেই সুবিধের নয়, সেদিন হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তুমি আমাকে বেবি ট্যাক্সিতে তুলে দিলে, সোজা চলে গেলাম একটা ক্লিনিকে। এই ক'দিন ওখানেই ছিলাম, তিন দিন হল ছাড়া পেয়েছি। ভাবলাম, যাই, মেয়েটার সাথে একবার দেখা করে আসি। বুঝতে পারছি, তুমি লজ্জা পাচ্ছ, তবে কথাটা না বললেও অন্যায় হবে—সেদিন তুমি এই বুড়োর প্রাণ বাঁচিয়েছিলে, মা। তোমার মনটা সত্যি খুব নরম। তা না হলে অচেনা, অসুস্থ এক বুড়ো মানুষকে ওভাবে কেউ সাহায্য করে না... ।'

চোখ-মুখ লালচে হয়ে উঠল অন্তরার। 'আমার জায়গায় অন্য কেউ হলেও সাহায্য করত,' ঢোক গিলে বলল ও। 'তবে যদি বুঝতে পারতাম যে কে আপনি... ।'

'আমি কে সেটা বড় কথা নয়,' কর্কশ শোনাল ভদ্রলোকের গলা, হঠাৎ রেগে উঠে কথাটা যেন তিনি নিজেকেই শোনালেন। বৃদ্ধের প্রতি সহানুভূতিতে ভরে উঠল অন্তরার মন। তাঁর সম্পর্কে মাসুদুর রহমান কি বলেছেন ওকে, পরিষ্কার মনে আছে ওর। 'ব্যবসা বোঝেন, স্বার্থ বোঝেন আর টাকা বোঝেন। অত্যন্ত রগচটা মানুষ।' হঠাৎ করে অন্তরা উপলব্ধি করল, ওর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন খালেদুর রহমান, ও কি ভাবছে বুঝতে চেষ্টা করছেন। তাঁর সামনে থেকে পালাবার একটা ঝোঁক চাপল ওর। 'আপনি বসুন, আমি চা আনি,' বলল ও।

'ভেবেছ এত সহজে আমার কাছ থেকে পালাতে পারবে তুমি?' হেসে উঠলেন বৃদ্ধ। 'কি বললে? চা? চা তো খাবই। কিন্তু শুধু চা খাব বলে তো আসিনি। তোমার মন যে খুব নরম, এটা প্রমাণিত সত্য।

আমি যদি আজ দুপুরে তোমার হাতের রান্না খেতে চাই, তুমি না করতে পারবে না, আমি জানি। তোমার দাদা-দাদীর সাথে এতক্ষণ সেই কথাই হচ্ছিল। বয়স হলে খাওয়ার ব্যাপারে মানুষ লোভী হয়ে ওঠে। যে-ই শুনলাম তোমার রান্নার হাত খুব ভাল, বিরাট একটা স্বস্তিবোধ করলাম। তুমি যদি মাঝে মধ্যে রেঁধে খাওয়াবার প্রতিশ্রুতি দাও, বলা যায় না, আমি হয়ত মালয়েশিয়ার পাট চুকিয়ে ঢাকাতেই স্থায়ী হয়ে যাব...।'

'দাদু!' অবাক হয়ে খালেদুর রহমানের দিকে তাকিয়ে আছে বৃষ্টি। 'তোমার কি হয়েছে বলো তো? বাড়িতে তো শুধু হঁ-হ্যাঁ করো, আজ এখানে এসে এত কথা বলছ যে?'

অন্তরার দাদা-দাদী ও খালেদুর রহমান, তিনজনেই একযোগে হেসে উঠলেন। 'চলো আন্টি, তুমি চা বানাবে, আমি দেখব,' বলে অন্তরাকে বৈঠকখানা থেকে বের করে আনল বৃষ্টি। ছোট্ট মেয়েটাকে কোলে তুলে চুমু খেতে ইচ্ছে করল অন্তরার।

রান্নাঘরে আরেক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। দোরগোড়া থেকেই দেখতে পেল অন্তরা, মেঝেতে প্রকাণ্ড এক জোড়া রুই মাছ পড়ে রয়েছে। শাক-সব্জি আর ফলমূলের যেন বাজার বসেছে রান্নাঘরে। অত্যন্ত ব্যস্তভাবে চুলোয় রান্না চড়াবার আয়োজন করছে ওদের কাজের বুয়া। পিছনে পায়ের শব্দ, ঘাড় ফেরাতেই দাদীকে দেখতে পেল অন্তরা।

'দেখ দেখি ভদ্রলোকের কাণ্ড,' বললেন তিনি। 'গোটা একটা বাজার মাথায় করে এনেছেন। সর-সর, ঢুকতে দে আমাকে। আয়, তুই-ও হাত লাগা। বুয়া, প্রথমে মেহমানদের জন্যে চা বানাও...।'

'আমরা মেহমান নই,' বলল বৃষ্টি। 'আত্মীয়। দাদু বলেছেন, নিকট আত্মীয়।'

মুহূর্তের জন্যে থতমত খেয়ে গেলেন অন্তরার দাদী, তারপরই

বৃষ্টিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করলেন। 'আমারই ভুল হয়েছে, ভাই। আত্মীয়ই তো...,' আড়চোখে একবার অন্তরার দিকে তাকালেন তিনি।

মাথা নিচু করে কি যেন চিন্তা করছে অন্তরা, মুখের ভাব দেখে কিছু বোঝা গেল না।

খেতে বসে কিন্তু প্রায় কিছুই মুখে দিলেন না খালেদুর রহমান। অন্তরা যে খাবারই তাঁর দিকে এগিয়ে দেয়, হাত নেড়ে বাধা দেন তিনি, বলেন, ডাক্তারের নিষেধ আছে। ইতিমধ্যে জড়তা কাটিয়ে অনেকটাই সহজ হতে পেরেছে অন্তরা, রান্নার ফাঁকে ফাঁকে চা দিতে এসে খালেদুর রহমানের সঙ্গে বার কয়েক গল্পও করে গেছে। এত কষ্ট করে রান্না করেছে ও, অথচ কিছুই উনি মুখে তুলছেন না, রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। 'তাহলে এত বাজার করে এনেছেন কেন? একদিন খেলে কিছু হবে না, নিন,' বলে জোর করেই ভদ্রলোকের প্লেটে মাছের পেটি তুলে দিল।

অবাক হয়ে অন্তরার দিকে তাকিয়ে থাকলেন খালেদুর রহমান। শুধু বিস্ময় নয়, তাঁর চেহারায় একটু যেন রাগের ভাবও ফুটে উঠেছে। ভদ্রলোক যে বদমেজাজি, মাসুদুর রহমানের কাছে আগেই শুনেছে অন্তরা। মনে মনে কৌতুক বোধ করল ও। ভাবল, অল্পবয়েসী স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি তোমার, মেজাজ দেখিয়ে তাকে তুমি দূরে ঠেলে দিয়েছিলে। সব কিছুতে কর্তৃত্ব ফলানো তোমার স্বভাব, তাই একমাত্র ছেলের সঙ্গেও তোমার সদ্ভাব নেই। কিন্তু আমি তোমার পরিবারের কেউ নই, কাজেই আমাকে তুমি চোখ রাঙিয়ে বা ধমক দিয়ে সুবিধে করতে পারবে না।

ইতিমধ্যে নিজের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে নিজেই খানিকটা আভাস দিয়েছেন খালেদুর রহমান। বলেছেন, 'আমি ঠিক সামাজিক

জীব নই। আমাকে মিশুক বলা যাবে না। তবে ঋণী থাকতে একদমই পছন্দ করি না। সেজন্যেই অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ঠিকানা যোগাড় করে তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি।'

ধীরে ধীরে জানা গেল, মাসুদুর রহমান তাঁকে পাঠাননি, তিনি নিজের গরজেই এসেছেন। নারায়ণগঞ্জে তাঁর শ্বশুরবাড়ি, বাড়িটা খালি পড়ে আছে অনেক বছর, সেটাই দেখতে এসেছিলেন। কাল সারাদিন সে-বাড়িতেই ছিলেন, আজ ঢাকা ফেরার পথে অন্তরাকে দেখতে এসেছেন। কুয়ালা ফ্যাশন হাউসের ঢাকা ব্রাঞ্চ সম্পর্কে অন্তরাকে অনেক প্রশ্ন করলেন তিনি। জানতে চাইলেন কর্মচারীরা কে কেমন কাজ করে, তাদের সবার সঙ্গে মাসুদুর রহমানের কি রকম সম্পর্ক। 'তুমি তো রীতিমত একটা প্রতিভা,' খাওয়াদাওয়ার পর পান মুখে দিয়ে হঠাৎ মন্তব্য করলেন তিনি। 'তোমার হাতের কাজ আমি দেখেছি। ডিজাইনে তুমি নাম করবে। প্রশ্ন হল, কুয়ালা ফ্যাশন হাউস তোমার প্রতিভার যথাযোগ্য মর্যাদা দিচ্ছে তো? মন ঢেলে কাজ করার মত পরিবেশ পাচ্ছ কি?' এক রকম জোর করেই অন্তরার দাদা-দাদীকে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে নিজেদের কামরায় পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি, অন্তরার সঙ্গে একা আলাপ করতে চান।

মাথা কাত করে অন্তরা জানাল, 'জ্বী, ওরা সবাই আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন।'

'ঠিকানাটা যোগাড় করে দিল রীনা,' বললেন খালেদুর রহমান। 'সে বোধহয় তোমার এক ভাবীকে টেলিফোন করে জেনে নেয়। মাসুদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলল ঠিকানাটা তার জানা নেই। চেহারা কেমন যেন ভার ভার। অদ্ভুত ছেলে, কথা তো বলেই না, আমার সামনে থেকে পালাতে পারলে যেন বাঁচে। শুনলাম, কুয়ালালামপুরের মত এখানেও রাতদিন পরিশ্রম করছে। কাজ বেশি থাকলে বেশি লোক রাখতে হবে, সব একা করতে যাওয়াটা পাগলামি। কিন্তু কে তাকে

বোঝায়।'

'আর আপনাকে?' হাসিমুখে করলেও, অন্তরার প্রশ্নগুলো অত্যন্ত ধারালো। 'আপনাকে কে বোঝায়? আপনি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন, কিন্তু আপনার বিরুদ্ধেও যে তাঁর অভিযোগ আছে, তা জানেন? এই বয়েসে আপনি আঠারো ঘন্টা পরিশ্রম করেন, এটা পাগলামি নয়, বলতে চান?'

পান চিবানো বন্ধ হয়ে গেল বৃদ্ধ খালেদুর রহমানের, চোখে পলক নেই, মুখ তুলে তাকিয়ে আছেন অন্তরার দিকে।

'বাপ-বেটা একসাথে বসে কখনও আলাপ করেছেন? আপনি বোধহয় জানেনও না যে মাসুদ ভাই আপনাকে কি রকম ভালবাসেন,' নিচু গলায় বলল অন্তরা। কথাগুলো বলার পর ভয় লাগছে ওঁর।

খালেদুর রহমান রাগ করছেন না দেখে অবাকই হল ও।

'আমার সাথে কেউ এভাবে কথা বলবে, এ আমি ভাবতেই পারিনি,' ধীরে ধীরে বললেন তিনি।

'অপরাধ হয়ে থাকলে মাফ করবেন···,' ধরা গলায় বলল অন্তরা।

'না, মা। তুমি ঠিক কথাই বলেছ। তবে কখনও ভাবিনি এ-সব কথা শুনতে হবে আমাকে···।' চোখ দুটো কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে বন্ধ করলেন খালেদুর রহমান। 'সত্যি তোমার সাহসের প্রশংসা করতে হয়,' বলে শিড়দাঁড়া খাড়া করে বসলেন আবার। 'লোকেরা আমার সামনে বসে সত্যি কথা বলতে ভয় পায়। আমার অনেক টাকা, অনেক ক্ষমতা, সেটাই কারণ। তবে মাসুদ আমাকে ভয় পায় না, আমার টাকার ওপরও তার কোন লোভ নেই। তার সাথে আমার কথা হওয়া উচিত, তুমি ঠিকই বলেছ।'

এরপর অন্য প্রসঙ্গ উঠল। খালেদুর রহমানই জিজ্ঞেস করলেন, 'রীনার মুখে শুনলাম, কি কারণে যেন অফিস করছ না তুমি। মাসুদকে কিছু জিজ্ঞেস করা না করা সমান কথা। তুমি আমাকে বলবে, আসলে

কি হয়েছে? চাকরিটা ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছ নাকি?'

'না, কি হবে,' তাড়াতাড়ি বলল অন্তরা। 'আজই আমি ঢাকায় যাব বলে ভাবছিলাম, কাল থেকে অফিস করব কিনা।'

'ও, তাহলে তো ভালই হল। তোমার দাদাকে একবার ডাকো, অনুমতিটা চেয়ে নিই।'

'জ্বী?' বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল অন্তরা। 'কিসের অনুমতি?'

'তোমাকে ঢাকায় নিয়ে যাব, ওঁদের অনুমতি লাগবে না?'

'না, তার দরকার নেই। আমি একাই যেতে পারব।'

'কেন, একা যাবে কেন? আমাদের সাথে গাড়ি রয়েছে। তুমিও যাবে আমাদের সাথে। যাও, ডাকো ওঁদের। বৃষ্টিকেও তৈরি হয়ে নিতে বলো।'

গাড়ি করে ওদের সঙ্গে ঢাকায় যাবার কোন ইচ্ছে অন্তরার নেই, তবু খালেদুর রহমান যেভাবে জেদ ধরেছেন, ওর আর আপত্তি করার সাহস হল না।

সেই সাদা টয়োটা, মাসুদুর রহমানের গাড়ি। ড্রাইভারও অন্তরার পরিচিত, ওকে দেখে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে সালাম করল প্রৌঢ় আব্বাস আলি। রওনা হবার পর এটা সেটা নানা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেন খালেদুর রহমান, বোঝা গেল কথা বলতে উৎসাহ দিচ্ছেন অন্তরাকে। নিজের কলেজ জীবনের কাহিনী, শিপলু ভাই আর সীমা ভাবীর গল্প, ডিজাইন ও বাটিক সম্পর্কে ওর ধারণা, প্রশ্ন অনুসারে একে একে অনেক কথাই বলল অন্তরা।

'তোমার আরেক ফুফাত ভাইয়ের কি যেন নাম···কবির সিকদার, তাই না?' জানতে চাইলেন খালেদুর রহমান।

'জ্বী। ওর ডাকনাম শুভ্র। আমরা ছোটবেলায় একইবাড়িতে মানুষ হয়েছি।'

'শুনলাম কাল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে সে,' বললেন বৃদ্ধ।

'তাকে যারা ছুরি মেরেছিল, তারাও নাকি ধরা পড়েছে। তুমি জানো না?'

'ধরা পড়েছে?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল অন্তরার। 'কে বলল আপনাকে? কবে?'

'রীনা, তোমাদের চীফ ডিজাইনার। ধরা পড়েছে কাল। তোমার ভাইকে ছুরি মারার কথা স্বীকারও করেছে তারা। তিনজন মাস্তান টাইপের ছেলে আর একটা মেয়ে। মেয়েটার নামও বলেছে আমাকে...মনে পড়ছে না এখন।'

'ফারজানা কি?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল অন্তরা।

'হ্যাঁ, মনে হয় ফারজানাই। তুমি চেনো নাকি?'

'জ্বী...মানে, শুভ্রর মুখে নাম শুনেছি। কিন্তু ঘটনার সময় আশপাশে কোন মেয়ে ছিল বলে তো শুনিনি।'

'তোমার ভাইকে ছুরি মারার জন্যে গুণ্ডাদেরকে টাকা দেয় মেয়েটা। পুলিশকে সে বলেছে, ওর সাথে তার বিয়ে হবার কথা ছিল, কিন্তু ও তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করায় তার মাথায় রক্ত চড়ে যায়...।'

কি কারণে কে জানে, চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল অন্তরার। আশ্চর্যই বলতে হবে, ফারজানা একটা বাজে মেয়ে জানা সত্ত্বেও, তার কথা ভেবেই কাঁদছে ও। আজ হঠাৎ একটা নতুন কথা উদয় হল ওর মনে। ফারজানা যেমন মেয়েই হোক, শুভ্রকে নিশ্চয়ই ভালবাসত সে। এবং শুভ্রও নিশ্চয়ই তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। প্রতিশ্রুতি না পেলে কেউ এভাবে মরিয়া হয়ে ওঠে না।

জীবনে এই প্রথম শুভ্রর প্রতি মনটা বিষিয়ে উঠল অন্তরার। ফারজানার সঙ্গে অবাধ মেলামেশা ছিল তার, মেয়েটা নিশ্চয়ই তার জীবন-যৌবন সবই শুভ্রর হাতে তুলে দিয়েছিল। ফারজানাকে ভালবাসার ভান করেছিল শুভ্র, কিন্তু আসলে ভালবাসেনি। সেজন্যেই তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে সে। এরচেয়ে গুরুতর অন্যায় আর

কি হতে পারে?

ওর পাশে বসে ঘুমে ঢুলছে বৃষ্টি, দেখে বাধা পড়ল অন্তরার চিন্তায়। সীটের পিছন থেকে একটা কুশন টেনে নিয়ে নিজের কোলের ওপর রাখল ও, তারপর সেই কুশনের ওপর বৃষ্টির মাথাটা নামাল। ঘুমে বুজে আসা চোখ মেলে হাসল বৃষ্টি, ফুল তোলা নীল কুশনটায় মুখ ঘষে বলল, 'ফুলগুলো সুন্দর না, আন্টি? এরকম কুশন আরও অনেকগুলো আছে আমাদের কুয়ালালামপুরের বাসায়। ঢাকা থেকে আব্বু পাঠিয়েছে।'

দম বন্ধ হয়ে এল অন্তরার। 'তোমার আব্বু ওগুলো কুয়ালালামপুরে পাঠিয়েছেন? ক'টা বলো তো?'

'অনেকগুলো। বিশটার মত হবে। বিশটা বেতের চেয়ার আর বিশটা কুশন।'

'একেকটা কুশনে এক এক রকম নকশা?' জানতে চাইল অন্তরা। 'কোনটায় ফলমূল, কোনটায় পাখি, কোনটায় মাছ?'

'তুমি কি করে জানলে?'

'জানি, কারণ নকশাগুলো আমার করা।'

'ওমা! আন্টি, তুমি এত সুন্দর নকশা করতে জানো? আব্বু বলল, কুশনগুলো তুমি খুব যত্ন করে রাখবে, কারণ একজন আর্টিস্ট এগুলো খুব যত্ন করে তৈরি করেছেন। তুমিই তাহলে সেই আর্টিস্ট, আন্টি?'

অন্তরা ভাবছে, বিশটা বেতের চেয়ার মাসুদুর রহমান নিজে কিনেছিলেন 'শোভা' থেকে। সেগুলো তাঁর মহাখালির বাড়িতে আছে বলে জানে ও। বাকি বিশটা চেয়ার ও কুশন অর্ডার দিয়ে যায় অন্য এক যুবক। সেগুলো মাসুদুর রহমানের কুয়ালালামপুরের বাড়িতে গেল কিভাবে? তারমানে অন্য কাউকে দিয়ে বাকি বিশটাও মাসুদুর রহমানই কিনে ছিলেন! কেন? উনি কি তাহলে আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যে অন্তরার হাত একেবারে খালি? ওগুলো কিনলে ওর আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে, সেজন্যেই প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও কিনেছিলেন উনি?

তারপর অন্তরার মনে পড়ল, চাকরির প্রথম মাসটা অফিস স্টাফরা প্রায় প্রতিদিনই ওকে দুপুর বেলা হোটেলে খাইয়েছে। অন্তরা চেষ্টা করেও বিল দিতে পারেনি, ওকে বলা হয়েছে, খাওয়ার খরচ অফিস বহন করছে।

বৃষ্টিকে আরও কিছু প্রশ্ন করার ছিল অন্তরার, কিন্তু ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে সে। গোটা ব্যাপারটা ভারি রহস্যময় লাগছে অন্তরার। খালেদুর রহমান বললেন, নারায়ণগঞ্জের ঠিকানাটা রীনা চৌধুরীর কাছ থেকে যোগাড় করেছেন তিনি। তারমানে কি এই যে মাসুদুর রহমান জানেন না, তাঁর বাবা ও মেয়ে অন্তরাকে দেখতে আসছে?

'তোমাকে একবার আমাদের কুয়ালালামপুরের হেড অফিসে নিয়ে যাব,' সামনের সীট থেকে হঠাৎ বললেন খালেদুর রহমান। 'অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে নানা দেশে ঘুরতে হবে তোমাকে।'

অন্তরা ভাবছে, গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে জানতে পারলে না জানি মাসুদুর রহমানের কি প্রতিক্রিয়া হয়। তাঁর বাবা ও মেয়ের সঙ্গে তাঁরই গাড়িতে বসে আছে ও, দেখে নিশ্চয়ই তিনি খুশি হবেন না।

খালেদুর রহমান ও বৃষ্টি, দু'জনকেই খুব ভাল লেগেছে অন্তরার। সবাই যাকে ভয় পায়, সেই খালেদুর রহমান ওকে 'সাহসী মেয়ে' বলে প্রশংসা করেছেন। আর বৃষ্টি, পরম নিশ্চিন্তে ওর কোলে পড়ে ঘুমাচ্ছে। আজই হয়ত প্রথম, আজই হয়ত শেষ, আর কোনদিন বোধহয় দেখাও হবে না ওদের সঙ্গে। তবু ভাল লাগছে অন্তরার।

এই ভাল লাগার অনুভূতিটাই তন্দ্রার একটা ভাব এনে দিল অন্তরার চোখে। মাত্র কয়েক মিনিটের তন্দ্রা, তারই মধ্যে ছোট্ট একটা স্বপ্ন দেখে ফেলল ও। অন্তরা যেন কুয়ালা ফ্যাশন হাউসের গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তর্ক করছে শুভ্রর সঙ্গে। কয়েকটা কুশন নোংরা হয়ে গেছে, অন্তরা ওগুলো ধুতে চায়। কিন্তু শুভ্র ওগুলো অন্তরাকে ছুঁতেই দেবে না, কারণ ওগুলোর ভেতর তার টাকা লুকানো আছে। অন্তরা ভয়

পাচ্ছে, হঠাৎ এসে ওদেরকে না দেখে ফেলেন মাসুদুর রহমান। তারপরই, হঠাৎ করে, শুরু হয়ে গেল ফ্যাশন শো। অন্তরা আর কুশনগুলো সরাবার সময় পেল না।

ঘুম ভাঙার পর অন্তরা অনুভব করল, গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুনতে পেল বৃষ্টি জিজ্ঞেস করছে, 'বাবা কি এখন বাড়িতে আছে, দাদু?'

মুহূর্তে পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠল অন্তরা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখতে পেল, মাসুদুর রহমানের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়ি। গেট খুলে দিচ্ছে দারোয়ান।

রীতিমত আতঙ্ক অনুভব করল অন্তরা। মাসুদুর রহমানের এই মহাখালির বাড়িতে রীনা চৌধুরীর সঙ্গে আগেও একবার এসেছে ও, সে-সময় ভদ্রলোক বাড়িতে ছিলেন না। কিন্তু তখন এসেছিল কাজ নিয়ে। তাছাড়া, মাসুদুর রহমানের সঙ্গে তখন সম্পর্কটা ছিল অন্য রকম। আজ একমাস তাঁর সঙ্গে ওর দেখা-সাক্ষাৎ নেই, তিনি ওর কোন খোঁজও নেননি। সম্পর্কটা চুরমার হয়ে গেছে, বিশেষ করে হাসপাতালে কথা বলতে না চেয়ে তাঁকে রীতিমত অপমানই করেছে অন্তরা। এত কিছু ঘটার পর কোন্ মুখে তাঁর সামনে দাঁড়াবে ও?

কিন্তু আপত্তি করার আগেই বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল গাড়ি। দরজা খুলে নেমে পড়ল বৃষ্টি। সামনের দরজা খুলে খালেদুর রহমানও নামলেন। কিন্তু অন্তরা যেমন বসেছিল তেমনি বসে থাকল, একচুল নড়ল না।

ওর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। ঝুঁকে তাকালেন ওর দিকে। 'কি হল, অন্তরা? তুমি নামছ না কেন?'

কোলের ওপর হাত, শক্ত মুঠো হয়ে আছে। পায়ের কাছে পড়ে আছে ছোট্ট স্যুটকেসটা। 'আমাকে মাফ করতে হবে,' অন্যদিকে মুখ করে বলল অন্তরা। 'আপনি লিফট দিয়েছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ। এখান

থেকে একটা রিকশা নিয়ে এলিফেন্ট রোডে চলে যাব আমি।'

'কেন? তুমি আমাকে ভরপেট খাওয়ালে, তোমাকে আমি এক কাপ চা খাওয়াতে পারব না কেন?' জানতে চাইলেন বৃদ্ধ খালেদুর রহমান।

'না, প্লীজ...।'

'দেখো, অন্তরা, বাড়িটা মাসুদের হতে পারে, কিন্তু আমার উপস্থিতিতে তাকে তোমার ভয় পাবার কোনই কারণ নেই,' বললেন খালেদুর রহমান। 'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, কাজেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সুযোগ কেন আমাকে দেবে না তুমি? তোমাদের মধ্যে যদি কোন ঝগড়া থাকে, আজকের দিনটা সে-সব প্রসঙ্গ না তুললেই তো হল। এসো, নামো, তা না হলে বৃষ্টিকে ডাকব আমি। সে তোমাকে টেনে-হিঁচড়ে নামাবে।'

ঘাড় ফিরিয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকাল অন্তরা। ভাবল, এমন তো নয় যে জীবনে আর কোনদিন মাসুদুর রহমানের সঙ্গে ওর দেখা হবে না। অফিসে গেলে কালই দেখা হবে। বরং আজ দেখা হলে কাল থেকে ওর অফিসে কাজে যাওয়া অনেক সহজ হয়ে যাবে। আর কিছু না হোক, অন্তত বরফ গলার সূচনা তো হবে। বুড়ো মানুষ এত করে বলছেন, তাঁর কথা ফেলে চলে যাওয়াটাও অভদ্রতা হবে।

'কি হল, বেরোও!' এবার রীতিমত ধমক দিলেন খালেদুর রহমান।

ভিজে বেড়ালের মত গাড়ি থেকে নেমে এল অন্তরা। ওর হাত খালি দেখে ড্রাইভারের দিকে তাকালেন বৃদ্ধ, বললেন, 'আব্বাস, স্যুটকেসটা নিয়ে এসো।'

গাড়ি-বারান্দা থেকে ধাপ ক'টা বেয়ে উঠছে ওরা, দরজা খুলে বেরিয়ে এল বৃষ্টি। দৌড়ে এসেছে, হাঁপাচ্ছে সে। 'বাবা বলল, আন্টির হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যেতে হবে। তা না হলে আন্টি নাকি ভেতরে না-ও ঢুকতে পারে। সত্যি, আন্টি?'

'সত্যি,' হাসি চেপে মন্তব্য করলেন খালেদুর রহমান। 'তোমার

আন্টির কোনে কোন ব্যাপারে সামান্য জোর খাটানর দরকার আছে বলে মনে হয়।'

হলরুমে ঢুকল ওরা। বাম পাশে সীটিংরুম। সীটিংরুমের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন মাসুদুর রহমান। অন্তরাকে টানতে টানতে তাঁর দিকে নিয়ে এল বৃষ্টি। 'বাবা, অন্তরা আন্টি সত্যি আসতে চাইছিল না! হাত ধরে টেনে আনতে হল আমাকে!'

'লক্ষী মেয়ে,' হাসি মুখে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন মাসুদুর রহমান।

হলরুমে ঢুকলেন খালেদুর রহমান। 'কাজের লোকগুলোকে কাউকে দেখছি না যে? আমরা চা খাব।'

দোরগোড়া থেকে সরে ওদেরকে ভেতরে ঢোকার পথ করে দিলেন মাসুদুর রহমান, বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চায়ের কথা আগেই বলেছি ওদেরকে।'

অন্তরার হাত ছাড়েনি বৃষ্টি, সীটিংরুমে ঢুকল ওরা। কামরার মাঝখানে বেতের চারটে চেয়ার ফেলা হয়েছে, নিজের হাতে তৈরি কুশনগুলো দেখে চিনতে পারল অন্তরা। কামরার দু'প্রান্তে বড় আকারের জানালা, জানালার সামনে দু'সেট সোফা ফেলা হয়েছে। 'ফ্যাশন শোর আয়োজন কি রকম চলছে তোমার?' ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন খালেদুর রহমান, কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেন বেতের চেয়ারগুলোর দিকে। একটা চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে অন্তরার দিকে ফিরলেন তিনি, 'বসো, মা, এখানটায় আরাম করে বসো।' আবার ছেলের দিকে তাকালেন তিনি। 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, এখনকার তৈরি ডিজাইন কি রকম বাজার পায় দেখার পর কুয়ালালামপুরে পরবর্তী ফ্যাশন শোর আয়োজন করব আমি।'

এগিয়ে গিয়ে চেয়ারটায় বসল অন্তরা, আলাদা চেয়ারে না বসে ওর চেয়ারেরই হাতলে বসল বৃষ্টি। ওদের দু'পাশের একটা চেয়ারে বসলেন

খালেদুর রহমান, তাঁর মুখোমুখি বসলেন মাসুদুর রহমান।

ওরা ব্যবসা নিয়ে আলাপ করছেন, ঘরে ঢুকল বিদেশী এক প্রৌঢ়া। খালেদুর রহমানের কথা শুনে অন্তরা বুঝল, মহিলা বৃষ্টির গভর্নেস। কাপড় পাল্টাবার জন্যে বৃষ্টিকে নিয়ে চলে গেলেন তিনি। খানিক পর হাতে ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকল লুঙ্গি আর হাফহাতা শার্ট পরা এক লোক। চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে অন্তরা, আর ভাবছে কত তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাতে পারবে। একটু পরই ফ্রক পরে ফিরে এল বৃষ্টি। একা চুপচাপ বসে থাকতে খারাপ লাগছিল, মেয়েটাকে দেখে স্বস্তিবোধ করল ও। দাদু আর বাপের কথার মাঝখানে নাক গলাল সে। 'জানো আব্বু, তুমি যে কুশনগুলো কুয়ালালামপুরে পাঠিয়েছ, ওগুলো অন্তরা আন্টি নিজের হাতে তৈরি করেছে। কী সুন্দর, তাই না?'

'শিল্পীর হাতে তৈরি, সুন্দর তো হবেই,' বললেন খালেদুর রহমান। 'কাজগুলোকে আমার তো রীতিমত অমূল্য বলে মনে হয়েছে।'

'অমূল্য কি, দাদু?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল বৃষ্টি। 'যার কোন মূল্য নেই?'

বোঝা গেল, বাংলাদেশ থেকে দূরে থাকায় মাতৃভাষার অনেক শব্দই তার শেখা হয়নি। বৃষ্টির কথা শুনে তিনজই ওরা হেসে উঠল। মাসুদুর রহমান চুপ করে আছেন, শব্দটার অর্থ ব্যাখ্যা করলেন তাঁর বাবা।

আরও কিছুক্ষণ বাপ-বেটায় আলাপ করলেন ওরা, তারপর খালেদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, বাগানে একটু হাঁটাহাঁটি করলে কেমন হয়?

শুনে বিরাট স্বস্তিবোধ করল অন্তরা। মাসুদুর রহমানের সামনে থেকে পালিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। কিন্তু তারপরই আতঙ্কিত বোধ করল ও, কারণ বুঝতে পারল প্রস্তাবটা দেয়া হয়েছে শুধু বৃষ্টিকে। দাদুর সঙ্গে লাফাতে লাফাতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল

মেয়েটা, তাদের পিছু পিছু মাসুদুর রহমানও গেলেন। ঘরের মাঝখানে একা বসে ঘামতে লাগল অন্তরা।

জড়তা কাটানর জন্যে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার দরকার ছিল, ভাবল ও। মাসুদুর রহমান প্রকাশ্যে রাগ দেখাননি, কাজেই কাল অফিসে যেতে আর কোন সঙ্কোচ বোধ করবে না। এখন শুধু এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালাতে পারলেই হয়। ওরা কেউ ফিরে এলেই বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। সকালে খুশি মনে যাবে অফিসে। না, ঠিক খুশি মনে নয়। খুশি বা সুখী হওয়া ওর কপালে নেই, কারণ মাসুদুর রহমানকে ও যে ভালবাসে এ-কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলে থাকা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। নিজের ওপর রাগ হল অন্তরার, গোটা ব্যাপারটা এলোমেলো করে ফেলেছে ও। ঠিক এলোমেলোও বলা যায় না, আসলে ওর ভাগ্যটাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

'অমন মগ্ন হয়ে কি ভাবছ তুমি, অন্তরা?' জিজ্ঞেস করলেন মাসুদুর রহমান, কখন যেন ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

প্রায় আঁতকে উঠে চেয়ার ছাড়ল অন্তরা, ঘুরে দাঁড়াল। 'ভাবছিলাম···ভাবছিলাম, এবার আমাকে যেতে হয়,' মিথ্যে কথা বলল ও। 'আমি কি কাল থেকে আবার অফিস করব? অফিস করব বলেই ঢাকায় চলে এসেছি···।' নিজের ওপর রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল। বোকার মত হড়বড় করে কথা বলছে, নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনাল। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করল ওর। ভাবল, না জানি কি ভাবছেন ভদ্রলোক।

বুকে হাত দুটো ভাঁজ করলেন মাসুদুর রহমান। শান্ত গলায় জানতে চাইলেন, 'হঠাৎ চলে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলে কেন?'

দ্রুত চিন্তা করছে অন্তরা। 'না, মানে···,' কি বলবে ভেবে না পেয়ে কামরার চারদিকে তাকাল অন্তরা। 'স্যুটকেস থেকে জিনিস-পত্র বের করে গুছিয়ে রাখতে হবে কিনা।'

'একটা মাত্র ছোট স্যুটকেস, পাঁচ মিনিটের কাজ,' বললেন মাসুদুর রহমান।

'হ্যাঁ। কামরাটাও গোছগাছ করতে হবে, ইস্ত্রি করতে হবে কাপড়গুলো...।'

'কামরা গোছগাছ করতে আরও পাঁচ মিনিট, ইস্ত্রি করতে দশ মিনিট।' ভদ্রলোকের স্থির দৃষ্টির সামনে আড়ষ্টবোধ করছে অন্তরা, কিন্তু তবু তিনি থামলেন না। 'সব মিলিয়ে খুব বেশি হলে আধ ঘন্টা। অথচ এখনও সন্ধে হতে অনেক দেরি। রাত দশটার আগে তো শুতে যাবে না। বাকিটা সময় কি করবে তুমি?'

অন্তরার চোখে এবার রাগ ফুটল, নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল ও।

'তারচেয়ে আরও কিছুক্ষণ থাকো এখানে, কথা বলো আমার সাথে,' প্রস্তাব দিলেন মাসুদুর রহমান।

ঘাড় ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাগানের দিকে তাকাল অন্তরা। ভদ্রলোক ওর ওপর অত্যাচার করছেন, কিন্তু বোঝাতে চায় তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। 'আপনার সাথে আমার কোন কথা নেই,' বলল ও, বলেই তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

পরমুহূর্তে দুই কাঁধে শক্ত হাতের স্পর্শ পেল অন্তরা। ওকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিলেন মাসুদুর রহমান, অনেকটা জোর করেই। ভদ্রলোকের হাত ভারী ও গরম লাগল অন্তরার কাঁধে। সামান্য একটু ঝাঁকিও দিলেন ওকে। 'কথা নেই মানে? অবশ্যই আছে,' বললেন তিনি। 'ফ্যাশন হাউস সম্পর্কে আলাপ করতে পারি আমরা, আলাপ করতে পারি তোমার ডিজাইন নিয়ে। এমনকি এই বাড়িটাও হতে পারে আমাদের আলোচ্য বিষয়। তাছাড়া, আমি জানি, তোমার মনে হাজারটা প্রশ্ন জমা হয়ে আছে। কি, ঠিক বলিনি?'

দ্রুত, ঘন ঘন মাথা নাড়ল অন্তরা, নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টাও করল। 'না, আমার কোন প্রশ্ন নেই...।'

হঠাৎ শিস দিলেন মাসুদুর রহমান। 'ডাহা মিথ্যে কথা,' বললেন তিনি। 'তুমি জানতে চাও, বৃষ্টিকে নিয়ে কেন আমার বাবা তোমাকে দেখতে গিয়েছিলেন। তুমি জানতে চাও, আমি তোমার ওপর রেগে আছি কিনা, যদিও তোমার ওপর রাগ করার কোন কারণ আমি অন্তত দেখছি না। দোষ যদি হয়ে থাকে তো আমারই হয়েছে...,' তাঁর গলার আওয়াজ অসম্ভব কোমল ও মৃদু হয়ে উঠল, যেন ফিসফিস করছেন। 'তবে, সবচেয়ে বেশি যেটা জানতে চাও–তোমার সম্পর্কে ঠিক কি ভাবছি আমি।'

তারপর দীর্ঘ নিস্তব্ধতা নামল কামরার ভেতর। অন্তরা উপলব্ধি করল, ওর তুলনায় ভদ্রলোক অনেক বেশি শক্তিশালী, অনেক বেশি বুদ্ধিমান। কোনদিনই তাঁকে ধোঁকা দিতে বা বোকা বানাতে পারবে না ও। তাঁর কাছ থেকে কিছুই গোপন করে রাখা সম্ভব নয়, এমনকি নিজেকেও না। কথা না বলে মাথাটা একটু কাত করল ও, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। মনে মনে ভাবল, হ্যাঁ, সব আমি জানতে চাই।

'তোমার সম্পর্কে এই আমি ভাবি, অন্তরা,' বলে অন্তরাকে নিজের বাহুর ভেতর টেনে নিলেন মাসুদুর রহমান, মৃদু চাপ দিয়ে ওর মাথাটা নিজের কাঁধের ওপর আনলেন। 'প্রথমবার দেখেই আমি তোমার প্রেমে পড়ে যাই, কিন্তু তারপরই মনে হল, কাজটা অন্যায়...।'

'অন্যায়?' জানতে চাইল অন্তরা, থরথর করে কাঁপছে।

মাথা ঝাঁকালেন মাসুদুর রহমান। 'কারণ তুমি আমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট। কারণ আমার একটা ছোট মেয়ে আছে।'

মাসুদুর রহমানের কাঁধে মুখ, অভিমানে ঠোঁট ফোলাল অন্তরা। 'আপনি কিন্তু আমাকে খেপিয়ে দিয়েছিলেন।'

অন্তরার হাত ধরে টান দিলেন মাসুদুর রহমান, এক কোণার একটা সোফায় নিয়ে গিয়ে বসালেন, নিজেও বসলেন ওর পাশে। অন্তরার

একটা হাত এখনও তিনি ছাড়েননি, আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করছেন। 'আশ্চর্য নরম হাত,' বললেন তিনি। 'কিন্তু খুব দক্ষ।'

'বেশিরভাগ সময় ওগুলোয় রঙের দাগ লেগে থাকে,' বলল অন্তরা, শুনে হেসে উঠলেন মাসুদুর রহমান। তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল অন্তরা, ভাবছে এত সুখ অনুভব করা কি করে সম্ভব! এখনও অনেক প্রশ্নের উত্তর জানা নেই ওর, যদিও আসল কথা হল মাসুদুর রহমান ওকে সত্যি ভালবাসেন।

'তোমার ফুফাত ভাই শুভ্র সম্পর্কে সব কথা এখন জানি আমি,' হঠাৎ বললেন মাসুদুর রহমান, অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল অন্তরা। 'তোমার শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা কম নয়। তুমি নারায়ণগঞ্জে চলে যাবার পর তাদের একজন আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। তোমার মনে যে শান্তি নেই, এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন, তোমার অশান্তির কারণ হল শুভ্র।'

জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল অন্তরা। 'শিপলু ভাই নয় তো? কিংবা সীমা ভাবী? ওদেরকে আমি কিছু জানাতে চাইনি…।'

মাথা নাড়লেন মাসুদুর রহমান। 'না, ওরা কেউ নন। ইনি এমন একজন, যিনি সেই রাতে শুভ্রকে তোমার সাথে গোপনে আলাপ করতে দেখেছিলেন—যে-রাতে তুমি আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালে। শুভ্র আর তোমার সম্পর্কে আরও অনেক কথাই জানেন তিনি…।'

মুহূর্তের জন্যে চোখ দুটো বন্ধ করল অন্তরা। 'মমতা মামুন! মমতা আন্টি!'

'হ্যাঁ। মমতা মামুন। ভদ্রমহিলা তোমাদের সব কথাই জানেন।'

'কিন্তু কিভাবে? আমি তো তাঁকে কিছুই বলিনি! সে-সব কাউকে বলা সত্যি সম্ভব নয়। কোনদিন না।'

'জানি, অন্তরা।' হাসলেন মাসুদুর রহমান। 'প্রতিজ্ঞা করেছ। তিন সত্যি। আঙুল ছুঁয়ে তিন সত্যি। তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছ,

সেজন্যে সত্যি আমি গর্বিত, অন্তরা। তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে।'

'আ-আপনি জানেন?'

'আপনি নয়, এখন থেকে তুমি।'

খালি হাতটা বাড়িয়ে মাসুদুর রহমানের একদিকের কাঁধ খামচে ধরল অন্তরা। 'না, আমি আপনাকে সব সময় আপনি বলব।'

'লোকে হাসবে। এ যুগে…।'

'হাসলে হাসুক। এ যুগের মেয়ে হবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আপনাকে আমি কোন দিন তুমি বলতে পারব না। পারব না নয়, চাই না।'

'কিন্তু কেন? আমি তোমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড় বলে?' হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল মাসুদুর রহমানের চেহারা।

'পাগল নাকি! তুমি আমার চেয়ে দশ কি বারো বছরের বড়। কাগজ পড়ো না, পঁয়তাল্লিশ বছরের লোকের সাথে আঠারো বছরের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে আজকাল?'

ম্লান ছায়া সরে গিয়ে মাসুদুর রহমানের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'মমতা মামুনের সাথে কথা বলার পর সব পরিষ্কার হয়ে গেল। শুভ্র আর তুমি, পরস্পরকে তোমরা দুটো ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দাও। তোমরা যখন দোকানে কথা বলছিলে, কাছাকাছি ছিলেন তিনি। তোমাদের সব কথাই তাঁর কানে যায়।'

'মমতা আন্টি আপনাকে দেখেই পছন্দ করে ফেলেন…।'

'আবার?' চোখ রাঙালেন মাসুদুর রহমান।

'তোমাকে তাঁর খুব কম বয়েসী বলে মনে হয়েছিল। চুলে পাক ধরেছে এমন কেউ হলে ভেবে দেখতেন…।'

বাগানে পায়চারি করছেন খালেদুর রহমান, সে-কথা ভুলে হো হো করে হেসে উঠলেন মাসুদুর রহমান।

হাসি থামতে অন্তরা জানতে চাইল, 'কিন্তু শুভ্র সম্পর্কে তোমার মনোভাব সত্যি আমাকে খেপিয়ে তুলেছিল।'

'ওর সাথে প্রথমে আমি দেখা করি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস কিনা জানার জন্যে,' বললেন মাসুদুর রহমান। 'আমাদের মধ্যে অনেক কথাই হয়, সব কথা তোমাকে জানাতে নিষেধ করি আমি। আমার ইচ্ছে ছিল, তোমরা পরস্পরকে ভালবাসলে তোমাদের মাঝখান থেকে সরে দাঁড়াব আমি। কিন্তু শুভ্র আমাকে স্পষ্ট করে জানাল, তোমাকে ভালবাসার কথা বা বিয়ে করার কথা কখনও ভাবেনি সে। তার ধারণা, তুমিও তাকে ভালবাস না। এরপর তার সম্পর্কে অনেক আজেবাজে কথা আমার কানে আসে। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি, সবই সত্যি। কাজেই আবার তার সাথে দেখা করতে হয় আমাকে। এবার তাঁকে আমি বলি, সে যদি নিজের ও তোমার ভাল চায়, তাহলে মেলামেশাটা বন্ধ করতে হবে। কারণ ইতিমধ্যে আমি আন্দাজ করে নিয়েছি, তার কারণেই তোমার মনে অশান্তি। তাছাড়া, আমি যাকে ভালবাসি তার কোন ক্ষতি হতে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।'

'বেচারা শুভ্র।'

'হ্যাঁ, বেচারা শুভ্র। তুমি জানো, কারা তাকে ছুরি মেরেছিল?'

'হ্যাঁ, শুনলাম তারা ধরা পড়েছে।'

'কার কাছে শুনলে?'

'তোমার বাবা বললেন।'

'উনি এত খবর রাখেন?' মাসুদুর রহমান হেসে উঠলেন।

'তুমি আমার তৈরি কুশনগুলো কুয়ালালামপুরে পাঠিয়েছ শুনে ভাবলাম, আমার ওপর তোমার আগ্রহ না থেকে পারে না।'

'তোমার ওপর আগ্রহ বরাবরই ছিল আমার। কিন্তু সব সময় ভাবতাম, তুমি বোধহয় আর কাউকে ভালবাস...।'

'তারপর শুভ উদ্বোধনের দিন পার্টিতে তুমি আমার ওপর রেগে

যাও।'

মাথা নাড়লেন মাসুদুর রহমান। 'না, আসলে রাগিনি, ঈর্ষায় কাতর হয়ে পড়েছিলাম। ঢুকেই দেখি, একদল পুরুষ তোমাকে ঘিরে রেখেছে। তারপর দেখলাম, তুমি মদ খেয়েছ। তোমার ধারণাটা অবশ্য মিথ্যে ছিল না—ওখানে তোমার জায়গায় অন্য কেউ হলে হাসতাম আমি, উপভোগ করতাম ব্যাপারটা।'

'তুমি ঈর্ষাবোধ করায় আমি খুশি।'

'ঈর্ষা আমি চিরকালই বোধ করব, অন্তরা। তোমার ব্যাপারে সত্যি আমি স্বার্থপর, একা শুধু নিজের জন্যে তোমাকে চাই।'

'বলছ বটে আমাকে চাও, কিন্তু আমাকে ভালবাস এ-কথা কিন্তু একবারও বলোনি।'

'বলিনি, কারণ বলতে সাহস হয়নি। দেখেই যে আমি তোমার প্রেমে পড়ে যাই, তার একটা প্রমাণ আমার কাছে আছে। শুনবে?'

'কি প্রমাণ?' চোখ বড় বড় করল অন্তরা।

'তোমাকে দেখার পর অন্যায় একটা সিদ্ধান্ত নিই আমি, কারণ চাইনি তুমি আমার হাতছাড়া হয়ে যাও। টেলিভিশনে তোমার চাকরি হতে যাচ্ছে শুনে মাথাটা গরম হয়ে উঠেছিল। ভাবলাম, টিভিতে চাকরি হলে তোমাকে আর কাছে পাওয়া হবে না আমার। তাই আমার বিশ্বস্ত বন্ধু-বান্ধবদের ধরলাম, যেভাবে হোক ব্যবস্থা করতে হবে টিভিতে যেন অন্তরার চাকরিটা না হয়। ওদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, তোমার চাকরিটা সত্যি হয়নি।'

'ওমা! তুমি…তুমি তো মহা পাজি লোক দেখছি!' কৃত্রিম রাগে মাসুদুর রহমানকে মারবে বলে ঘুসি তুলল অন্তরা।

চোখ কুঁচকে মাসুদুর রহমান জানতে চাইলেন, 'তোমার আর কোন প্রশ্ন নেই?'

চিন্তা করল অন্তরা। 'আছে।'

'বলো।'

'প্রশ্নটা হল, উম্মে জোহরা। কে যেন আমাকে বলেছিল, তুমি সুন্দরী মেয়েদের সাথে মেলামেশা করো, শুধু জোহরাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে—মানে, তাদেরকে তুমি একটা বর্ম হিসেবে ব্যবহার করো। কিন্তু সে যেরকম জেদী মেয়ে, সহজে হাল ছাড়বে বলে মনে হয় না।'

'হাল ছাড়বে না মানে?'

'মানে, তাকে যদি তুমি বিয়ে করতে না চাও...।'

'কি জানো, জোহরা খুব অসুখী মেয়ে। কত লোকের সাথে প্রেম করল, কিন্তু কোনদিন বিয়ে করবে বলে মনে হয় না। ওর আসল প্রেম কাজের সাথে, পুরুষ মানুষ তার খেলনা। কাজ ভালবাসে, ভাল একটা কাজ পেয়েও গেছে। আগামী হপ্তায় চলে যাচ্ছে ও...।'

'চলে যাচ্ছে?'

মাসুদুর রহমান জানালেন, ডিজাইনার হিসেবে আমেরিকায় বড় একটা চাকরি পেয়েছে উম্মে জোহরা।

'কিন্তু তাহলে কুয়ালা ফ্যাশন হাউসের কি হবে?' অন্তরার গলায় উদ্বেগ।

'তার অভাবটা টের পাব আমরা, তবে খালি জায়গায় আসার জন্যে কিছু লোক সব সময় অপেক্ষায় থাকে। কুয়ালালামপুরে দু'একজন তরুণ আর্টিস্ট আছে, দায়িত্ব পেলে সত্যি তারা ভাল করবে বলে আমার ধারণা। জোহরাকে ঠিক প্রতিভা বলা যায় না, কাজেই তার কাজ অন্যদের দিয়েও করানো যাবে। আর ব্যক্তিগত লোকসানের কথা যদি বলো, আমি একজন আত্মীয়কে হারাব। তার সাথে হৃদয়ঘটিত কোন সম্পর্ক আমার ছিল না কখনও। অবশ্য, তার বোন আমার স্ত্রী ছিল বলেই হয়ত, সে চায় না যে আবার আমি বিয়ে করি।'

'সে চায় না। কিন্তু তুমি?'

'আমি কি চাই সেটা আমার চেয়ে বোধহয় আমার বাবা আরও ভাল জানেন,' বললেন মাসুদুর রহমান।

'ও, আচ্ছা, তারমানে তুমিই তাঁকে নারায়ণগঞ্জে পাঠিয়েছিলে– মেয়ে দেখতে?'

'আরে না, বাবা যে তোমার কাছে যাবেন তা আমি জানতামই না। গেছেন শুনে এখন বুঝতে পারছি তাঁর উদ্দেশ্যটা আসলে কি। আমি তোমাকে ফোন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমার কি প্রতিক্রিয়া হয় ভেবে সাহস পাইনি।'

'তারমানে আমাকে তুমি ভয় পাও?'

'পাই না বললে মিথ্যে বলা হবে। যেভাবেই হোক, আমাদের ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছেন বাবা। হয়ত অফিসের কারও কাছে শুনেছেন।'

'তোমার কথাই ঠিক, মেজাজী মানুষ,' বলল অন্তরা। 'তবে আমার সাথে মেজাজ দেখিয়ে সুবিধে করতে পারবেন না, এটা আজ ভাল করেই বুঝতে পেরেছেন।'

'তুমি কিভাবে তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছ, সবিস্তারে সব কথা আমাকে শুনিয়েছেন। তুমি জানো না, ভদ্রলোকের ভেতর ভাবাবেগ বলে কিছু নেই। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের একেবারে গভীরে গেঁথে গেছে তোমার নামটা। অন্তরা বলতে অজ্ঞান। যা-ই বলো তুমি, কিছুই মনে করবেন না। তাঁর কাছে তোমার সাত খুন মাফ।'

'আমি বলেছি, আপনাদের বাপ-বেটায় আরও কথা হওয়া দরকার। বলেছি, আপনি কি জানেন, আপনার ছেলে আপনাকে কতটা ভালবাসে?'

'শুনে কি বললেন?'

'অনন্তকাল আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বললেন, ঠিক কথাই বলেছি আমি। আরও বললেন, তাঁর টাকা থাকায় লোকে তাঁকে ভয়

করে। বললেন, তুমি খুব সাহসী মেয়ে।'

হেসে উঠলেন মাসুদুর রহমান। 'আর বৃষ্টি? বৃষ্টিকে দেখে কি মনে হল তোমার?'

'দাদুর কাছ থেকে কি শুনেছে কে জানে, বলল অন্তরা, 'এরই মধ্যে আমাকে আত্মীয় ভাবতে শুরু করেছে সে।'

'তাহলে শুনবে, দিন কয়েক আগে কি বলছিল আমাকে ও? বোধহয় ওর দাদুই কথাটা শিখিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরল, বলল—আমার একটা মা থাকলে মন্দ হয় না, আর আমার মা হওয়া তারই সাজে যে আমার দাদুর প্রাণ বাঁচিয়েছে।'

ঠিক এই সময় বাগান থেকে জানালার ফাঁকে মাথা গলিয়ে বৃষ্টি জানতে চাইল, 'তোমরা একবার বাগানে আসবে, আব্বু? একটা প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে, দাদু সেটা আমাকে ধরে দিতে পারছে না। তোমরা এসে ধরে দাও না!'

—ঃ শেষ ঃ—